নিগ্রো জাতির
কর্মবীর

'pproved by the Text Book Committee
| Calcutta Gazette, Page 921, dated 4th August, 1915.

গৃহস্থ গ্রন্থাবলী—৭

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ,

সঙ্কলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

মাঘ, ১৩২৩

গৃহস্থ পাব্লিসিং হাউস্
২৪নং মিডল্‌ রোড, ইটালী, কলিকাতা

 [মূল্য ১৸০-দেড় টাকা মাত্র ।

Publisher
CHINTAHARAN GUHA
Manager,
Grihastha Publishing House
24, Middle Road, Entally.
CALCUTTA.

Printer
KSHETRANATH BOSE
INDIA PRESS
24, Middle Road, Entally
CALCUTTA.

নিবেদন

এই গ্রন্থ আমেরিকার প্রসিদ্ধ টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াশিংটনের 'আত্মজীবনচরিত'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ইহাকে যে কোন দেশের যে কোন কর্ম্মবীরের আত্মজীবনচরিতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মূল গ্রন্থ ১৯০১ সালে নিউইয়র্কে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই অনুবাদ প্রথমে "গৃহস্থ" মাসিক পত্রে ধারাবাহিকরূপে বাহির হয়।

ফাল্গুন, ১৩২১
কলিকাতা

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর

বুকার টি ওয়াশিংটন

সূচীপত্র

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর*

প্রথম অধ্যায়

গোলামাবাদের আবহাওয়া

আমি কেনা গোলাম—জাতিতে নিগ্রো। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের ফ্রাঙ্কলিন জেলার কোন গোলাম-খানায় আমার জন্ম। ঠিক কবে কোথায় জন্মিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। শুনিয়াছি একটা ডাকঘরের নিকটে আমার জন্মস্থান; এবং বোধ হয় ১৮৫৮ কিম্বা ১৮৫৯ সালে আমি ভূমিষ্ঠ হই। কিন্তু জন্মের মাস, তারিখ ইত্যাদি কিছুই জানি না। নিতান্ত ছেলেবেলার কথার মধ্যে গোলামাবাদের কাজকর্ম্ম ও চালচলন-গুলিই মনে পড়ে। আর স্মরণ হয় সেই আবাদের গোলাম-

---

* আমেরিকার শিক্ষাপ্রচারক বুকার ওয়াসিংটনের "আত্মজীবন-চরিত" গ্রন্থের অনুবাদ।

মহল্লার কুঠুরিগুলি—যেখানে আমার স্বজাতিরা তাহাদের দাস-জীবন কাটাইত।

নিতান্ত ঘৃণ্য, অবনত, দারিদ্র্যদুঃখময়, নৈরাশ্যপূর্ণ অব- মধ্যেই আমার বাল্য-জীবন কাটিয়াছে। অবশ্য এই দুঃখ দৈন্যক্লেশের জন্য আমার মনিবদের বিশেষ কোন দোষ ছিল না। তাঁহারা অন্যান্য প্রভুগণের তুলনায় সহৃদয় ও দয়ালুই ছিলেন। তবে কেনা গোলামমাত্রের যে শোচনীয় দশা তাহাই আমাকেও ভোগ করিতে হইয়াছে। একটা ১৬ ফিট লম্বা এবং ১৪ ফিট চৌড়া কাঠের কামরার মধ্যে দাস-জাতির সকলকেই বসবাস করিতে হইত। এইরূপ একটা কুঠুরিতে আমি, আমার মাতা, এবং এক ভাই ও ভগ্নী এই চারিজন আমাদের দাস-জীবন কাটাইতাম। পরে "যুক্ত রাজ্যে"র গৃহবিবাদের ফলে দাসজাতির স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তখন হইতে আমরা স্বাধীন হইয়া গোলামখানা পরিত্যাগ করিয়াছি।

আমার পূর্ব্বপুরুষদের কথা কিছুই জানি না। গোলামা-বাদের লোকজনেরা মাঝে মাঝে কাণাঘুষা করিত। তাহা হইতে অল্প-বিস্তর কিছু অনুমান করিয়া লইয়াছি মাত্র। আমরা আফ্রিকাবাসী। আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় চালান দিবার সময়ে জাহাজে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে মনিব-সম্প্রদায়ের লোকজনেরা যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের বৃত্তান্ত এইটুকু মাত্র জানা যায়। বলা বাহুল্য সেই যুগে গোলামজাতির বংশতালিকা, পুরাতত্ত্ব, পিতামহের

জীবন-কাহিনী ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজনই বোধ হইত না।

কোন উপায়ে এক ব্যক্তি আমার মাতাকে হয়ত কিনিয়া আনিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের প্রভু হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। একটা নূতন গরু, ঘোড়া বা শূকর কিনিলে তাঁহার পরিবারে যেরূপ সাড়া পড়ে, আমার মাতা তাঁহাদের গোলামাবাদে প্রবেশ করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী কিছু হৈ-চৈ পড়ে নাই।

আমার পিতার সংবাদ আমি একেবারেই কিছু জানি না। বোধ হয় তিনি কোন শ্বেতকায় পুরুষ—সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী কোন আবাদের প্রভু-জাতীয় একব্যক্তি। তাঁহাকে আমি কখন দেখি নাই—তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনি নাই, তিনি আমাকে মানুষ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টাও কোন দিন করেন নাই। এইরূপ পিতা বা জন্মদাতা গোলামীর যুগে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ-সমাজে অসংখ্যই ছিলেন।

আমাদের কামরাটিতে কেবল মাত্র আমাদেরই গৃহস্থালী চলিত না। এই কুঠুরিটিতে সমস্ত গোলামাবাদের জন্য রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইত। আমার মাতা আবাদের সকল কুলীর জন্যই রান্না করিতেন। ঘরটা নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ অতিশয় অস্বাস্থ্যকর এবং পীড়াজনক। ইহার ভিতর আলোক বা বাতাস বেশী আসিত না। কিন্তু মাঝে মাঝে ফাঁকের ভিতর দিয়া শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস যথেষ্টই প্রবেশ করিত। তাহার উপর, মেজেতে

এই কার্য্য বড়ই কষ্টদায়ক হইয়া উঠিত। আবাদ হইতে কল তিন মাইল দূরে। একটা ঘোড়ার পীঠের উপরে শস্যের প্রকাণ্ড বোঝা চাপান হইত—বোঝাটা ঘোড়ার দুই পার্শ্বে ঝুলিতে থাকিত। আমি মধ্যস্থলে বসিতাম। মাঝে মাঝে দুর্দ্দৈবক্রমে বোঝাটা ঘোড়ার পীঠ হইতে পড়িয়া যাইত—আমিও চীৎপাত হইয়া পড়িতাম। আমার সাধ্য ছিল না যে আমি একা সেই বোঝা অশ্বপৃষ্ঠে তুলি। একাকী নির্জ্জন রাস্তায় বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম—কাঁদিয়া কাটাইতাম। হঠাৎ কোন লোক সেই দিক দিয়া গেলে তাহার সাহায্যে মাল ঘোড়ায় চড়াইয়া কলে পৌঁছিতাম। ইহাতে সময়ে সময়ে এতক্ষণ লাগিত যে, কলে কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিতে বেশ রাত্রি হইয়া যাইত। অন্ধকার পথে বড়ই ভয় পাইতাম। স্থানে স্থানে ঘন জঙ্গল ছিল—তাহার মধ্যে না কি চাকুরী ত্যাগ করিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাদি বাস করিত। শুনিয়াছিলাম—একা পাইলেই তাহারা নিগ্রো বালকের কাণ কাটিয়া রাখিত। সুতরাং ঐ রাস্তায় যাওয়া-আসা আমার পক্ষে বিষম উৎপাত বোধ হইত। বিশেষতঃ বেশী রাত্রে ঘরে ফিরিলে আবার জুতা লাথি গালি খাওয়ার সুব্যবস্থাও ছিল।

গোলামী করিতে করিতে আমি কখনও শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে যাই নাই। অবশ্য বিদ্যালয়-গৃহের ফটক পর্য্যন্ত অনেকবারই গিয়াছি। আমার মনিবদের সন্তান-সন্ততিরা স্কুলে যাইত। আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাদি বহিয়া লইতাম। দূর হইতে দেখিতাম বিদ্যালয়ের ঘরগুলিতে ছেলে-মেয়েরা দলে

লে লেখা পড়া শিখিতেছে। সেই দৃশ্য আমার চিত্তে কি অপূর্ব্ব ভাবই না সৃষ্টি করিত! ঐরূপ একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া লেখাপড়া করিতে পারা আমার নিকট স্বর্গ-প্রবেশের ন্যায় সুখকর মনে হইত।

আমরা যে গোলাম বা ক্রীতদাস তাহা আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত জানিতাম না। আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিবার জন্য দেশব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই। একদিন সকালে জাগিয়া দেখি আমার মাতা আমাদিগকে সম্মুখে রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন :—"হে জগদীশ্বর, সেনাপতি লিঙ্কল্‌নের সৈন্যদল যেন জয়লাভ করে। হে অনাথের নাথ, আমরা সপরিবারে এবং সদলবলে যেন স্বাধীন হই। হে পতিত-পাবন, এই অবনত দাসজাতিকে বন্ধন-মুক্ত কর।"

বলা বাহুল্য, গোলামাবাদের আমার স্বজাতিরা সকলেই নিরক্ষর ছিল। কেহই লেখাপড়া, পুস্তক, গ্রন্থালয়, সংবাদপত্র ইত্যাদির ধার ধারিত না। তথাপি দেখিতাম প্রায় সকলেই দেশের কথা বেশ জানিত ও বুঝিত। যুক্তরাজ্যের মধ্যে যে একটা বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাহারই অজানা ছিল না। কবে কোথায় কি ঘটিতেছে দাসজাতির সকলেই তাহা বুঝিতে ও শুনিতে পাইত। আমাদিগকে স্বাধীন করিবার জন্য যুক্তরাজ্যের উত্তরপ্রান্তবাসী গ্যারিসন, লাভজয় ইত্যাদি মানব-সেবকগণ যে দিন হইতে আন্দোলন সুরু করেন,—আশ্চর্য্যের বিষয়, সেইদিন হইতেই দক্ষিণপ্রান্তের গোলামাবাদের মহলে

মহলে সংবাদ রটিয়া গেল। স্বাধীনতার আন্দোলনের দৈনিক ঘটনাগুলি গোলাম-সমাজে সুপ্রচারিত হইত।

উত্তর প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্তে এই বিষয় লইয়া লড়াই হইবার উপক্রম হইল। দক্ষিণ প্রান্তের মনিবেরা গোলামের জাতিকে স্বাধীনতা দিতে নিতান্তই নারাজ। শেষ পর্য্যন্ত দুই প্রান্তে সংগ্রাম বাধিল। এ সকল কথা গোলামেরা—আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণ—অতি সহজেই বুঝিতে পারিত। তাহারা এই আন্দোলন ও সংগ্রামের যুগে কত রাত্রিই যে কাণাঘুষায়, গল্পগুজবে ও গুপ্ত পরামর্শে কাটাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমাদের গোলামাবাদ রেলের রাস্তা হইতে বহুদূরেই অবস্থিত ছিল—ইহার নিকট কোন বড় সহরও ছিল না। কিন্তু আমরা খবর পাইতাম যে, উদারহৃদয় সেনাপতি লিঙ্কল্‌ন্ যুক্ত-রাজ্যের সভাপতি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতাম যে তিনি সভাপতি হইলে আমরা স্বাধীন হইব। তাহার পর যখন যুদ্ধ বাধিল, তখনও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, এই যুদ্ধের ফলের উপর আমাদেরই ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, লিঙ্কল্‌ন্ এবং তাঁহার উত্তরপ্রান্তবাসী জনগণ যদি দক্ষিণপ্রান্তবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে দাসজাতির গোলামী ঘুচিয়া যাইবে। এজন্য এই সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের খবর পাইতে আমরা অতিশয় আগ্রহান্বিত হইতাম।

ভগবানের কৃপায় আমরা সকল সংবাদই পাইতাম। এমন কি, আমাদের প্রভুরা খবর পাইবার পূর্ব্বেই অনেক সময়ে ব্যাপার বুঝিয়া লইতাম। কথাটা কিছু হেঁয়ালির মত বোধ হইবে বটে, কিন্তু রহস্য আর কিছুই নয়। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পর-নির্ভরতাই আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ উপকার করিত। আমরা তাঁহাদের গোলাম সত্য, কিন্তু আমাদের মনিবেরাও অনেক বিষয়ে আমাদেরই গোলাম ছিলেন। আমাদের সাহায্য না পাইলে তাঁহাদের এক পাও চলিবার ক্ষমতা ছিল না। গোলামেরাই ডাকঘর হইতে চিঠিপত্র লইয়া আসিত। সপ্তাহে দুই বার করিয়া ডাকঘরে যাওয়া-আসা করিতে হইত। সেই সুযোগে ডাকঘরের নিকট জটলা ও মজলিশ এবং খোসগল্প ইত্যাদি হইতে দাস-পত্রবাহক সকল অবস্থা বুঝিয়া লইত। ফলতঃ, প্রভুরা চিঠি-পত্র পাঠ করিয়া বৃত্তান্ত জানিতে পারিবার পূর্ব্বেই গোলামমহল্লায় সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িত।

মায়ে ভায়ে সকলে এক সঙ্গে বসিয়া কখনও আমি আহার করিয়াছি—এরূপ মনে হয় না। গোলামখানার খাওয়া কোন উপায়ে নাকে চোখে গোঁজা মাত্র। তাহাকে আহার বলে না। গরু ছাগল ইত্যাদি যেরূপ চরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে যাহা পায় তাহাই খায়, আমাদেরও ভোজনব্যাপার সেইরূপই ছিল। কোন সময়ে কাজ করিতে করিতে হয়ত একটুকরা মাংস খাইলাম। কখনও বা দুই একটা পোড়ান আলু হাঁটিতে হাঁটিতে চিবাইতে হইত। মাঝে মাঝে উননের কড়া হইতেই তুলিয়া

কোন দ্রব্য মুখে দিতাম। কাঁটা চামচ ইত্যাদির প্রয়োজন হইবে কোথা হইতে? ঠিক নিয়মিতরূপে যথাবিধি পান-ভোজনেরই যে ব্যবস্থা ছিল না! যখন কিছু বড় হইলাম, তখন বড় কুঠির সাহেব প্রভুর আহারের সময়ে পাখা টানিতে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। এই উপায়ে মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে মনিব-পরিবারের কথোপকথন শুনিতে পাইতাম। অনেক সময়ে গুপ্তকথাও বাহির হইয়া পড়িত। লড়াই সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বুঝিতে পারা যাইত। সময়ে সময়ে তাঁহাদের খানা দেখিয়া যথেষ্ট লোভও হইত! আর মনে হইত কোনও দিন ঐরূপ এক থালা অন্নব্যঞ্জন যদি আমার ভাগ্যে জুটে, তাহা হইলে আমার স্বাধীনতার চূড়ান্ত ফললাভ হইবে!

সংগ্রাম চলিতে লাগিল। আমার শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের খাওয়া-পরার বড়ই কষ্ট হইল। দূরদেশ হইতে চা, কাফি, চিনি ইত্যাদি আসিলে তবে মনিবদের গৃহস্থালী চলে। কিন্তু ক্রমশঃ এ সব দুর্ল্লভ হইল। তাঁহাদের দুঃখের আর সীমা রহিল না। গোলাম-জাতির কিন্তু বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। কারণ আমরা অত পরমুখাপেক্ষী ত ছিলাম না। আমাদের আবাদেই যে সব শস্য জন্মিত তাহাতেই আমাদের ভরণ-পোষণ স্বচ্ছন্দে চলিত। আর শূকর-পালন ত সহজেই আমরা নিজ মহল্লায় করিতাম। কাজেই লড়াই বাধিবার পর প্রভুদের দুর্গতি দেখিয়া আমরা বিব্রত হইলাম। আমাদের অবস্থা 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং'। তাঁহারা অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া চিনির পরিবর্ত্তে ময়লা গুড় দিয়াই চা

খাইতেন। অনেক সময়ে আবার সেই গুড়ও যোগাইতে পারিতাম না। মিষ্ট না দিয়াই তাঁহাদিগকে অনেক দিন চা পান করিতে হইয়াছে। আবার যখন প্রকৃত চা বা কাফিও থাকিত না, তখন তাঁহারা মুড়ি বা চিঁড়ে ভাজা অথবা অন্য কোন শস্যের গুঁড়া ভিজাইয়া 'দুধের সাধ ঘোলে' মিটাইতেন।

আমি জীবনে সর্ব্বপ্রথম যে জুতা পরি, তাহা কাঠের তৈয়ারী। উপরিভাগে কিছু চামড়া ছিল। তাহা পরিতে পায়ের তলায় বড়ই লাগিত। কাঠের জুতা তবুও ভাল—কিন্তু গোলামীর আমলে আমাদিগকে যে জামা পরিতে হইত তাহা অতি ভয়ঙ্কর। বোধ হয় দাঁত টানিয়া তুলিতে যে কষ্ট হয় এই জামা পরিতে তাহা অপেক্ষা কম কষ্ট হইত না। ভার্জ্জিনিয়ার গোলামাবাদে খুব মোটা খড়্‌খড়ে চটের শার্ট পরিতে দেওয়া হইত। ইহার নূতন অবস্থায় অসংখ্য কাঁটা বাহির হইয়া থাকিত। গায়ের চামড়ায় কাঁটাগুলি বিঁধিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দিত। আমার চামড়া কিছু নরম—সেজন্য কষ্ট অত্যধিকই বোধ করিতাম। কি করিব?—বাদবিচারের অবসর ছিল না। তাহাই পরিতে হইবে নতুবা অন্য কোন গাত্রাচ্ছাদন পাইব না। আমার দাদা 'জন' একবার দাসমহলের পক্ষে অসামান্য উদারতা দেখাইয়াছিল। চটের নূতন জামা পরিতে আমার কষ্ট দেখিয়া সে নিজেই ১০।১৫ দিন সেটা পরিল। যখন ভিতরকার কাঁটাগুলি তাহার গায়ে লাগিয়া ঘষিয়া গেল, তখন হইতে আমি সেই জামাটা ব্যবহার

করিতে লাগিলাম। এই জামাই আমার গোলামী যুগের বহুকাল পর্য্যন্ত একমাত্র পোষাক ছিল।

আমাদের দুরবস্থার এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া আপনারা ভাবিতে পারেন—বোধ হয় দক্ষিণপ্রান্তের কাল গোলামেরা তাহাদের শ্বেতাঙ্গ মনিবদের উপর বড়ই বিরক্ত ছিল। সত্য কথা বলিতে পারি যে, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে কখনই বেশী তীব্রভাব পোষণ করি নাই। আমরা জানিতাম যে তাঁহারা আমাদিগকে চিরকাল গোলামের অবস্থায় রাখিবার জন্যই উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ মহোদয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। আমরা জানিতাম যে, আমাদের মনিবেরা জিতিলে আমরা চিরজীবন গোলামীই করিতে থাকিব। তথাপি আমরা আমাদের প্রভুদের প্রতি শত্রুতাচরণ করি নাই—বরং সকল সময়ে তাঁহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়াছি। আমরা কোনদিনই তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার ত্রুটি করি নাই। যুদ্ধে আমার একজন যুবক মনিব মারা যান, এবং দুইজন আহত হন। ইহাদের পরিবারের যতটা দুঃখ হইয়াছিল—এই ঘটনায় গোলাম-খানায় তদপেক্ষা কম দুঃখ হয় নাই। আমার আহত প্রভুদ্বয়কে প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিয়াছি। কত রাত্রি তাঁহাদের রোগ-শয্যার পার্শ্বেও কাটাইয়াছি। তাহা ছাড়া, যখন আমাদের প্রভু-পরিবারের পুরুষেরা সকলেই লড়াই করিতে বাহির হইয়া যাইতেন তখন আমরাই তাঁহাদের গৃহের প্রহরী থাকিতাম,—

তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে রক্ষা করিতাম। সমস্ত পরিবারের 'ইজ্জৎ' এবং সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ আমাদের হাতেই থাকিত। নিগ্রোজাতির সত্যনিষ্ঠা, হৃদয়বত্তা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার আর কোন প্রমাণ আবশ্যক কি ?

অধিক কি, নিগ্রোরা অনেকক্ষেত্রে তাহাদের পূর্ব্ব মনিব-দিগকে অন্নবস্ত্র দিয়া মানুষও করিয়াছে। চিরদিন সকলের সমান যায় না। আজ যে রাজা কাল সে গোলাম, আজ যে দাস কাল সে প্রভু। সুখদুঃখ চক্রের মত ঘুরিতেছে। দক্ষিণ-প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ প্রভুসম্প্রদায়ের অনেকেই যুদ্ধের ফলে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমি জানি সেই দুঃখের সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বতন গোলামেরা তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিত। আমি জানি এইরূপে গোলামজাতির দানে মনিব-সন্তানসন্ততিরা লেখা-পড়া শিখিয়াছে। একজন মনিব-পুত্র চরিত্রহীনতার ফলে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। আমি জানি গোলামেরা নিজেদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও চাঁদা তুলিয়া এই পাপাত্মা প্রভু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কেহ তাঁহাকে কাফি পাঠাইয়া দেয়, কেহ বা চিনি কেহ বা মাংস দেয়। এই দানের উপর নির্ভর করিয়া সেই ব্যক্তি এখনও জীবন ধারণ করিতেছে। পুরাতন মনিবের পুত্র বা দূর আত্মীয় বলিয়া যদি কোন ব্যক্তি নিগ্রোর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং নিজের কষ্ট জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে, আমি সদর্পে বলিতে পারি, দক্ষিণপ্রান্তে এমন কোন নিগ্রো নাই যে, তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য না করিবে।

নিগ্রোজাতির কি হৃদয় নাই ?—নিগ্রোজাতির কি কৃতজ্ঞতা নাই ? কাল চামড়ার ভিতর কি পরমাত্মার সিংহাসন নাই ?

আমি বলিলাম নিগ্রোরা কখনও অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মভীরু, কৃতজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। তাহারা কথার দাম বুঝে, কোন প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ধর্ম্মবৎ পালন করে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের একটি কাল গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে একটা চুক্তি করিয়া লইয়াছিল। তাহার সর্ত্তে সে নিজে মনিবের আবাদে না খাটিয়া তাহার পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ কিছু টাকা বৎসর বৎসর মনিবকে দিতে প্রতিশ্রুত হয়। সেই টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য এইব্যক্তি ওহায়ো প্রদেশে স্বাধীনভাবে মজুরী করিত। বৎসর বৎসর ভার্জ্জিনিয়ায় যাইয়া প্রভুর হাতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা গুণিয়া দিত। ইতি মধ্যে লড়াই বাধে—লড়াইয়ের ফলে সমগ্র দাস-জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। পুরাতন চুক্তি, প্রতিজ্ঞা, বন্দোবস্ত ইত্যাদি সবই ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। কোন প্রভুই তাঁহার পূর্ব্বতন কোন গোলামকে কোন বিষয়ের জন্যই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে বা খাটাইতে পারিবেন না—এই আইন যুক্ত-রাজ্যের মন্ত্রণাসভা হইতে জারি হয়। সুতরাং এই গোলামটি যদি এই সুযোগে তাহার পুরাতন চুক্তি অমান্য করিত এবং প্রভুকে বাকী টাকা দিতে অস্বীকার করিত, তাহা হইলে কোন আইনে তাহাকে দোষী সাব্যস্থ করা যাইত না। কিন্তু আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এই ব্যক্তি যত দিন পর্য্যন্ত তাহার ঋণ

পরিশোধ করিতে না পারিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত পূর্ব্বেকার প্রতিজ্ঞা মত ভার্জ্জিনিয়ায় যাইয়া প্রভুর নিকট টাকা দিয়া আসিত। এমন কি, সুদের শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্তও সে দিয়া আসিয়াছিল। প্রতিজ্ঞার মূল্য নিগ্রোরা বুঝে না কি? এই কৃষ্ণকায় নিগ্রো বুঝিয়াছিল যে, সে স্বাধীন হইয়াছে বটে, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে এখন তাহার কোন দোষই হইবে না। কিন্তু সে শারীরিক স্বাধীনতা অপেক্ষা চিত্তের ও আত্মার স্বাধীনতাকেই বেশী সম্মান করিল। সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার পূর্ব্বে সে আধ্যাত্মিক মুক্তি অর্জ্জন করিয়া লইল।

তবে কি নিগ্রোরা স্বাধীনতা চাহিত না? গোলামের জাতি গোলামীগিরিতেই কি তন্ময় হইয়া গিয়াছিল? গোলামী ছাড়াইয়া উঠিতে কি আমার স্বজাতিরা ইচ্ছাই করিত না? প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের হৃদয়ে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অতিশয় বলবতীই ছিল। আমি এমন একজন নিগ্রোকেও জানি না যে স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিত না। আমি এমন একজন গোলামেরও কথা শুনি নাই যে গোলামীতেই লাগিয়া থাকিতে চাহিয়াছিল।

দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুর্ভাগ্য জাতি মাত্রেরই দুঃখ দেখিয়া আমি মর্ম্মে মর্ম্মে কষ্ট অনুভব করি। এইরূপে শৃঙ্খলিত জাতির অশেষ দুরবস্থা। কোন কারণে একবার পরাধীন হইয়া গেলে সে জাতি শীঘ্র সেই অবস্থা কাটিয়া উঠিতে পারে না। তাহাদের সমাজ-বন্ধন, তাহাদের পারিবারিক জীবন সকলই এই পরাধীনতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায়। অন্নসংস্থানের

উপায়গুলিও এই দাসত্বের সর্ব্বমুখী প্রভাবের অধীন হইয়া পড়ে। চলিতে ফিরিতে গেলেও সেই প্রভাব ভুলিয়া থাকা যায় না। কাজেই দাসজাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভকরা বড় সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আমি এই কারণে আমার প্রভুদের সম্বন্ধে কখনও কোন শত্রুভাব পোষণ করি নাই। দাসত্ব অনেকটা জীবন-যাপনের স্বাভাবিক আব্‌হাওয়ার মধ্যেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দাসত্বপ্রথা বাদ দিয়া সেই যুগের যুক্তরাজ্যে কোন অনুষ্ঠানই চলিতে পারিত না। যুক্তরাজ্যের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, সমাজ, ধর্ম্ম সবই গোলামী-প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল! ফলতঃ এই গোলামীগিরিকে দোষ দেওয়া সত্যসত্যই বড় অবিচারের কার্য্য।

এমন কি, আমি এ কথা বলিতেও বাধ্য যে, গোলামীর ফলে নিগ্রোজাতির যথেষ্ট উপকারই সাধিত হইয়াছে। দাসত্বের আব্‌হাওয়ায় আমাদের অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য অনেকটা পুষ্ট হইয়াছে—আমরা নিয়মিতরূপে প্রণালীবদ্ধভাবে কাজ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের কর্ম্মপটুত্ব জন্মিয়াছে। আমরা অনেকটা চিন্তাশীল হইয়াছি। কৃষি ও শিল্পবিদ্যায় আমাদের 'হাতে-কলমে' শিক্ষালাভ হইয়াছে। আমাদের নৈতিক চরিত্রও কিছু গঠিত হইয়াছে—ধর্ম্মভাবও জাগিয়াছে। আমেরিকার গোলামাবাদগুলির আব্‌হাওয়া আমাদের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি বিদ্যালয়স্বরূপই ছিল। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মনিবদিগকে এজন্য আমি সর্ব্বদা সম্মান করিয়াই আসিয়াছি।

আমি গোলামী-প্রথার পক্ষপাতী নহি—দাসত্ব-প্রথা ভাল এ কথা আমি বলিতে চাহি না—সংসারে গোলামীগিরির আবশ্যকতাও আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমি জানি আমার প্রভুরা আমাদিগকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন নাই। আমি জানি যে তাঁহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমাদিগকে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি জানি—আমরা যে কোন দিন মানুষ হইয়া উঠিব তাহা ইঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই—এবং মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য সজ্ঞানে কোন চেষ্টাও করেন নাই। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, ভগবানের কর্ম্মকৌশল বিচিত্র। জগদীশ্বর যাহা করেন সবই মঙ্গলের জন্য। প্রথম দৃষ্টিতে যাহা তিক্ত ও কঠোর, পরিণামে তাহাই মধুময় ফল প্রসব করে। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই উপায়ে জগতের মহৎকর্ম্মগুলি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বে কত অসম্ভব সম্ভব হইতেছে। মানুষ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিধাতার মঙ্গলহস্তে যন্ত্রের ন্যায় চালিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। এই আশাতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য এত কথা বলিলাম।

আজ কাল লোকেরা আমায় জিজ্ঞাসা করে—"তুমি এই ঘোরতর দৈন্য, অজ্ঞতা, ও কুসংস্কাররাশির মধ্যে থাকিয়াও নিগ্রো-জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিরূপে এত আশান্বিত?" আমার এক-মাত্র উত্তর এই যে, আমি ভগবানের মঙ্গলবিধানে বিশ্বাসবান্। যাঁহার করুণায় নানা দুর্দ্দৈবের ভিতর দিয়া আমরা এতদূর উঠিয়াছি

তাঁহারই করুণায় আমরা আরও উন্নত হইব। নিগ্রো-জাতি জগতের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্বকীয় কৃতিত্ব দেখাইয়া জগদীশ্বরের অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিবে।

আমি বলিলাম গোলামীর ফলে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে। অবশ্য অপকারও কম হয় নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস—আমাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভু মহোদয়গণেরই ক্ষতি বেশী হইয়াছে। মনিব মহাশয়েরা বিলাসে ডুবিতে লাগিলেন। শারীরিক পরিশ্রম তাঁহাদের কষ্টকর বোধ হইত। বড় মহলে খাটিয়া খাওয়া একটা নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচিত হইত। ক্রমশঃ তাঁহারা সকল বিষয়ে স্বাবলম্বন, এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইলেন। প্রভুগণের সন্তানেরা কেহই কোন কৃষি বা শিল্পের পটুত্ব লাভ করিতে শিখিল না। মনিবের কন্যারা কেহই রাঁধিতে, শেলাই করিতে অথবা ঘর ঝাড়িতেও শিখিল না। সকল কাজই দাসেরা করিত। কিন্তু গোলামদিগের স্বার্থ আর কতটুকু ? তাহারা কোন উপায়ে কাজ সারিয়া মনিবকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত মাত্র। সুচারুরূপে বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ করিতে দাসেরা শিখিত না। ফলতঃ, প্রভুপরিবারে কোন শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম না। লক্ষ্মীশ্রী যাহাকে বলে মনিবমহলের গৃহস্থালীতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইত না। ঘর ভালরূপ পরিষ্কৃত থাকিত না। জানালার খড়খড়িগুলি ভগ্নাবস্থায় বহুদিন পড়িয়া থাকিত। জানালার খিল না থাকিলে তাহা লাগাইবার জন্য কেহই মাথা ঘামাইত না। যাহা যেখানে পড়িত তাহা সেখানে সেই অবস্থাতেই পচিত।

খাওয়া দাওয়ারও সুখ মনিব-মহলে দেখি নাই। কোন দিন ঝাল বেশী পড়িত—নুন কম পড়িত। কখনও তাঁহারা মাংস আধ কাঁচাই খাইতেন—কোন দিন বা বেশী পোড়া খাদ্যই তাঁহাদের কপালে জুটিত। অর্থব্যয় কম হইত না—সকল বিষয়েই অপব্যয় যৎপরোনাস্তি হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি লক্ষ্মীশ্রী মনিব-মহল হইতে বিদায় লইয়াছিল।

ক্রমশঃ দেখা গেল যে, গোলামেরাই মনিবসমাজ অপেক্ষা বেশী সুখে আছে। যে সময়ে মনিবেরা বিলাসসাগরে ভাসিয়া অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে গোলামেরা সকলেই কর্ম্মনিষ্ঠা, পরিশ্রম-স্বীকার, ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিতেছিল। যখন তাহারা স্বাধীনতা পাইল তাহাদের পক্ষে নবজীবন আরম্ভ করিতে বিশেষ কোন কষ্ট হইল না। গোলামীর যুগের শিক্ষাই স্বাধীনতার যুগের কাজকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিল। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যারই তাহাদের অভাব ছিল। তাহা ছাড়া অনেক বিষয়েই তাহাদের চরিত্র ও বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাহারা কোন না কোন কৃষিকর্ম্মে বা শিল্পকার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মনিব মহাশয়দের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইল। তাঁহারা গোলামদিগকে খাটাইতে খাটাইতে নিজেরাই সকল বিষয়ে যথার্থ গোলাম, পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভর হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে লড়াই শেষ হইয়া গেল। আমরা মুক্তি পাইলাম। গোলামাবাদে মহা আনন্দের রোল উঠিল। আমরা

যে স্বাধীন হইতে পারিব সংগ্রামের অবস্থা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। কারণ প্রায়ই দেখিতাম দক্ষিণপ্রান্তের মুনিবেরা হারিয়া গৃহে ফিরিতেছেন—কেহ পলাইতেছেন—কেহ ঘরবাড়ী সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। উত্তরপ্রান্তের ইয়াঙ্কি সৈন্যেরা দলে দলে গোলামাবাদগুলি দখল করিতে আসিবে—এইরূপ ভাবিয়া আমাদের প্রভুগণ টাকা-কড়ি মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরাই এই লুক্কায়িত ধনের পাহারায় নিযুক্ত হইলাম। আমরা ইয়াঙ্কি সৈন্যগণকে অন্ন বস্ত্র জল ইত্যাদি সকল জিনিসই দিতাম—কিন্তু সেই লুক্কায়িত ভাণ্ডার কাহাকেও দেখাই নাই। কারণ আমা-দিগকে বিশ্বাস করিয়া প্রভুরা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

যতই দিন অগ্রসর হইতে লাগিল আমরা গলা ছাড়িয়া গান সুরু করিলাম। আগে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতাম মাত্র। ক্রমশঃ আওয়াজ বাড়িল—সন্ধ্যার আমোদ গভীর রাত্রে শেষ হইতে লাগিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেই অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিলাম। এই আনন্দ-উৎসবের সময়ে আমরা স্বাধীনতার গানই গাহিতাম। পূর্ব্বেও আমরা অনেক সময়ে স্বাধীনতার গান গাহিয়াছি। কিন্তু তখন যদি কেহ স্বাধীনতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিত আমরা তাহাকে বুঝাইয়া দিতাম যে তাহা পরলোকের স্বাধীনতা মাত্র—আত্মার মুক্তি মাত্র। এক্ষণে আমরা আর সেই আবরণ রাখিলাম না। এক্ষণে আমরা সোজাসুজি বলিতাম যে স্বাধীনতার অর্থ এই জগতেরই স্বাধীনতা—এই

ভৌতিক শরীরেরই মুক্তি—অন্নবস্ত্র, চলা-ফেরা ইত্যাদি সকল বিষয়ের বন্ধনহীনতা।

সেই মহা আনন্দের দিনের পূর্ব্ব রাত্রে গোলামখানার মহলে মহলে সংবাদ পাঠান হইল "কাল সকালে প্রভুদের বড় কুঠিতে একটা বিশেষ সম্মিলন হইবে। তোমরা সকলেই উপস্থিত হইও।" সেই রাত্রে আমাদের আর ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়াই আমরা প্রভুর গৃহে সমবেত হইলাম। দেখিলাম মনিব-পরিবারের সকলেই বারান্দায় দাঁড়াইয়া বা বসিয়া আছেন। সকলকেই যেন কিছু চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দেখিলাম—কিন্তু কাহাকেও বিশেষ দুঃখিত বলিয়া বোধ হইল না। বরং মনে হইতে লাগিল যে তাঁহারা আর্থিক ক্ষতির জন্য বেশী চিন্তা করিতেছেন না—তাঁহারা যে এতদিনের সঙ্গী ও আত্মীয়গণকে একদিনে বিদায় দিবেন সেই দুঃখেই তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া রহিয়াছে। আর দেখিলাম একজন নূতন পুরুষকে, ইনি বোধ হয় যুক্তরাজ্যের কোন কর্ম্মচারী। তিনি একটা লম্বা কাগজ হাতে করিয়া একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলেন। তার পর সেই কাগজ হইতে পাঠ করিলেন—স্বাধীনতার ঘোষণা।

পড়া শেষ হইয়া গেল, আমাদিগকে বলা হইল যে আমরা স্বাধীন হইয়াছি। যাহার যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারি। এখন হইতে যাহার যে কাজ ভাল লাগে সে সেই কাজই করিতে পারে। আমার মাতা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। তার পর তিনি বলিলেন যে,

এই দিনের জন্যই তিনি এত কাল প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ দুঃখ এই ছিল যে, বোধ হয় তিনি এই সুখের দিন দেখিবার পূর্ব্বেই মারা যাইবেন।

কিয়ৎকাল সর্ব্বত্র নাচানাচি এবং ধন্যবাদের পালা পড়িল। আনন্দের আর সীমা নাই—বিকট উল্লাসে সকলেই যেন অধীর। কিন্তু প্রতিহিংসা বা মনিবদের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রবৃত্তি কোথায়ও লক্ষ্য করি নাই।

আনন্দের ধ্বনি ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। পরে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত গোলাম-মহলে চিন্তা আসিয়া জুটিল। স্বাধীন ত হইলাম; কিন্তু স্বাধীনতার দায়িত্ব ত বড় কম নয়? স্বাধীনভাবে চলিতে ফিরিতে হইবে—স্বাধীনভাবে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। নিজে মাথা খাটাইয়া নিজ নিজ অভাব মোচন করিতে হইবে—নিজ বাহুবলে ও নিজ চরিত্রবলে গৃহস্থালী, পরিবার-পালন, সন্তানরক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলই চালাইতে হইবে। এ যে বিষম দায়িত্ব। দশ বৎসরের একটি বালককে যেন তাহার বাপ মা বলিলেন যে "বাছা তুমি নিজ শক্তিবলে যাহা পার কর—চরিয়া খাও—আমাদের কোন সাহায্য পাইবে না!" আমাদের পক্ষেও ঠিক যেন এইরূপ আদেশ হইল। ইহা অনুগ্রহ কি নিগ্রহ ভুক্তভোগী ভিন্ন কে আর তাহা বুঝিবে?

সমগ্র য়্যাংগ্লো-স্যাক্সন জাতি হাজার বৎসরেও যে সকল সমস্যার মীমাংসা এখনও সুন্দররূপে করিয়া উঠিতে পারে নাই, নিগ্রোজাতির ঘাড়ে সেই সমস্যার সমাধান করিবার ভার হঠাৎ

চাপাইয়া দেওয়া হইল। কাজেই দেখিতে দেখিতে স্বাধীনতা-লাভের আনন্দ গোলামাবাদের মহলে মহলে গভীর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে পরিণত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে স্বাধীনতা-রত্নের জন্য তাহারা অনেকে এতদিন অশ্রু ফেলিয়াছে, আজ যখন তাহা সত্য সত্যই তাহাদের করতলগত হইল, তখন যেন তাহারা ভাবিতে লাগিল—"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" অনেকের বয়স প্রায় ৭০।৮০ বৎসর। তাহারা নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। ইহাদের পক্ষেই কষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অধিকন্তু, তাহারা এত কাল মনিবদের সেবা করিয়া তাঁহাদের প্রতি সত্য সত্যই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধন জন্মিয়াছিল। তাঁহারা যে ইহাদের আপন হইতেও আপন। তাঁহাদের পারিবারিক সুখে ইহারা যে কতই না সুখ অনুভব করিয়াছে এবং দুঃখে কতই না কষ্ট ভোগ করিয়াছে। যাঁহাদের সঙ্গে বসবাস করিয়া অর্দ্ধ শতাব্দী কাটিয়াছে, তাঁহাদের মায়া যে কোন মতেই ছাড়ে না। সমস্ত গোলামাবাদের আব্হাওয়াতেই তাহাদের জীবন পুষ্ট হইয়াছে। তাহাদের হৃদয়ের শিকড়গুলি প্রভুর পুত্র-কন্যায় এবং মনিবের সম্পত্তিতে দৃঢ়ভাবেই প্রবেশ করিয়াছে। সেই হৃদয়ের সম্বন্ধ একদিনে ছিঁড়িয়া ফেলা কি সম্ভবপর? সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করিলে কি তাহারা বাঁচিতে পারে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমার বাল্য-জীবন

স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ প্রান্তের গোলামেরা তাহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিল। প্রথম সাব্যস্থ হইল যে তাহাদের নামগুলি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। গোলামী যুগের নাম রাখা আর কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। আর একটা প্রস্তাবেও সকলেরই যথেষ্ট আগ্রহ দেখা গেল। তাহারা স্থির করিল যে কিছু দিনের জন্য গোলামাবাদের বাহিরে যাইয়া তাহাদের বাস করা আবশ্যক। তাহা হইলেই তাহারা সত্য সত্য স্বাধীন হইয়াছে কিনা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। বিশেষতঃ গোলামখানার গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারাটাই তাহাদের নব প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রথম লক্ষণ বিবেচিত হইবে।

গোলামীর যুগে দাসগণের নামগুলিও গোলামীসূচক ছিল। তাহাদের নামের আগে পিছে কোন পদবী বা সম্মান বা জাতি বা ব্যবসায় বা ধর্ম্মবাচক কোন শব্দ সংযুক্ত থাকিত না। একটি মাত্র শব্দেই তাহাদের নাম প্রকাশিত হইত। কেহ 'জন,' কেহ বা 'সুদান,' কেহ 'হরা,' কেহ বা 'পদা,' ইত্যাদি। বড় জোর প্রভুর উপাধি বা পদবী এই সকল নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইত।

-প্রভুর পদবী 'হ্যাবরে' থাকিলে, তাঁহার দাসেরা 'হ্যাবারের জন' বা 'জন হ্যাবার' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত। 'জন' ত হ্যাবারের সম্পত্তি বিশেষ। হ্যাবারের কুকুর বলিলে কুকুরে হ্যাবারে যেরূপ সম্বন্ধ বুঝায় এবং কুকুরকে যেরূপ সহজে চিনিয়া লওয়া যায়, 'হ্যাবারের সুসান' এই নামেও সুসানের সঙ্গে হ্যাবারের সেইরূপ সম্বন্ধ বুঝাইত এবং সেইরূপ সহজেই দাস-মহল হইতে সুসান গোলামকে চিনিয়া লওয়া যাইত। বলা বাহুল্য এরূপ নামকরণে স্বাধীনতার গন্ধ মাত্র নাই—ব্যক্তি একটী নির্জ্জীব পদার্থ স্বরূপ, কেনা গোলাম মাত্র। প্রভু যেন তাহার কপালে একটা দাগ দিয়া নিজ সম্পত্তির হিসাব ও চিহ্ন রাখিয়াছেন মাত্র।

সুতরাং পুরাতন নাম বর্জ্জন এবং নূতন নাম গ্রহণই স্বাধীন নিগ্রোর সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। প্রভুদের নাম নিজ নিজ নাম হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পরিবর্ত্তে কেহ 'জন এস্‌লিঙ্কলন্' কেহ 'জন এস্ শার্ম্মান' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। মধ্যস্থলে 'এস্' শব্দের কোন অর্থ ই থাকিত না। তিন শব্দের নাম রাখিতেই হইবে—সুতরাং প্রথম শব্দে প্রকৃত নাম, তৃতীয় শব্দে উপাধি বা পদবী, দ্বিতীয় শব্দে যা হয় কিছু বুঝান হইত।

তাহার পর গোলামাবাদ ছাড়িয়া সকলেই কিছু দিনের জন্য এদিক ওদিক ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। পরে কেহ কেহ ফিরিয়া আসিয়া পুরাতন মনিবের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কারবার করিবার

জন্য নূতন নূতন চুক্তি বা বন্দোবস্ত করিয়া লইল। বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করা কঠিন। যাহারা এইরূপে পুরাতন মনিবের সঙ্গেই বসতি করিতে চাহিল, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধদের সংখ্যাই বেশী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি আমার জনককে কখনও দেখি নাই। আমার মাতার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী ছিলেন। তাঁহাকেও বড় বেশী দেখি নাই। আমরা যে মনিবের গোলাম ছিলাম তিনি সেই মনিবেরই গোলাম ছিলেন না। তাঁহার গোলামীর কর্ম্মক্ষেত্র কিছু দূরে ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেই তিনি পলাইয়া একটা নবগঠিত প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রদেশের নাম ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া। সেই সময়ে লড়াই চলিতেছিল—এজন্য তাঁহার পলায়নের বিশেষ বিঘ্ন ঘটে নাই। যখন সকল দাসেরই স্বাধীনতা ঘোষিত হইল, তিনি আমার মাতাকে আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নূতন বাসভবনে আসিতে আদেশ করিলেন। ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে যাইতে হইলে পার্ব্বত্য প্রদেশ পার হইয়া যাইতে হয়। দূরও বড় কম নয়—প্রায় ৭০০।৮০০ মাইল। আমাদের জামা কাপড় ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যাহা হউক গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা সকলে যাত্রা করিলাম। অবশ্য বেশী পথ হাঁটিয়াই চলিয়াছিলাম।

আমরা পূর্ব্বে কোনদিনই এক প্রদেশ ছাড়িয়া অন্য প্রদেশে যাই নাই। এমন কি, গোলামাবাদ ছাড়িয়া বেশী দূর যাইবার অবসর বা কারণও কখন উপস্থিত হয় নাই। এইবার কাজেই আমাদের বিদেশযাত্রার সমারোহ মনে হইয়াছিল। পুরাতন

মনিবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। সে দৃশ্য অতিশয় হৃদয়বিদারক। সেই চির-বিদায়ের কথা সর্ব্বদা আমার মনে আছে। তাঁহাদের সঙ্গে এখন পর্য্যন্ত আমি চিঠি-পত্রের আলাপ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এখনও তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারি নাই।

রাস্তায় কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। খোলা মাঠে শুইতাম, গাছতলায় রাঁধিয়া খাইতাম। এক রাত্রে একটা পুরাতন ভাঙ্গা-বাড়ী পাইয়া আমার মাতা তাহার মধ্যে রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সেই বাড়ীতে একটা 'ষ্টোভ' ছিল। ষ্টোভের ভিতর আগুন জ্বালিবা মাত্র উহার নলের ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড কাল সাপ বাহির হইয়া আসিল। আমরা 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়া সেই গৃহে ভোজন-শয়নের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলাম। এইরূপে নানা সুখদুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। নগরটি ক্ষুদ্র—নাম ম্যাল্‌ডেন। ইহার পাঁচ মাইল দূরেই ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া-প্রদেশের রাজধানী বা প্রধান নগর চার্লষ্টন।

এই সময়ে ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়ায় নুনের কারবার বেশ চলিতেছিল। আমাদের নগরের ভিতরেই এবং আশেপাশে অনেকগুলি নুনের কল ছিল। এইরূপ একটা কলে আমার মাতার স্বামী একটা চাকরী পাইয়াছিলেন। তাহার নিকটেই তিনি একটা কামরাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই কামরা আমাদের পুরাতন গোলামখানার কুঠুরী অপেক্ষা খারাপই

হইবে, কোন অংশেই ভাল নয়। গোলামাবাসের কুঠুরিগুলি যেরূপই থাকুক না কেন, তাহার বাহিরে আসিলে নির্ম্মল বাতাস যথেষ্ট পাইতাম। কিন্তু এই স্বাধীন বাসভবনে ইহার অভাব যৎপরোনাস্তি। কামরাগুলি এত লাগালাগি এবং চারি ধারে এত ময়লা জমিয়া থাকে যে একটা প্রকাণ্ড নরকের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি মনে হইত।

আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সাদা কাল দুই প্রকার লোকই ছিল। সাদা চামড়ার লোকেরা অবশ্য শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের অতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের না ছিল বিদ্যাবুদ্ধি, না ছিল পরিচ্ছন্নতা, না ছিল ধর্ম্ম-ভয়। বরং অধর্ম্ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার যেন সেই আব্‌হাওয়ার মধ্যে অপ্রতিহতগতিতে বিরাজ করিত।

পাড়ার প্রায় সকলেই নুনের কলে কাজ করিত। আমার বয়স অত্যন্ত অল্পই ছিল। তথাপি আমার মাতার স্বামী আমাকে একটা কাজে লাগাইয়া দিলেন। আমার দাদাও একটা কাজে লাগিয়া গেল। আমাকে প্রত্যূষে চারিটা হইতে কাজ করিতে হইত।

এই নুনের কলে কাজ করিতে করিতে আমার প্রথম কেতাবী-শিক্ষা লাভ হয়। নুন বস্তাবন্দি করিবার পর বস্তার গায়ে একটা করিয়া নম্বর বসাইবার নিয়ম ছিল। আমার অভিভাবকের চিহ্ন ছিল ১৮। প্রতিদিন কলের কাজ শেষ হইবার সময়ে কলের একজন বড় সাহেব আসিয়া আমার অভিভাবকের বস্তাগুলির উপর

১৮ এই চিহ্ন লিখিয়া যাইত। আমি আর কোন চিহ্ন চিনিতাম না। অনবরত দেখিতে দেখিতে ১৮ চিহ্নটি আমার সুপরিচিত হইয়া গেল।

আমার প্রথম হইতেই লেখা পড়া শিখিবার বড় সাধ ছিল। শৈশবেই আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে জীবনে যদি আর কিছুই না করিতে পারি অন্ততঃ যেন কিছু বিদ্যালাভ করিয়া মরিতে পারি। আর কখনও যদি আমি লেখাপড়া শিখি তাহা হইলে অন্ততঃ সাধারণ খবরের কাগজ এবং সাদাসিধা পুস্তকাবলী পড়িয়া বুঝিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব। এখানে আসিবার পর আমার মাতাকে অনুরোধ করিয়া একখানা পুস্তক আনাইয়া লইলাম। ওয়েব্‌ষ্টারের 'বর্ণ-পরিচয়' বই আমার হস্তগত হইল। আমি অতি মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম। কোন শিক্ষকেরই সাহায্য পাই নাই। যাহা হউক, যেন তেন প্রকারেণ অক্ষরগুলি চিনিয়া ফেলিলাম। আমার মাতাই আমার এই প্রাথমিক শিক্ষা-লাভের চেষ্টায় একমাত্র সহায় ছিলেন। তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা কিছুই ছিল না সত্য—কিন্তু তাঁহার সাংসারিক জ্ঞান, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা, সৎসাহস, দৃঢ় সঙ্কল্প, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি অশেষ গুণ ছিল। কাজেই আমার উচ্চ অভিলাষে তিনি যথেষ্টই সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট উৎসাহ না পাইলে আমার জীবনের গতি হয়ত অন্যরূপ হইত।

ইতিমধ্যে একটি নিগ্রো বালক ম্যাল্‌ডেনে আসিল। সে ওহায়োপ্রদেশের কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিত। তাহাকে

পাইয়া আমার নিগ্রো স্বজাতিরা যেন চাঁদ হাতে পাইল। তাহার আদর দেখে কে? প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কাজ-কর্ম্ম সারিয়া আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিতাম। সে একটা খবরের কাগজ পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইত ও বুঝাইয়া দিত। সে আমাদের পাড়ার গুরু মহাশয় হইয়া পড়িল। তাহার এই সম্মান ও ক্ষমতা দেখিয়া আমি সত্যসত্যই তাহাকে হিংসা করিতাম। মনে হইত তাহার সমান বিদ্যার অধিকারী হইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহি না।

ক্রমশঃ আমাদের পল্লীতে নিগ্রোদের জন্য একটা পাঠশালা খুলিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল। মহা ধূমধাম আরম্ভ হইল। কৃষ্ণকায়-সমাজে একটা বিদ্যালয়ের কথা এ অঞ্চলে আর পূর্ব্বে কখনও ওঠে নাই। সর্ব্বত্রই আন্দোলন পৌঁছিল। প্রধান সমস্যা হইল—শিক্ষক পাওয়া যায় কোথায়? ওহায়োর সেই বালকের নামই সকলের মুখে মুখে রহিয়াছে। কিন্তু সে যে নিতান্তই ছ্যাংড়া। যাহা হউক, ওহায়ো হইতে আর একজন শিক্ষিত যুবক ম্যাল্‌ডেন নগরে হঠাৎ আসিয়া দেখা দিল। তাহার বয়স সম্বন্ধে কোন আপত্তি হইল না। সে কিছুকাল সেনা-বিভাগেও কাজ করিয়াছে। সুতরাং তাহাকেই শিক্ষকপদে নিযুক্ত করা হইল।

পাঠশালার খরচ চালাইবার জন্য নিগ্রোরা সকলেই মাসিক কিছু কিছু চাঁদা দিতে স্বীকৃত হইল। শিক্ষকের বেতন জোগান কঠিন। কাজেই বন্দোবস্ত হইল যে, সে প্রত্যেক পরিবারে

একদিন করিয়া শয়ন ভোজন করিবে। এইরূপে চাঁদা করিয়া খাওয়ানব্যবস্থা শিক্ষকের পক্ষে মন্দ নয়। কারণ যেদিন যে পরিবারের পালা সেদিন তাহারা শিক্ষককে যথাসম্ভব 'চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়' না দিয়া থাকিতে পারে কি? আমার মনে আছে—আমি আমাদের পরিবারের সেই 'মাষ্টারের দিন' কবে আসিবে ভাবিয়া সুখী হইতাম। সেই দিন ফাঁকতালে আমারও বেশ ভাল খাদ্যই জুটিত!

এই প্রণালীতে আর কোথাও বিদ্যালয় হইয়াছে কি? আমি জানি না। সমস্ত জাতিটাই যেন একটা পাঠশালা—সমস্ত গ্রামটাই যেন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অঙ্গ—পাড়ার সকল লোকই যেন বিদ্যালয়ের ছাত্র, অভিভাবক, পরিচালক। সমগ্র জাতির পক্ষে বিদ্যারম্ভ ও "হাতে খড়ী" হইল। এই উপায়ে আর কোন জাতি জগতের ইতিহাসে গড়িয়া উঠিয়াছে কি?

নিগ্রো-সমাজের কেহই এই শিক্ষার আন্দোলনে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ রহিল না। বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলেই আগ্রহের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। "মরিবার পূর্ব্বে যেন অন্ততঃ বাইবেল-গ্রন্থ পড়িতে পারি"—এই আকাঙ্ক্ষায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ লোকেরাও বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল। কোনরূপে শিক্ষক পাইলেই পাঠশালা খোলা হইত। দিবাবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ পাঠশালার সাহায্যে নিগ্রোপল্লীতে বর্ণ-জ্ঞান, বানান, সরল ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ইত্যাদি প্রচারিত হইতে লাগিল।

যাহা হউক, আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় ত প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু আমার কপাল ফিরিল না। আমি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পাইলাম না। আমার অভিভাবক আমাকে নুনের কলে খাটাইয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। বড়ই অনুতাপের বিষয় হইত যখন আমি কল হইতে দেখিতাম যে, আমারই সমানবয়স্ক নিগ্রো-বালকেরা সকালে সন্ধ্যায় স্কুলে যাওয়া আসা করিতেছে। অবশ্য আশা ছাড়িলাম না। আমি আমার সেই ওয়েব্‌ষ্টারের 'প্রথম ভাগ'ই পূর্ব্বের ন্যায় পড়িতে থাকিলাম।

পরে পাঠশালার গুরুমহাশয়ের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। রাত্রে যাইয়া তাঁহার নিকটে কিছু কিছু শিখিয়া আসিতাম। এই উপায়েই আমি অনেকটা শিখিয়া ফেলিলাম। আমি নৈশবিদ্যালয়ের উপকারিতা নিজ জীবনে যেরূপ উপলব্ধি করিয়াছি আর কেহ তাহা বোধ হয় করেন নাই। এইজন্য আমি আজকাল নৈশবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার এত পক্ষপাতী। এই অভিজ্ঞতার সাহসেই আমি পরে হ্যাম্পটনে এবং টাস্কেজীতে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছি।

কিন্তু কেবলমাত্র নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়াই আমি কোন মতে স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম—দিবাভাগের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবই হইব। কান্নাকাটি করিতে করিতে অভিভাবকের অনুমতি পাইলাম। স্থির হইল যে, আমি খুব সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই নয়টা পর্য্যন্ত কলে কাজ করিব। পরে বিদ্যালয়ে যাইব এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পরেই আরও দুই ঘণ্টা কলে কাজ করিব।

আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু বড় কঠিন ব্যাপার। পাঠশালা নয়টার সময়েই বসে—অথচ আমার বাড়ী হইতে ইহার দূরত্বও কম নয়। কাজেই নয়টা পর্য্যন্ত কলে কাজ করিয়া স্কুলে পৌঁছিতে রোজই আমার দেরী হইতে লাগিল। এ অসুবিধা এড়াইবার জন্য আমি একটা ফিকির করিলাম। আপনারা আমার দুষ্টামী দেখিয়া চটিবেন। কিন্তু কি করিব? সত্য কথা বলিতেছি। আমাকে বাধ্য হইয়াই অসত্যের পথ ধরিতে হইয়াছিল। কলের আফিসে একটা ঘড়ি ছিল। সেই ঘড়ি দেখিয়া সকলে কাজ-কর্ম্মের সময় ঠিক করিত। আমি রোজ সকালে যাইয়া সেই ঘড়ির কাঁটা সরাইয়া দিতাম। ঠিক ৮॥০ সময়ে ৯টা বাজিয়া যাইত। আমি কল ছাড়িয়া যথা সময়ে পাঠশালায় পৌঁছিতাম। পরে বড় সাহেব ব্যাপার বুঝিয়া আফিস-ঘরে চাবি লাগাইয়া দিলেন। আমি আর ঘড়ির কাঁটা সরাইতে পারিতাম না।

পাঠশালায় ত ভর্ত্তি হইলাম। হইয়াই বিপদ। সকল ছাত্রের মাথায়ই একটা করিয়া টুপি। কিন্তু আমার মাথায় কোন আবরণই ছিল না। মাথায় টুপি দিবার প্রয়োজন আছে কি না তাহা অবশ্য আমি পূর্ব্বে কখনও চিন্তা করিতেই পারি নাই। পাঠশালায় যাইবামাত্রই আমার অভাব বুঝিতে পারিলাম। তখন আমাদের অঞ্চলে নূতন ফ্যাশনের এক টুপি উঠিয়াছে। ছেলে বুড়ো সকলেই সেই টুপি ব্যবহার করে। আমার মাতার অত পয়সা নাই। তিনি দুই টুকরা কাপড় দিয়া ঘরেই একটা টুপি শেলাই করিয়া দিলেন। আমি টুপি মাথায় দিলাম।

আমি এই ঘটনায় একটা বড় শিক্ষা পাইয়াছিলাম। তাহা আমি চিরজীবন কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার মাতা কখনও লোক-দেখান বাবুগিরি বা সামাজিকতা অথবা লৌকিকতার ধার ধারিতেন না। সর্ব্বদাই নিজের আর্থিক অবস্থানুসারে তিনি গৃহস্থালী চালাইতেন। অন্যান্য অনেক নিগ্রোকে দেখিয়াছি—যাহাদের পেটে অন্ন জুটে না—কিন্তু নূতন ফ্যাশনের টুপি মাথায় দিয়া বেড়াইতে না পারিলে ঘুম হয় না! এজন্য তাহারা ঋণগ্রস্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আমার মাতার সৎসাহস দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। তিনি ধার করিয়া বাবুগিরি ও ফ্যাশনের দাস হইলেন না। তৎকালীন নিগ্রো-সমাজের পক্ষে এরূপ চরিত্রবত্তা নিতান্তই বিরল। আজ অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে আমার সমপাঠীদের ভিতর যাহারা বাবুগিরি ও বিলাসের নূতন নূতন অনুষ্ঠানগুলি ব্যবহার করিত তাহারা পরে অনাহারে দুঃখে দারিদ্র্যে জীবন কাটাইয়াছে।

পাঠশালায় ভর্ত্তি হইবার সময়ে আমাকে আর একটা বিপদ উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এতদিন আমাকে লোকে 'বুকার' বলিয়া ডাকিত। তাহাই আমার নাম জানিতাম। স্কুলে যাইবা-মাত্রই নাম লইয়া মহা গোলযোগে পড়িলাম। প্রত্যেক ছাত্রেরই দুইটা শব্দে নাম ডাকা হইতেছে। কাহারও বা তিন শব্দে নাম সম্পূর্ণ। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় যখন আমার নাম খাতায় তুলিবেন তখন কি বলিব? ভাবিতে ভাবিতে

একটা ঠিক করিয়া লইলাম। যেই শিক্ষক আমার গোটানাম শুনিতে চাহিলেন, আমি গম্ভীরস্বরে বলিয়া দিলাম 'বুকার ওয়াশিংটন' যেন চিরদিন আমাকে লোকে এই নামেই জানে। পরে শুনিয়াছি, আমার মাতা আমাকে 'বুকার ট্যালিয়াফারো' নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু 'ট্যালিয়াফারো' শব্দ কোন কারণে আমার মনে ছিল না। যখন ইহা জানিলাম তখন হইতে আমি তিন তিনটা শব্দের নাম ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। সুতরাং আজ আমি বুকার ট্যালিয়াফারো ওয়াশিংটন।

অনেক সময়ে আমি নিজকে কোন বড় লোকের সন্তানরূপে কল্পনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেন আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ধনী-সচ্চরিত্র, সুপণ্ডিত ইত্যাদি ছিলেন। যেন উত্তরাধিকারের সূত্রে আমি বংশ-গৌরব, সামাজিক কীর্ত্তি, জমিদারী ইত্যাদির অধিকারী হইয়া জন্মিয়াছি। যেন আমি একটি বনিয়াদি ঘরের সন্তান। কিন্তু এইরূপ কল্পনায় আমি বিশেষ সুখী হইতাম না। আমি বুঝি, পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের দোহাই দিয়া যদি আমি বড় হইতে যাই তাহা হইলে আমার নিজের কৃতিত্ব কি হইল? পরের ঘাড়ে চড়িলে সকলকেই বড় দেখায়। নিজ ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রভাব তাহাতে কিছু বুঝা যায় কি? তাহা ছাড়া উন্নতির পথে একটা বড় অসুবিধা বোধ হয় আসিয়া জুটে। সকল বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, পরের ধনে পোদ্দারি করিতে ইচ্ছা হয়। নিজে খাটিয়া নিজের কাজ নিজে সম্পন্ন করিতে সুযোগ বেশী পাওয়া যায় না। নিজের দায়িত্বজ্ঞান এবং কর্ত্তব্যবোধও কমিতে থাকে।

এই সঙ্গে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। নিগ্রোদের পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই। অতীত ইতিহাসের নজির আনিয়া তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করিবার কোন উপায় নাই। এমন কি তাহাদের অতীত নাই বলিলেই চলে—যাহা আছে তাহা অন্ধকারময়, হয়ত ঘৃণ্য, নিন্দনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আপনারা তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না—তাহাদের বর্ত্তমান কার্য্য-কলাপ বিচার করিতে যাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। তাহারা জাতীয় জীবন আরম্ভ করিতেছে মাত্র, সমগ্র নিগ্রোজাতির এখন শৈশব অবস্থা। কাজেই তাহাদের বিঘ্ন অনেক, অসুবিধা অনেক, অকৃতকার্য্যতার কারণ অনেক। আপনারা বহুদিন হইতে জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, আপনারা প্রারম্ভিক যুগের নৈরাশ্য, অকৃতকার্য্যতা ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া সফলতার পথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখন 'হাতে খড়ী'র অবস্থা। আপনাদের আজকালকার কাজ-কর্ম্ম দেখিবার পূর্ব্বে সকলে ধরিয়া রাখে যে আপনারা কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু আমরা কাজ আরম্ভ করিলে লোকেরা ভাবিয়া থাকে যে আমাদের অকৃতকার্য্যতাই সুনিশ্চিত। আমাদের সফলতা 'হাতের পাঁচ' স্বরূপ। কারণ আর কিছুই না—পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনারা প্রবীণ, আমরা নবীন, আপনাদের এখন জীবন-মধ্যাহ্নের যুগ চলিতেছে, আমাদের জীবন-প্রভাতও বোধ হয় আরব্ধ হয় নাই।

সুতরাং অতীত ইতিহাসের সুবিধাও আছে। পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্র-সম্বল বর্ত্তমান কালে ব্যক্তির ও জাতির মূলধন স্বরূপ কার্য্য

করে। অতীতের স্মৃতি মানুষকে বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়, ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব শিখাইয়া দেয়। আর বাপ দাদার দোহাই অত্যধিক না দিলেই আত্মসম্মান-বোধ বজায় থাকে। পূর্ব্বকীর্ত্তি খানিকটা মনে রাখিয়া চলিলেই বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। আজকাল আপনারা কথায় কথায় শ্বেতাঙ্গ বালকবালিকা এবং নিগ্রো বালকবালিকার চরিত্র তুলনা করিয়া আমাদিগকে অবনত সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। আমরা অনেক বিষয়ে যে হীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার আপনারা কল্পনা করিয়া দেখিবেন যে আপনাদের কোন পিতামহ মাতামহ ইত্যাদি ছিল না, আপনাদের বংশকথা নাই, আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বাস্তুভিটা ইত্যাদি কিছুই নাই। তাহা হইলে আমাদের নৈতিক চরিত্রের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন।

যাহাদের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, তাহাদের কি চরিত্র গঠিত হইতে পারে? যাহাদের পারিবারিক বন্ধন কিছু নাই, তাহারা কি চক্ষুলজ্জার ভয় করে? তাহাদের সমাজই যে নাই। যাহারা পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভাবিতে শিখে নাই, যাহারা বর্ত্তমানে রক্তের সম্পর্ক স্বীকার করে না, যাহাদের মামা খুড়ী দিদি শ্বশুর ইত্যাদি সম্পর্কবিশিষ্ট গুরুজন নাই, যাহাদের সন্তানসন্ততির জন্য মায়া বিকশিত হইতে পারে না, তাহারা কি মানুষের ধর্ম্ম, মানুষের বিবেক, মানুষের সদসদ্‌জ্ঞান, ইত্যাদি অর্জ্জন করিতে পারে? নিগ্রোজাতির এই অবস্থা। সমাজের বা আত্মীয়গণের মুখ চাহিয়া তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে হয় না। কাহারও গৌরব নষ্ট

হইয়া গেলে সমাজে পরিবারের কলঙ্ক রটিবে, সে ভয় তাহাদের নাই। নিজে কোন কীর্ত্তির কর্ম্ম করিয়া গেলে পরিবারের দশজন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাহা লইয়া গৌরব করিবে—কোন নিগ্রোই এইরূপ ভাবিতে শিখে না।

আমার কথা বলিলেই সকলে বিষয়টা বুঝিতে পারিবেন। আমার মাতামহী কে ছিলেন কখনও জানি না। আমি শুনিয়াছি আমার মামা মামী, পিসা পিসী, কাকা কাকী এবং মাসতুত পিসতুত খুড়তুত ভাইবোন ইত্যাদি আছেন। কিন্তু তাঁহারা কে কোথায় কি করিতেছেন কিছুই জানি না। আমাদের নিগ্রো-জাতির সকলেরই পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা এইরূপ। কিন্তু শ্বেতকায়দিগের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রতিপদবিক্ষেপেই তাহাদিগকে পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইতে হয়। তাহারা যদি একটা অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার চৌদ্দপুরুষের মুখে চুণ-কালি পড়িবে। এই জ্ঞান তাহাদের সর্ব্বদা থাকে। কাজেই প্রলোভন, অসংযম ইত্যাদি তাহারা সহজে কাটাইয়া উঠিতে পারে। যখনই কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি কর্ম্ম আরম্ভ করে, তখনই তাহার মনে বিরাজ করিতে থাকে যে, তাহার পূর্ব্বপুরু-ষেরা নানা সৎকর্ম্ম করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং সেও যে সিদ্ধিলাভ করিবে তাহা ত সুনিশ্চিত। পূর্ব্বপুরুষদের কৃতকার্য্যতা বর্ত্তমান প্রয়াসের একটা মস্ত সহায়।

আমার অভিভাবক বেশী দিন আমাকে পাঠশালায় যাইতে দিলেন না। কিছুকাল পরেই আমার নাম কাটা হইয়া গেল।

তখন হইতে আমি আবার সেই নৈশ-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই জীবনের সম্বল করিলাম। আমার বাল্য-জীবনের সকল শিক্ষাই আমি নৈশ-বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছি—এ কথা বলিলে কোন অত্যুক্তি হইবে না। দিবাভাগে আমি লিখিবার পড়িবার অবসর কিছুমাত্র পাই নাই বলিলেই চলে।

অনেক সময়ে কার্য্য শেষ করিয়া নৈশশিক্ষার চেষ্টায় রত হইয়া দেখিতাম—শিক্ষক নাই। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আমাকে খুব ভুগিতে হইয়াছে। অনেক শিক্ষক এমন জুটিয়াছেন যাঁহাদের বিদ্যা প্রায় আমারই সমান! বহুকাল এরূপও কাটিয়াছে যখন রাত্রিকালে শিক্ষালাভের জন্য ৫।৬ মাইল দূরে হাঁটিয়া যাইতাম। আমার বাল্যজীবনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল—যেমন করিয়াই হউক আমি শিক্ষালাভ করিব। এই জন্য নৈরাশ্য আমাকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে নাই।

ওয়েষ্ট-ভার্জ্জিনিয়ায় বসতি করিবার সময়ে আমার মাতা একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন। "নিজে শুতে ঠাঁই পায় না—শঙ্করাকে ডাকে!" আমাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়—অথচ একজন নূতন লোক পরিবারে প্রবেশ করিল। আমরা তাহাকে ভাইএর ন্যায় গ্রহণ করিলাম। তাহার নাম দিলাম জেম্‌স্ বি ওয়াশিংটন।

নুনের কলের কাজ ছাড়িয়া একটা কয়লার খনিতে কাজে নিযুক্ত হইলাম। এই খনি হইতে কলের কয়লা জোগান হইত। কয়লার খনিতে কাজ করিলে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাহাকে বলে তাহা জানা যায় না। সমস্ত দিন খাটিতে খাটিতে শরীরে এত ময়লা আসিয়া জমে যে তাহা আর উঠে না। এইজন্য আমি এই কাজে বিশেষ নারাজ ছিলাম। তাহার উপর, খনির মুখ হইতে কয়লার স্তর পর্য্যন্ত এক মাইল দূর। সেই রাস্তায় অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে, তবে কয়লার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেই খানে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার কামরা বা পাড়া। সেইগুলিকে অন্ধকারের মধ্যে চিনিয়া বাহির করা বড় সোজা কথা নয়। সেখানকার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কয়লার কামরাগুলিও আমি কোন দিনই খুঁজিয়া লইতে পারি নাই। অধিকন্তু হঠাৎ যদি লণ্ঠনের আলো নিবিয়া যাইত, তাহা হইলে "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি" হইত। এদিক ওদিক অন্ধের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম—দৈবাৎ অন্য কোন কুলীর দেখা পাইয়া পথ বাছিয়া লইতাম। মৃত্যুভয়ও কম ছিল না। খনির ভিতর দুর্দ্দৈব প্রায়ই ঘটিত। কোন সময়ে একচাপ কয়লা ধসিয়া পড়িয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যুর কারণ হইত। কখনও বা বারুদ যথাসময়ের পূর্ব্বে ফাটিত। তাহাতে অসতর্ক কুলীরা মারা যাইত।

ছেলেবেলায় যখন আমি নুনের কলে অথবা কয়লার খাদে কাজ করিতাম, তখন আমি শ্বেতাঙ্গ বালকদের মনের অবস্থা এবং হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতাম। যৌবন-কালেও অনেকবার শ্বেতাঙ্গ যুবকদের অন্তরের চিন্তারাশি অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিতাম তাহাদের উচ্চ অভিলাষকে

বাধা দিবার কিছুই নাই—সংসারের সকল পদার্থই তাহাদিগকে বড় বড় কর্ম্মের দিকে উৎসাহিত করিতেছে। ভাবিতাম তাহারা অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জ্ঞান লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সুযোগ পায়। কোন বিষয়ে ক্ষুদ্রত্ব, পঙ্গুত্ব, নীচত্ব তাহাদিগের চিন্তা ও কর্ম্মরাশিকে স্পর্শ করিতে পারে না। বড় বড় কারবার লইয়াই তাহারা ব্যাপৃত। তাহারা চেষ্টা করিলে যুক্তরাজ্যের সভাপতি হইতে পারিতেছে—বড় বড় অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক হইতেছে—বিশাল কর্ম্মকেন্দ্রের পরিচালক হইতেছে। তাহারা ধর্ম্মমন্দিরের গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে, দেশশাসকের মর্য্যাদা পাইতে পারে। কেহই তাহাদিগের উদ্যম আকাঙ্ক্ষা ও আশার সম্মুখে একটা সীমা-রেখা টানিয়া দিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিতে পারে না। আমি ভাবিতাম যদি আমার এই সকল সুযোগ থাকিত তাহা হইলে আমি সামান্য পল্লীর নগণ্য কুটিরে জন্মিয়াও ক্রমে ক্রমে সহরের নেতা, জেলার কর্ত্তা, প্রদেশের নায়ক, সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত হইতাম। হায় আমি নিগ্রো—এই কল্পনা আমার পক্ষে উন্মত্তের প্রলাপ, মরুভূমির মরীচিকা।

ও সব বাল্যজীবন ও যৌবনের মনোভাব। আজ কিন্তু সত্য বলিতেছি—আমার ওরূপ কল্পনা বা আকাঙ্ক্ষা হয় না। আমি শ্বেতাঙ্গ মানবের সঙ্গে ঠিক ঐরূপ তুলনা করিয়া নিজের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করি না। আমি শ্বেতাঙ্গ মানবের সুযোগ সুবিধা সাহায্যগুলি আদৌ হিংসা করি না। আজ প্রৌঢ় অবস্থায়

আমি অতীতের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতেছি, মান, মর্য্যাদা, কীর্ত্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মনুষ্যত্বের সত্য মাপকাঠি নয়। কোন লোক জগতে বিখ্যাত হইলেই সে কৃতকার্য্যতা লাভ করিল, আমি তাহা স্বীকার করি না, অথবা তাহার সাধনা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইল—আমি এরূপ ভাবি না। আমি সফলতা অন্য প্রণালীতে মাপিতে শিখিয়াছি। আমি কৃতকার্য্যতার মূল্যস্বরূপ সাংসারিক যশোলাভ দেখিতে চাহি না। আমার মতে সেই ব্যক্তিই যথার্থ সফল যে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, বিঘ্ন-দুর্দ্দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছে। কার্য্য উদ্ধার করিতে যাইয়া কোন ব্যক্তি যদি বিফল হয় তাহাতে আমি দুঃখিত হই না। তাহার প্রয়াস, তাহার সাধনা, তাহার দৃঢ়তা, তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদির পরিচয় পাইলেই আমি তাহাকে কৃতকার্য্য, সফল ও সার্থকতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিব। হয়ত সে জগতে যশস্বী হইল না—হয়ত তাহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল না—হয়ত ভবিষ্যসমাজে তাহার কোন স্মৃতি থাকিবে না। তথাপি সে কৃতকার্য্য, কারণ সে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে, দারিদ্র্যের বোঝা মাথায় বহিয়াছে—নৈরাশ্যের ভীতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় করিয়া কঠোর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইহাই আমার মতে মনুষ্যত্বের কষ্টিপাথর—সফলতার মাপকাঠি। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখি নিগ্রোজাতির মধ্যে জন্মিয়া আমার উপকারই হইয়াছে। আমি প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম দেখিয়াছি—যথার্থ জীবনের আস্বাদ পাইয়াছি। নিগ্রোজীবনের

আব্-হাওয়া দুঃখ-দারিদ্র্যপূর্ণ, নিগ্রোর পক্ষে বিশ্বশক্তি একটা প্রকাণ্ড সয়তান, নিগ্রোর সংসার হতাশ্বাসের লীলানিকেতন। আমি বলি মনুষ্যত্ব-বিকাশের পক্ষে, প্রকৃত জীবন গঠনের পক্ষে এই অবস্থাই অতি হিতকর। কারণ, কষ্টই মানুষের পরীক্ষক, কষ্টই মানুষের বিচারক।

এই কষ্টের জগতে যাহাকে বাস করিতে হয় তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই যথার্থ মানুষ হওয়া যায়। তাই বলিতেছিলাম, আমি শ্বেতাঙ্গকে আজকাল হিংসা করি না—নিগ্রো-জীবনই আমার শ্রেয়ঃ।

শ্বেতাঙ্গের কার্য্য উচ্চ অঙ্গের না হইলেও তাহার দোষ বেশী লোক ধরে না। কিন্তু নিগ্রোর কর্ম্মে যদি সামান্যমাত্র ত্রুটিও থাকে তবে তাহার জন্যই সমস্ত পচিয়া যায়। কাজেই নিগ্রো সর্ব্বদা অগ্নি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য। খুব ভাল করিয়া না খাটিলে তাহার কাজ বাজারে মনোনীত হইবে না। ইহা কি তাহার উন্নতির পক্ষে কম সুযোগ? কিন্তু শ্বেতাঙ্গের "সাত খুন মাপ।" ফলতঃ তাহার তত বেশী পরিশ্রমী এবং সহিষ্ণু না হইলেও চলে।

আমি নিগ্রোই থাকিতে চাই। দুঃখের সংসারই আমার শিক্ষালয় থাকুক—জগতের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধনাই আমার জীবনের ব্রত হউক।

আজকাল নিগ্রোজাতির অনেকেই রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবী

করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা ব্যক্তিগত যোগ্যতা বাড়াইবার চেষ্টা করে না। কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে আড়া-আড়ি করিয়া তাহাদের সমান হইতে চায়! আমি তাহাদিগকে বলি "ভাই নিগ্রো, তুমি সাদা কাল চামড়ার প্রভেদ মনে রাখিও না। নিজ কর্ত্তব্যবোধে কর্ত্তব্য করিয়া যাও। যদি শক্তি অর্জ্জন করিতে পার তোমাকে কেহই অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারিবে না। বিশ্বের মধ্যে সেই শক্তির স্থান আছেই আছে। গুণ কখনই চাপা থাকিবে না। তাহার সম্মান হইবেই হইবে। তোমরা আজ নির্য্যাতিত পদদলিত, কিন্তু ভগবানের এই সনাতন ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন কর। দেখিবে, যথাকালে তোমার শক্তি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।"

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যার্জ্জনে কঠিন প্রয়াস

কয়লার খাদে কাজ করিতেছি, এমন সময়ে একদিন দুইজন কুলীর কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। ইঙ্গিতে বুঝিলাম ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের কোন স্থানে একটা বড় রকমের নিগ্রোবিদ্যালয় আছে। আমার নিজের পল্লীর পাঠশালা অপেক্ষা বড় স্কুল-কলেজের কথা ইহার পূর্ব্বে আর শুনি নাই।

আমার আগ্রহ বাড়িল। খনির অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়া লোক দুইটির নিকটবর্ত্তী হইলাম। তাহারা বলাবলি করিতেছে যে, ভার্জ্জিনিয়ার ঐ বিদ্যালয়টি নিগ্রোদের জাতীয় বিদ্যালয়। নিগ্রো ছাড়া আর কেহ ঐ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে পায় না। গরিব নিগ্রো-সন্তানদের জন্য বিশেষ সুবিধাও আছে। যাহারা বাপ-মার নিকট হইতে টাকা পয়সা আনিতে অসমর্থ, তাহারাও লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায়। এরূপ নির্ধন ছাত্রেরা খাটিয়া পয়সা রোজগার করে। পরিশ্রম করিতে পারিলে যে কোন বালকই যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়া নিজের ভরণ-পোষণের খরচ নিজেই জোগাইতে পারে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তারা এজন্য

একটা নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া তাঁহারা সকল ছাত্রকে অন্যান্য বিষয় শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দুটা একটা কৃষি-শিল্পকর্ম্ম বা ব্যবসায়ও শিখাইয়া থাকেন। এই সুযোগেও ছাত্রেরা নিজের খরচ নিজেই চালাইয়া লয়। অধিকন্তু ভবিষ্যতের জন্যও তাহাদের অন্ন-সংস্থানের উপায় জানা হইয়া থাকে।

এই বিদ্যালয়ের নাম "শিক্ষক ও শিল্পবিদ্যালয়"। ভার্জ্জিনিয়ার হ্যাম্পটন নগরে ইহা অবস্থিত।

আমি তৎক্ষণাৎ স্থির করিলাম আমি ঐ পাঠশালায় ভর্ত্তি হইব। আমার পক্ষে উহা অপেক্ষা সুবিধার স্থান আর কি হইতে পারে? নিজে খরচ চালাইয়া লইব। সুতরাং অভিভাবকের আপত্তি থাকিবে কেন?

আমি হ্যাম্পটনের নাম জপিতে লাগিলাম। হ্যাম্পটন কোথায়, আমার ম্যালডেন হইতে কোন্ দিকে বা কতদূর আমি কিছুই জানি না। দিবারাত্রি শুধু সেই বিদ্যালয়ের ধ্যান করিতে লাগিলাম। আমার মনে আর কোন চিন্তা আসিল না।

কয়লার খনিতে আরও কিছুকাল কাজ করিলাম। এই সময়ে একটা নূতন চাকরীর সন্ধান পাইলাম। আমাদের এই খনি এবং নুনের কল একজনেরই সম্পত্তি ছিল, তাঁহার নাম জেনারেল লুইস্ রাফ্নার। রাফ্নার-পত্নী বড় কড়া মেজাজের মনিব ছিলেন। তাঁহার চাকর কেহই টিকিত না। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই সকলে পলাইয়া আসিত। দেখিলাম কয়লার খনিতে কাজ করা অপেক্ষা একটা পরিবারের চাকর হওয়া শতগুণে ভাল।

আমি চেষ্টা করিয়া ১৫৲ টাকা মাসিক বেতনে রাফ্‌নার-পত্নীর ভৃত্য নিযুক্ত হইলাম।

রাফ্‌নার-পত্নীর নিকটে যাইতে প্রথম প্রথম আমার বড় ভয় হইত, আমি কাঁপিতে থাকিতাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মনিবের 'রাশ' বুঝিয়া লইলাম। তাঁহার বাপের বাড়ী ছিল যুক্তরাজ্যের সর্ব্ববিখ্যাত বিভাগ নিউইংলণ্ড প্রদেশে। সে অঞ্চলের লোক-দিগকে "ইয়াঙ্কি" বলে। ইয়াঙ্কিরা আমেরিকার কিছু "চালে" চলেন। তাহাদের দেখিয়া শুনিয়াই যুক্তরাজ্যের অন্যান্য বিভাগের লোকেরা কায়দা-কানুন, চাল-ফ্যাশন ইত্যাদি শিখিয়া থাকেন। কাজেই ইঁহাদের মন জোগাইয়া কাজ করা যে-সে চাকরের সাধ্য নয়। রাফ্‌নার-পত্নী সকল বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন। সময়-নিষ্ঠাও তাঁহার একটা বড় গুণ ছিল, তাঁহার লোকজনের মধ্যে এই গুণের অভাব দেখিলে তিনি চটিয়া যাইতেন। বাড়ী-ঘর, টেবিল-চেয়ার, থালাবাটী সবই ঝাড়া-পুছা ফিট-ফাট চাই। তাঁহার নিকট পান হইতে চূণ খসিবার জো নাই। অধিকন্তু কুঁড়েমি এবং ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তিও তিনি দেখিতে পারিতেন না। কাজেই নিয়মিতরূপে যখনকার যাহা কর্ত্তব্য ঠিক তাহা করিলে দাসদাসীরা তাঁহার আদর পাইত।

তাঁহার নিকট আমি প্রায় দেড় বৎসর চাকরী করিলাম। এই মনিবের পরিবারে থাকিয়া আমার খুব উপকার হইয়াছে। এখানে যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছি, তাহা অন্যান্য স্থানের শিক্ষা অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নয়। এখানে চাকরী করিতে

করিতেই অনেক দিকে আমার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। আমি আজকাল পল্লী বা সহরের কোনস্থানে ময়লা জমা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া ফেলি। ঘরের কোন কোণে ছেঁড়া কাগজ বা ন্যাকড়া থাকিলে তাহা আমার নিকট বিষবৎ বোধ হয়। ঘরের বা বাড়ীর বেড়া নড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মেরামত করিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করি না। কাপড় জামা ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আমি সর্ব্বদাই মনোযোগী। এই সকল সদ্‌গুণ আমি রাফ্‌নার-পত্নীর নিকট চাকরী করিয়াই লাভ করিয়াছি। সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা-জ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মপালন, এবং যখনকার যা ঠিক তখন তাহা করা এবং নানা সদভ্যাস এই পরিবারেই অর্জ্জিত হইয়াছে। এই চাকরীই আমার কিয়ৎকালের জন্য শিক্ষালয়, শিক্ষাদাতা এবং গ্রন্থপাঠ-স্বরূপ ছিল এরূপ বলিলে অন্যায় হইবে কি?

রাফ্‌নার-পত্নী আমার কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া আমায় ভাল বাসিতে লাগিলেন। এমন কি, দিবাভাগের বিদ্যালয়ে যাইবার সুযোগও আমি পাইলাম। এতদিন কেবল নৈশবিদ্যালয়েই পড়িতেছিলাম। রাফ্‌নার-পত্নীর কৃপায় এক ঘণ্টা করিয়া দিনের স্কুলেও যাইতে থাকিলাম। তিনি আমার রাত্রের পড়ায়ও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে থাকিতেই আমি একটা কেরোসিনের বাক্স আনিয়া নিজ হাতে আলমারী তৈয়ারী করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুই তিনটা থাক করিয়া লইলাম এবং এখান ওখান হইতে কতকগুলি খাতা পত্র, পুঁথি-পুস্তক

সংগ্রহ করিয়া তাহাতে সাজাইয়া রাখিলাম। উহাই আমার প্রথম লাইব্রেরী বা "গ্রন্থশালা!"

সুতরাং রাফ্‌নার-পরিবারে আমার দিন সুখেই কাটিতে লাগিল। আমি কিন্তু হ্যাম্পটনকে ভুলি নাই। আমার মাতা অতদূরে কোন্ অজানা স্থানে যাইব শুনিয়া ভাবিয়া আকুল হইলেন। শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। হাতে এক পয়সাও নাই। এত দিন আমি ও আমার দাদা যাহা কিছু রোজগার করিয়াছি, সবই গৃহস্থালীতে খরচ হইয়া গিয়াছে—এবং আমার অভিভাবক উড়াইয়াছেন। যাহা হউক, কোন উপায়ে যাইবই যাইব।

ভগবান্ সহায় হইলেন। দেখিলাম আমার পল্লীর নিগ্রোরা এই সংবাদে সকলেই আন্তরিক সুখী। তাঁহারা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন "নিগ্রোজাতির মুখ উজ্জ্বল কর।" তাঁহাদের আনন্দের বিশেষ কারণ ছিল। তাঁহাদের চির জীবন গোলামীতে কাটিয়াছে। কখন সুদিন আসিবে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। অথচ কেহ বৃদ্ধ বয়সে কেহ বা প্রবীণ বয়সে একে একে নবযুগের নূতন নূতন লক্ষণগুলি দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা পাইয়াছেন—তাঁহাদের গ্রামে একটা জাতীয় বিদ্যালয় পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, আজ তাঁহাদের এক সন্তান ঘর বাড়ী ছাড়িয়া একটা মহাবিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে চলিল। আজ গ্রামের এক শিশু পরিবারের স্নেহ হইতে দূরে থাকিয়া একটা উচ্চশ্রেণীর

পাঠশালায় বিদ্যার্জ্জন করিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের পক্ষে ইহা একটা সত্যযুগ বৈ কি ? কাজেই কেহ আমাকে একটা রুমাল, কেহ বা একটা ডবল পয়সা, ইত্যাদি উপহার দিতে লাগিলেন।

আমি যাত্রা করিলাম। মাতাকে অত্যন্ত অসুস্থ ও রুগ্ন অবস্থায় দেখিয়াই যাইতে হইল। সঙ্গে একটা থলে। তাহার মধ্যে কাপড় চোপড় ভরিয়া লইলাম। তখন ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া হইতে ভার্জ্জিনিয়ায় যাইবার রাস্তায় খানিকটা রেলপথ ছিল। অবশিষ্ট রাস্তা ভাড়াগাড়ী করিয়া যাইতে হয়।

ম্যালডেন্ হইতে হ্যাম্পটন ৫০০ মাইল। অতদূর যাইবার পথ-খরচ আমার নাই। একদিন পাহাড়ের রাস্তায় ভাড়া-গাড়িতে করিয়া যাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর গাড়ী একটা সাদা বাড়ীর নিকট থামিল। বুঝিলাম এটা হোটেল, আমার সহ-যাত্রীরা সকলেই শ্বেতকায়, আমিই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। তাঁহারা সকলেই একে একে নামিয়া এক একটা কামরা দখল করিয়া বসিলেন। হোটেলের কর্ত্তা তাঁহাদের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা হইতেছে এমন সময়ে ভয়ে ভয়ে আমি হোটেলের কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হাতে এক আধ্‌লাও ছিল না। ভাবিয়াছিলাম গৃহস্বামীর নিকট ভিক্ষা করিয়া রাত কাটাইয়া দিব। সেই সময়ে ভার্জ্জিনিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে হাড়ভাঙ্গা শীত। ভাবিয়াছিলাম নিশ্চয়ই হোটেলের এক কোণে আশ্রয় পাইব। কিন্তু আমার কাল চাম্‌ড়া দেখিবামাত্রই আমার প্রতি কঠোর আদেশ হইয়া

গেল—"তোমার এখানে ঠাঁই নাই।" পয়সার অভাবই আমেরিকায় একমাত্র কষ্ট নয়। সাদা চামড়ার অভাবও বড় বিষম পাপ—এই ধারণা সেই রাত্রে আমার প্রথম জন্মিল।

সারারাত্রি সেই হোটেলের সম্মুখে হাঁটিয়া গা গরম রাখিলাম। গৃহস্বামীর দুর্ব্ব্যবহারে আমি কিছুমাত্র বিচলিত হই নাই। হ্যাম্পটনের স্বপ্নই আমার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছিল।

পথের কষ্ট আরও অসংখ্যপ্রকার ভুগিয়াছিলাম। খানিকটা পদব্রজে চলিয়া, খানিকটা গাড়ীওয়ালার হাতে পায়ে ধরিয়া বিনা পয়সায় গাড়িতে চড়িয়া, খানিকটা সহযাত্রীদের নিকট পয়সা ভিক্ষা করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের একটা সহরে পৌঁছিলাম। তাহার নাম রিচ্‌মণ্ড, এখান হইতে আমার গন্তব্য-স্থান আরও ৮২ মাইল।

রিচ্‌মণ্ডে পৌঁছিতে বেশী রাত্রি হইয়া গিয়াছিল। হাতে পয়সা নাই—তাহার উপর ছেঁড়া ময়লা পোষাক ও কাল রং। ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। কত গৃহস্থের বাড়ীতে স্থান পাইবার জন্য ভিক্ষা করিলাম। কেহই একটা ভালকথাও বলিল না। সকলেই পয়সা চায়। পয়সা দিলে তাঁহাদের বাড়ীতে শয়ন-ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে। শ্বেতাঙ্গ গৃহস্থেরা এইরূপেই অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন! আমি নিরুপায় হইয়া রাস্তায় হাঁটিতে লাগিলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে রুটি মাংসের দোকানে কত খাদ্যদ্রব্য সাজান রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহা হইতে একটুকু পাইলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইতাম। ভাবিতেছিলাম

যদি এক টুকরা মাংসও আজ উহারা আমাকে ধার দেয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে চিরজীবন আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিব সমস্তই উহাদিগকে মূল্য-স্বরূপ দিব প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু আমার প্রতি কাহারও দয়া হইল না। একটা আলু বা এক টুকরা মাংস কেহই আমাকে দিল না। আমি অনাহারে কাটাইলাম।

রিচ্‌মণ্ডের প্রথম রজনীতে আমার এই অভিজ্ঞতা। আমি ক্ষুধার্ত্ত, দুর্ব্বল ও অবসন্ন ভাবে রাস্তায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকিলাম। কিন্তু তথাপি হতাশ হই নাই—জীবনের ধ্রুব-তারাকে ভুলি নাই —হ্যাম্পটনে বিদ্যার্জ্জনের সঙ্কল্প ত্যাগ করি নাই। তার পর যখন আর পায়ে হাঁটা অসম্ভব বোধ হইল, তখন রাস্তার পার্শ্বে একটা কাঠের বড় তক্তার নীচে শুইয়া পড়িলাম। কোন লোক দেখিতে পাইল না। সেই রাত্রিতে কত লোক তক্তার উপর দিয়া চলাফেরা করিল। আমি মাটিতে শরীর রাখিয়া থলেটাকে বালিশ করিয়া হ্যাম্পটনের নাম জপিলাম। সকালে উঠিয়া দেখি, আমি একটা জাহাজের নিকটে রহিয়াছি। অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা। জাহাজের কাপ্তেনের নিকট কিছু প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার অনুমতিক্রমে জাহাজ হইতে মাল নামাইতে লাগিলাম। তারপর যথাসময়ে মজুরির মূল্য পাইয়া খাবার খাইতে বসিলাম। ওরূপ সুখের খাওয়া বোধ হয় আর কখনও আমি খাই নাই।

কাপ্তেন সাহেব আমার প্রথম কাজেই প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে আরও কাজ দিতে চাহিলেন। আমি রাজী

হইলাম। যে মূল্য পাইতাম তাহা দিয়া দৈনিক আহারের খরচ চলিত—কিন্তু ঘরভাড়া কুলাইত না। কাজেই অল্প খাইয়া থাকিতাম—এবং রাত্রে আসিয়া সেই কাঠের তলায় মাটির উপরে শুইয়া থাকিতাম। এই উপায়ে কিছু পয়সা বাঁচিল। তাহার দ্বারা রিচ্‌মণ্ড হইতে হ্যাম্পটনে যাইবার খরচ সংগ্রহ করিলাম।

এই ঘটনার বহুকাল পরে রিচ্‌মণ্ডের নিগ্রো-অধিবাসিগণ আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। সম্বর্দ্ধনা-উৎসবে অন্ততঃ দুই হাজার কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ ও রমণী যোগদান করিয়াছিল। ঘটনাচক্রে সেই কাঠের তক্তার সমীপবর্ত্তী এক গৃহে এই অভ্যর্থনা ও সাদরসম্ভাষণাদি নিষ্পন্ন হয়। সকলে অতি আন্তরিকতার সহিতই আমাকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু এই আনন্দের দিনে আমি সম্বর্দ্ধনা অভিবাদন প্রভৃতিতে একেবারেই যোগ দিতে পারি নাই। আমি আমার রিচমণ্ডে প্রথম পদার্পণের কথাই মনে করিতেছিলাম। সেই রজনীর অভিজ্ঞতাই আমার চিত্তে অন্যান্য সকল চিন্তার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আমি সেই রাস্তার পার্শ্বের কাঠের তক্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

কাপ্তেন মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়া আমি আমার তীর্থ-যাত্রায় আবার বাহির হইলাম। হ্যাম্পটনে পৌঁছিবার পথে এবার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, পৌঁছিবার সময় হাতে ১॥/০ পুঁজি থাকিল।

বিদ্যামন্দিরের বহির্ভাগ দেখিয়াই আমি রোমাঞ্চিত হইলাম।

বড় বাড়ী যেন রাজ-প্রাসাদ। বিদ্যালয়ের এই ত্রিতল ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ আমার হৃদয়ে একটা নব জগতের বার্ত্তা আনিয়া দিল। ধনি-সমাজ, আপনারা যদি একবার বুঝিতে পারিতেন যে, নূতন শিক্ষার্থীর চিত্তে বিদ্যালয়-গৃহের দৃশ্য কি অপরূপ ভাব-লহরী সৃষ্টি করে, তাহা হইলে আপনারা বোধ হয় আপনাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া দেশের বিদ্যামন্দিরগুলিকে নানা উপায়ে সুন্দর সুশ্রী ও অলঙ্কৃত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। আপনারা শিশুহৃদয়ের কোমল চিন্তাগুলি কখনও কল্পনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? নবশিক্ষার্থীর অন্তরের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন কি? আমি হ্যাম্পটনের বিদ্যালয়-গৃহটি দেখিয়া নূতন জীবন লাভ করিলাম—সবই যেন নূতন বোধ হইতে লাগিল—আমার চোখ একটা নূতন দৃষ্টি-শক্তি পাইল। জগতের সকল পদার্থই এক নবভাবে আমার নিকট দেখা দিল—আমি সত্যসত্যই সেই চিরবাঞ্ছিত স্বর্গ-রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

আমি বাহিরে কাল বিলম্ব না করিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হাজির হইলাম। প্রধান শিক্ষয়িত্রী আমার বেশভূষা ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহাদের যোগ্য ছাত্র বিবেচনা করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হয় বুঝিয়াছিলেন—এ একটা সঙ্, ছেলে খেলা করিতে আসিয়াছে। অবশ্য একবারে তাড়াইয়াও দিলেন না। আমি তাঁহার আশে পাশে ঘুরিতে লাগিলাম। নানাভাবে আমার যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা এবং শিখিবার আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইতিমধ্যে কত নূতন নূতন ছাত্র আসিয়া

ভর্ত্তি হইল। আমার মনে হইতে লাগিল—আমাকে ভর্ত্তি করিলে ইহাদের কাহারও অপেক্ষা আমি নিন্দনীয় ফল দেখাইব না।

কয়েক ঘণ্টা পর শিক্ষয়িত্রী আমার উপর সদয় হইলেন। তিনি বলিলেন, "ওখানে ঝাঁটা আছে, ওটা লইয়া পার্শ্বের ঘরটা ঝাট্ দাও ত।"

আমি বুঝিলাম—ইহাই আমার পরীক্ষা। রাফ্‌নার-পত্নীর গৃহে আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি এইবার তাহার যাচাই হইতেছে। ভাল কথা—আমি মহা আনন্দে ঘর পরিষ্কার করিতে গেলাম।

ঘরটা একবার দুইবার তিনবার ঝাড়িলাম। একটা ন্যাকড়ার ঝাড়ন ছিল—তাহা হইতে ধূলিরাশি বাহির করিয়া ফেলিলাম। দেওয়ালের আশে পাশে অলি গলিতে যেখানে যে টুকু ময়লা জমিয়াছিল সমস্তই পরিষ্কার করিলাম। বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার, ডেস্ক ইত্যাদি কাঠের সমস্ত আস্‌বাবই ঝাড়িয়া চক্‌চকে করিয়া রাখিলাম। শিক্ষয়িত্রীকে জানাইলাম ঝাড়া হইয়াছে। তিনিও 'ইয়াঙ্কি' রমণী। তিনি খুঁটিনাটি সর্ব্বত্রই তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়া বুঝিলেন ময়লা কিছুই নাই। নিজের রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিলেন—চেয়ারের কোণ হইতেও কিছু ধূলা বাহির হয় কি না। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, ছোকরা বেশ কাজের।" আমি 'পাশ' হইলাম।

বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময়েও কোন বালককে এত কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় না। হার্ভার্ড ও ইয়েল

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইলে শুনিয়াছি ছাত্রদের যথেষ্ট ‘বেগ’ পাইতে হয়। যাহারা ‘প্রবেশিকা’ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হার্ভার্ড ও ইয়েলের কলেজে লেখাপড়া শিখিবার জন্য সার্টিফিকেট পায়, তাহারা বোধ হয় আমার এই দিনের আনন্দ কিছু কিছু অনুমান করিতে পারিবে। আমিও পরে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। কিন্তু এই পরীক্ষার উপরই আমার ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। ইহার ফলেই আমার জীবনের গতি নির্দ্ধারিত হইল। এরূপ অগ্নিপরীক্ষায় আর আমি কখনও পড়ি নাই। হ্যাম্পটনের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, আমার পরীক্ষাকর্ত্রীর নাম ছিল কুমারী মেরী এফ্ ম্যাকি। আমাকে নিজের খরচ নিজেই চালাইতে হইবে শুনিয়া তিনি আমাকে বিদ্যালয়ের একটা খান্সামার কাজ করিতে দিলেন। আমাকে ঘরগুলি দেখিতে শুনিতে হইত, খুব সকালে উঠিয়া বাড়ীর আগুন জ্বালিয়া দিতে হইত। উনন ধরাইয়া দিতে হইত। খাটুনী যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইহাতে আমার ভরণপোষণের প্রায় সমস্ত খরচই পাইতাম।

হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের বহির্দৃশ্য পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে ভিতরকার কথা কিছু বলি। মিস্ ম্যাকি আমার জননীর ন্যায় স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও উৎসাহে আমি সেখানে অনেক উপকার পাইয়াছি। তাঁহাকে আমার জীবনের অন্যতম গঠনকর্ত্রী বিবেচনা করিয়া থাকি।

একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের পরিচয় আমি এখানে পাই। তখন হইতে তিনি আমার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন।

তাঁহার চরিত্রই আমার জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শস্বরূপ রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়াই আমি কর্ম্মক্ষেত্রে সাহসভরে বিচরণ করিতেছি। সেই উদারস্বভাব বৃহৎপ্রাণ পরোপকারী মহাপুরুষের নাম সেনাপতি স্যামুয়েল সি আর্মষ্ট্রঙ্গ।

সৌভাগ্যক্রমে আমি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি। খাঁটি বড় লোক এবং তথাকথিত বড় লোক উভয় প্রকার নামজাদা লোকই আমি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গের ন্যায় চরিত্রবান্ ধর্ম্মভীরু মানবসেবক একজনও দেখি নাই। তিনিই আমার চিন্তারাজ্যের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' মহাবীর, তাঁহাকে দেখিয়াই ত্যাগাবতার বৈরাগ্যাবতার প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট ও সাধু মহাত্মাদের পরিচয় কিছু কিছু পাইয়াছি বলিতে পারি। সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গকে আমি মূর্ত্তিমান্ ত্যাগধর্ম্মরূপে পূজা করিতাম।

গোলামাবাদের ঘৃণ্য জীবন এবং কয়লার খাদের দুঃখদারিদ্র্য ভোগ করিবার পরক্ষণেই এই মহা-পুরুষের সাক্ষাৎলাভ করিলাম। বহু পুণ্যফলেই আমার এরূপ ঘটিয়াছিল। যেই আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিলাম তখনই আমার মনে হইল যে, ইনি একজন আদর্শ মানব। তখনই যেন বুঝিতে পারিলাম ইঁহার ভিতর অলৌকিক, অনন্যসাধারণ বীরসুলভ শক্তি রহিয়াছে। সেই প্রথম দর্শন হইতে সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গকে আমি অনেকবার নানা ভাবে, আপনার জন ভাবে, বন্ধুভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছি। তাঁহার

মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমি আত্মীয় বিবেচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। ক্রমশই তিনি আমার জ্ঞানে মহৎ হইতে মহত্তররূপে অধিকতর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার পাত্র হইয়াছিলেন।

যতই আমার বয়স বাড়িতেছে ততই আমি বিবেচনা করিতেছি যে, 'মানুষ' গড়িবার জন্য গ্রন্থপাঠের ব্যবস্থা করিবার আবশ্যকতা বেশী নাই। পুঁথি-কেতাব, খাতা-পত্র, লাইব্রেরী, কল-কব্জা, ল্যাবরেটরী ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম—এ সব হইতে ছাত্রেরা বেশী কিছু শিখিতে পায় না। এই নির্জ্জীব পদার্থগুলি মানুষের মনুষ্যত্ব গজাইয়া দিতে, বিশেষ সমর্থ নয়। আমি হ্যাম্পটনে থাকিবার কালে ভাবিতাম যে, এই বিদ্যালয় হইতে বাড়ী-ঘর, হাতিয়ার-যন্ত্র, খাতা-পত্র, ইট-কাঠ, বেঞ্চ-টেবিল, ইত্যাদি সবই যদি সরাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও বিদ্যালয়ের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হইবে না। কারণ এই বিদ্যালয়ের প্রাণদাতা, এই বিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, এই বিদ্যালয়ের পিতা স্বরূপ পরিচালক আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় একাকীই এই সমুদয় সাজ-সরঞ্জাম অপেক্ষা মূল্যবান্। তাঁহার নিকট নিগ্রো-বালকেরা একবার করিয়া রোজ আসিতে পারিলেই তাহাদের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষালাভের সুফল ফলিবে। আজও আমি সেই কথা বলিতেছি, প্রকৃত চরিত্রবান্ সমাজসেবক শিক্ষাপ্রচারকের সঙ্গে সহবাস করিতে পাইলে যতখানি চরিত্র গঠিত হয়, মনের তেজ বাড়িতে থাকে, চিত্তের শক্তি বিকশিত হয়, কর্ম্মক্ষমতার উন্মেষ হয়, সৌজন্য-শিষ্টাচার অর্জ্জিত হয়, অন্য কোন উপায়ে তাহা হইতে পারে না।

আমাদের তথাকথিত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে গ্রন্থ-পাঠের আড়ম্বর কমিয়া যাইবে না কি ? আমাদের শিক্ষা-ক্ষেত্রের কর্ম্মীরা সমগ্র জগতের কাজ-কর্ম্মের মধ্যে রাখিয়া বালক-বালিকাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন না কি ?

সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ মৃত্যুর পূর্ব্বে দুইমাস কাল আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ে কাটাইয়াছিলেন। তখন তিনি পক্ষাঘাতে ভুগিতে-ছিলেন। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়াছিল। তথাপি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার শিক্ষাপ্রচার-ব্রতে লাগিয়াই ছিলেন। কাজের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া ফেলিতে পারে—এরূপ লোক সংসারে বিরল। কিন্তু আর্মষ্ট্রঙ্গ নিজকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারিতেন—আত্মমুখী চিন্তা তাঁহার বিন্দুমাত্র ছিল না। পরসেবাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। তিনি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের জন্য এতদিন যাহা করিয়াছেন আমার টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের জন্যও সেইরূপ খাটিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে। আমাদের অঞ্চলে যেখানে যেখানে নিগ্রোসমাজে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজন সেই সকল স্থানের জন্যও তিনি শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল কার্য্যেই তাঁহার সমান আনন্দ। তিনি নিজকে বিসর্জ্জন দিতে শিখিয়াছিলেন—আদর্শের মধ্যে তন্ময় হইতে পারিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব হইত না। যখন যেখানে থাকিতেন তখন সেইখানেই তাঁহার আত্মত্যাগী সাধনার কার্য্য চলিতে থাকিত। এখানে আমার কর্ম্মক্ষেত্র, ওটা তোমার কর্ম্মকেন্দ্র, এই আমার গণ্ডী, ঐ পর্য্যন্ত তোমার গণ্ডী—তাঁহার

নিঃস্বার্থ চিত্তে এরূপ চিন্তা স্থান পায় নাই। সর্ব্বত্রই তিনি স্বার্থত্যাগের কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া লইতেন।

সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের অধিবাসী 'ইয়াঙ্কি'। বিগত সংগ্রামে তিনি এই প্রান্তের পক্ষে দক্ষিণ প্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিলেন। সুতরাং অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, তিনি হয়ত দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতকায়গণের সম্বন্ধে শত্রুভাব পোষণ করিতেন। আমি বলিতে পারি, তাহা সত্য নয়। তিনি সংগ্রামের পর একদিনও কোন দক্ষিণপ্রান্তবাসী শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি সম্বন্ধে নিন্দা বা তিরস্কারসূচক বাক্য ব্যবহার করেন নাই। বরং যথাসাধ্য তিনি তাহাদের উপকারের জন্য চেষ্টাই করিয়াছেন।

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। আর্মষ্ট্রঙ্গের আরব্ধ কোন কর্ম্ম কৃতকার্য্য হইবে না—এরূপ আমরা ভাবিতেই পারিতাম না। তাঁহার যে কোন আদেশই আমরা পলকের মধ্যে সম্পন্ন করিতে প্রয়াসী হইতাম। তাঁহার আদেশ অনুসারে কাজ করিতে পাইলে আমরা কৃতার্থ বোধ করিতাম। একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আমার টাস্কেজী-বিদ্যালয়ে অতিথি হইয়াছিলেন। তখন পক্ষাঘাতে ভুগিতেছিলেন—নাড়িবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার চেয়ার গড়ান রাস্তা দিয়া একটা পাহাড়ের উপর তোলা হইতেছিল। তাঁহার একটি ভূতপূর্ব্ব ছাত্র তাঁহার চেয়ার টানিয়া তুলিতেছিল। রাস্তা ভাল ছিল না বলিয়া সহজে ঐ কার্য্য সাধিত হয় নাই। অবশেষে যখন পাহাড়ের উপরে

উঠা গেল, ছাত্রটি বলিয়া উঠিলেন—"যাহা হউক, আজ আমার সৌভাগ্য, সেনাপতির জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে একটা কঠিন রকমের কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি।"

যখন আমি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে ছিলাম তখন প্রায়ই নূতন নূতন ছাত্র ভর্ত্তি হইত। আমাদের বড় স্থানাভাব ছিল। ছাত্রাবাসে আর ছাত্র লওয়া চলিত না। বাহিরে তাঁবু খাটাইয়া ঘর তৈয়ারি করিয়া লইতে হইত। সেই সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় পুরাতন ছাত্রদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমাদের মধ্যে কেহ রাত্রে তাঁবুতে শুইয়া ঘরের ভিতর নূতন ছাত্রদের জন্য জায়গা করিতে প্রস্তুত আছ কি?" অমনি প্রত্যেক ছাত্রই ঘর ছাড়িয়া দিয়া তাঁবুতে কষ্টে রাত্রি কাটাইবার জন্য অগ্রসর হইত।

আমিও এইরূপ একজন স্বার্থত্যাগী 'পুরাতন ছাত্র' ছিলাম। আমার মনে আছে—অত্যন্ত কঠোর শীতকালে আমাদের কয়েকবার তাঁবুতে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। আমাদের যৎপরোনাস্তি কষ্টও হইয়াছিল। সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গের আদেশ, সুতরাং আমরা তাহা প্রাণপণে পালন করিবই। আমাদের কষ্টের কথা তাঁহাকে জানাইব কেন? আমরা একসঙ্গে দুইকাজ করিতেছিলাম—কারণ ইহাদ্বারা আর্মষ্ট্রঙ্গকে খুসী করিতাম, এবং নূতন নূতন ছাত্রের শিক্ষালাভের সুযোগ বাড়াইতে পারিতাম। এক এক রাত্রে মহা ঝড় বহিত—তাঁবু উড়িয়া যাইত—আমরা সেই কন্‌কনে শীতের মধ্যে খোলা মাঠে পড়িয়া থাকিতাম। সেনাপতি

সকালে আসিয়া দেখিতেন—আমরা হাস্যমুখে প্রফুল্লচিত্তে শীত সহ্য করিতেছি।

আর্ম্ষ্ট্রঙ্গের কথা এত করিয়া বলিবার কারণ আছে। আমি সকলকে জানাইতে চাহি যে, এরূপ চরিত্রবলে বলীয়ান্ শিক্ষা-প্রচারকগণের প্রয়াসেই আমেরিকার নিগ্রোসমাজে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিয়াছে। আর্ম্ষ্ট্রঙ্গের আদর্শে বহু শ্বেতাঙ্গ শিক্ষিত নরনারী কৃষ্ণকায় সমাজে শিক্ষা-প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া আমার স্বজাতিকে উন্নতির পথে তুলিয়াছেন। জগতে এই নীরব নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীরগণের জীবনচরিত এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

হ্যাম্পটনে প্রতিদিনকার প্রতি কর্ম্মেই, প্রত্যেক উঠা-বসায় আমি একটা নূতন কিছু শিখিতেছিলাম। সেখানকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী এবং নিত্য কর্ম্ম-পদ্ধতি আমাকে নানা ভাবে শিক্ষিত করিতেছিল। যথাসময়ে নিয়মিতরূপে খাইতে হয়, এখানে আমি তাহা প্রথম উপলব্ধি করিলাম। টেবিলের উপর কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর থালা বাটি রাখিতে হয়—ইহাও আমি জীবনে প্রথম শিখিলাম। খাইতে বসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কোন্ খাদ্যের পর কোন্ খাদ্য লওয়া উচিত—ইত্যাদি আরও অনেকানেক বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা জন্মিল। বিছানার উপর চাদর দেওয়াও আমি পূর্ব্বে আর কোন দিন দেখি নাই। এইরূপে দৈনিক জীবন-যাপনের প্রায় সকল কর্ম্মেই হ্যাম্পটনে আমার 'হাতে খড়ী' হইল।

হ্যাম্পটনেই আমি আবার স্নান করিতেও শিখি। স্নান

করিলে যে কত উপকার হয়, শরীর ও স্বাস্থ্যের কত উন্নতি হয়, চিত্তের প্রফুল্লতা বাড়িতে থাকে—তাহা আমি পূর্ব্বে বুঝিতাম না। তখন হইতে আমি প্রতিদিন স্নান করিয়া আসিতেছি। মাঝে মাঝে এমন অনেকের বাড়ীতে অতিথি হইতে হইয়াছে, যেখানে স্নান করিবার ব্যবস্থা নাই। আমি সেখানে নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা ঝরণায় যাইয়া স্নান করিয়া পরিষ্কার হইয়াছি। নিগ্রো-জাতিকে আমি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, বাড়ী তৈয়ারী করিতে হইলেই স্নানাগারও যেন প্রস্তুত করা হয়।

হ্যাম্পটনে আমার দুইটি মাত্র গেঞ্জি ছিল—ময়লা হইয়া গেলে আমি রাত্রে সাবান দিয়া কাচিয়া আগুনে শুকাইয়া লইতাম। পরদিন সকালে তাহা ব্যবহার করিতাম।

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ খাওয়া খরচ মাসিক ৩০৲ টাকা। আমি যে খানসামার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম তাহাতে সমস্ত আয় হইত না—সুতরাং আমাকে মাসে মাসে নগদ টাকাও কিছু কিছু দিতে হইত। প্রথমে যখন ভর্ত্তি হই, তখন হাতে ১৷৷/০ মাত্র ছিল। আমার দাদা ক্বচিৎ কখনও ২৷৪৲ টাকা পাঠাইতেন। কিন্তু তাহাতে আমার খাই-খরচের জন্য দেয় টাকা কুলাইত না।

কাজেই আমি খানসামাগিরি এত ভাল করিয়া করিতে লাগিলাম যে, শেষে আমি খাইখরচের সমস্ত টাকাই বেতনস্বরূপ পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতন ছিল বার্ষিক ২১০৲ টাকা। এত টাকা আমার সংগ্রহ করা অবশ্যই অসম্ভব ছিল। আমি হ্যাম্

মহোদয় একজন ইয়াঙ্কি বন্ধুকে বলিয়া আমার বেতন দেওয়াইতেন। বন্ধুটির নাম এস্ গ্রিফিথ্স্ মরগ্যান্। শ্রীযুক্ত মরগ্যান্ আমায় হ্যাম্পটনের পুরাপুরি বেতন দিয়া আসিয়াছেন। আমি পরে যখন টাস্কেজীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি—তখন কয়েকবার এই সহৃদয় দাতার সঙ্গে দেখা করিয়া ধন্য হইয়াছি।

হ্যাম্পটনে পুস্তকাভাব ও বস্ত্রাভাব যথেষ্ট হইল। পুস্তক অবশ্য পরের নিকট ধার করিয়া লইলেই কাজ চলে। এই রূপেই আমার চলিত। কিন্তু পোষাক পাই কোথায়? সে থলের মধ্যে আমার যা কিছু সম্পত্তি তাহাতে ত এখানে চলা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেনাপতি মহোদয় কাপড় চোপড়ের উপর বিশেষ দৃষ্টিই রাখিতেন। কোন ছাত্রের জামার বোতাম নাই দেখিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। জুতা বেশ কালী বা রং করা না দেখিলে তাঁহার বিরক্তি জন্মিত। কোটে কালীর দাগ থাকিলে কোন ছাত্র তাঁহার নিকট আসিতে ইতস্ততঃ করিত। আমার মাত্র একটি পোষাক। তাহা দ্বারাই খানসামাগিরি ও ছাত্রগিরি করিতে হইবে। চব্বিশ ঘণ্টা এক পোষাক ব্যবহার করিয়া কি তাহা পরিষ্কার রাখা যায়? আমার অবস্থা দেখিয়া শিক্ষক মহোদয়গণের দয়া হইল। তাঁহারা আমাকে পুরাতন জামা-পোষাকের বস্তা হইতে একটা পোষাক দান করিলেন। এই পুরাতন বস্ত্রগুলি যুক্তরাজ্যের ইয়াঙ্কি অঞ্চল হইতে হ্যাম্পটনের দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য দানস্বরূপ পাওয়া যাইত। বস্ত্র দানের এইরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে আমার মত অসংখ্য বালক বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইত সন্দেহ নাই।

এইবার শয্যার কথা কিছু বলিব। এতদিন ত মাটিতে শুইয়া অথবা ন্যাক্‌ড়ার বস্তায় পড়িয়া রাত্রি কাটাইতে অভ্যাস করিয়াছি। হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আসিয়া দেখি—প্রত্যেকের বিছানার উপরে দুই দুইটা করিয়া চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে। দুইটা চাদরের সমস্যা আমি কোন মতেই মীমাংসা করিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্রিতে আমি দুইটা চাদরের নীচেই শুইলাম। দ্বিতীয় রাত্রে ভুল বুঝিতে পারিয়া—দুইটা চাদরের উপরেই শুইয়া পড়িলাম। আমার ঘরে আরও ছয়জন ছাত্র শুইত। তাহারা আমার দুরবস্থা দেখিয়া বোধ হয় মজা দেখিত এবং মনে মনে হাসিত। কেহই কিছু বলিত না পরে তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে দুইটা চাদরের সার্থকতা বুঝিলাম। একটা গায়ে দিতে হয়—আর একটা পাতিয়া শুইতে হয়।

হ্যাম্পটনে বোধ হয় আমার অপেক্ষা ছোট ছেলে আর কেহ ছিল না। অনেক প্রবীণ পুরুষ ও স্ত্রী এখানে লেখাপড়া শিখিত। এই সময়ে এই বিদ্যালয়ে প্রায় চারি শত ছাত্র ও ছাত্রী ছিল। সকলকেই বিদ্যার্জ্জনে মহা উৎসুক দেখিতাম। অনেকেরই শিখিবার বয়স পার হইয়া গিয়াছে—অন্ততঃ বই মুখস্থ করিবার সময় আর তাহাদের ছিল না। তথাপি তাহারা চেষ্টা করিত। তাহাদের অকৃতকার্য্যতায় তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিত না। তাহাদের আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত বিরল। একে বেশী বয়স—তাহার উপর দারিদ্র্য, তাহার উপর অকৃতকার্য্যতা—তথাপি তাহারা বিচলিত হইত না। এরূপ কর্ম্মযোগ বেশী দেখা যায় কি?

এত আন্তরিকতা, এত উৎসাহ, এত অধ্যবসায়, এত কঠোর সাধনায় ব্রতী হইবার কারণ ছিল। তাহারা সকলেই স্বজাতিকে এবং স্বপরিবারকে উন্নত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তাহারা কেহই নিজ জীবনের জন্য ভাবিত না। নিজের কষ্ট, নিজের অক্ষমতা, নিজের অকৃতকার্য্যতা—এ সকল দুর্ব্বলতা ও নৈরাশ্যের কারণ তাহাদের চিত্তে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত না। সর্ব্বদা পরের কথা ভাবিত, ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কথা ভাবিত, সমগ্র নিগ্রো সমাজের চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিত। এজন্য লাজ মান ভয় তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

আর শ্বেতাঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের কথা কি বলিব? তাঁহারা ত স্বর্গের দেবতাস্বরূপই ছিলেন। তাঁহারা নিগ্রোজাতির জন্য যে ত্যাগস্বীকার ও চরিত্রবল দেখাইয়াছেন, তাহা সভ্যতার ইতিহাস-গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। আমার বিশ্বাস, অনতিদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণপ্রান্ত হইতে সেই স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, মানবসেবা ও শিক্ষাপ্রচারের পুণ্যকাহিনী প্রচারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

হ্যাম্পটনে জীবন গঠন

দেখিতে দেখিতে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে আমার এক বৎসর কাটিয়া গেল। গরমের ছুটি আসিল। সকলেই নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আমি বাড়ী যাই কি করিয়া? হাতে একটি পয়সাও নাই। অথচ তখনকার দিনে ছুটির সময়ে স্কুলে থাকিবারও সুবিধা ছিল না। মহা মুস্কিলে পড়িলাম। ওখান হইতে পড়িতে হইলেও ত কিছু খরচ আবশ্যক।

আমি ইতিমধ্যে একটা পুরাতন জামা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ভাবিলাম ঐটা বেচিয়া যদি কিছু পাওয়া যায়। আমি অবশ্য কোন লোককে জানিতে দিলাম না যে হাতে পয়সা নাই বলিয়া আমি বাড়ী যাইতে পারিতেছি না। ছেলেবেলায় ওরূপ অহঙ্কার ও লজ্জা সকলেরই থাকে। আমার কোট বেচিবার কারণ এক একজনকে এক একরূপ বুঝাইলাম। একটি নিগ্রো বালক আমার ঘরে জামাটা দেখিতে আসিল। সে ইহার এপীঠ ওপীঠ খুব ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল এবং দাম জানিতে চাহিল। আমি বলিলাম, "৯৲ টাকার কমে কি ছাড়া যায়?" সেও বোধ

হয় বুঝিল—দাম ঐরূপই হইবে। কিন্তু তাহারও অর্থাভাব। কালবিলম্ব না করিয়া সে অতি নির্লজ্জভাবে বলিয়া ফেলিল—"দেখ বাপু, কাজের কথা বলি, শুন। জামাটা ত আমি এখনই লইতেছি, এবং নগদ দশ পয়সা দিতেছি। বাকী দামটা যখন সুবিধা হয়, দিব।" বলা বাহুল্য আমি নিতান্তই হতাশ হইয়া পড়িলাম।

কোন মতে হ্যাম্পটন ছাড়িয়া যাইতে পাইলেই আমি নানা-স্থানে কাজ খুঁজিয়া লইতে পারিব বিশ্বাস ছিল। কিন্তু হ্যাম্পটন হইতে বাহির হওয়াই অসম্ভব। এদিকে ছাত্র, শিক্ষক সকলেই একে একে চলিয়া গেলেন। আমি একাকী রহিলাম। আমার দুঃখের আর সীমা থাকিল না।

শেষ পর্য্যন্ত একটা হোটেলে চাকরী পাইলাম। কিন্তু বেতন বড় কম। যাহা হউক লেখা পড়ার সময় অনেক পাইতাম। ফলতঃ গরমের ছুটীটায় আমি বেশ খানিকটা শিখিয়া ফেলিলাম।

গরমের ছুটির সময়ে আমি বিদ্যালয়ের নিকট ৫০৲ ঋণী ছিলাম। ছুটিতে খাটিয়া টাকা পাইলে ঐ ধার শোধ করিব মনে করিয়াছিলাম। ছুটি ফুরাইয়া আসিল—কিন্তু ৫০৲ কোন মতেই জমা হইল না।

একদিন হোটেলের একটা কামরায় টেবিলের নীচে ৩০৲ টাকার একখানা 'নোট' কুড়াইয়া পাইলাম। আমি হোটেলের কর্ত্তার নিকট উহা লইয়া গেলাম। ভাবিয়াছিলাম কিছু অন্ততঃ পাওয়া যাইবে। কিন্তু তিনি বলিলেন "ওখানে আমিই বসিয়া

কাজ করি—সুতরাং উহা আমারই প্রাপ্য।” এই বলিয়া তিনি ৩০৲ টাকার নোট পকেটস্থ করিলেন। আমি কিছু পাইলাম না।

এত কষ্টে পড়িলে হতাশ হইবারই কথা। কিন্তু উহা কাহাকে বলে আমি তাহা জানিই না। জীবনের কোন অবস্থাতেই আমি এখন পর্য্যন্ত নৈরাশ্য আস্বাদ করি নাই। যখনই যে কাজ ধরিয়াছি, আমার বিশ্বাস থাকিত যে আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইবই। সুতরাং যাঁহারা বিফলতার আলোচনা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন দিনই মতে মিলে না। কৃতকার্য্য কি উপায়ে হওয়া যায় একথা যিনি বুঝাইতে পারেন আমি তাঁহারই ভক্ত। বিফলতা কেন হয়—একথা যিনি বুঝাইতে আসেন আমি তাঁহার কাছে ঘেঁসি না।

ছুটির শেষে বিদ্যালয়ে গেলাম। কর্ত্তৃপক্ষকে বলিলাম—“ধার শোধ করিবার ক্ষমতা এখনও আমার হয় নাই—স্কুলে প্রবেশ করিতে পারি কি?” খাজাঞ্চি ছিলেন সেনাপতি মার্শ্যাল। তিনি সাহস দিয়া বলিলেন, “তোমাকে এ বৎসর ভর্ত্তি করিয়া লইলাম। তুমি একদিন না একদিন আমাদের ঋণ শোধ করিতে পারিবে—আমার বিশ্বাস আছে।” দ্বিতীয় বৎসরও পূর্ব্বের ন্যায় আমি খানসামাগিরি করিতে করিতে এখানে লেখাপড়া শিখিতে থাকিলাম।

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে বই পড়ানও হইত বটে, কিন্তু পুস্তক পাঠ অপেক্ষা অন্যান্য অসংখ্য উপায়েই আমি ওখানে বেশী শিক্ষা লাভ করিয়াছি। দ্বিতীয় বৎসরে আমি শিক্ষকগণের স্বার্থত্যাগ ও

চরিত্রবত্তা দেখিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলাম। তাঁহারা নিজের কথা না ভাবিয়া কেবল মাত্র পরের কথাই ভাবিতেন। তাঁহাদের জাতিমর্য্যাদা ছিল, বংশগৌরব ছিল, বিদ্যার সম্মান ছিল; সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিও ছিল। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নিজের আর্থিক উন্নতি যথেষ্ট করিতে পারিতেন—সংসারে নূতন নূতন যশোলাভের সুযোগও তাঁহাদের কম ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না—আমাদের অবনত কৃষ্ণকায় সমাজকে বিদ্যায়, ধনে ও ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মেই তাঁহাদের একমাত্র সুখ ছিল। দ্বিতীয় বৎসরের বসবাসের ফলে আমি শিখিলাম যে পরোপকারী ব্যক্তিই একমাত্র সুখী। যাঁহারা অন্য লোককে নানা উপায়ে সুখী ও কর্ম্মঠ করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা সুখী লোক সংসারে আর নাই। এই শিক্ষা আমার জীবনে কখনও নষ্ট হইবে না।

হ্যাম্পটনে আমি পশুপক্ষী জীবজন্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব ভাল রকম জ্ঞান লাভ করি। এখানকার কৃষিবিভাগের জন্য অতি উত্তম জাতির পশুপক্ষী আমদানি করা হইত। ঐ গুলিকে পালন করিবার ব্যবস্থাও অতি উন্নত ধরণের ছিল। এই সকল কাজে আমরা অভ্যস্ত হইতাম—তাহাতে কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন, জীব-বিদ্যা, প্রাণি-তত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কার্য্যকরী শিক্ষা হইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে আজ পর্য্যন্ত আমি জীবজন্তুর ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে সমর্থ। ছেলে বেলা হইতে ভাল ভাল জানোয়ার

এবং তাহাদের গতিবিধি অভ্যাস, স্বভাব, খাদ্যাখাদ্য, রোগ, ঔষধ ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ পাইলে প্রত্যেক লোকই ভবিষ্যতে পাকা ওস্তাদ হইয়া উঠিতে পারে।

দ্বিতীয় বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শিক্ষা হইয়াছিল—বাইবেল গ্রন্থের উপকারিতা। কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ হিসাবেই নহে, উৎকৃষ্ট সাহিত্য হিসাবেও বাইবেল বিশেষরূপেই পাঠ করা উচিত—এই ধারণা জন্মিয়াছিল। ফলতঃ, আজকাল কাজের খুব ভিড় থাকিলেও আমি দুই এক অধ্যায় বাইবেল না পড়িয়া দিন যাইতে দিই না।

বাইবেলের উপকারিতা আমি কুমারী লর্ডের শিক্ষকতায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আমি আর এক কারণেও ঋণী। আজ কাল আমি বক্তৃতা করিতে মন্দ পারি না—এমন কি, সাহিত্যজগতে আমি বাগ্মী বলিয়াই খ্যাত। এই বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা আমাকে কুমারী লর্ডই শিখাইয়াছিলেন। শ্বাস প্রশ্বাসের নিয়ম, উচ্চারণ করিবার রীতি, জোর দিবার ভঙ্গী, দম লইবার কায়দা, ইত্যাদি বক্তৃতা করিবার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি আমি তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলাম। এইগুলি শিখিবার জন্য আমি ইঁহার নিকট বিদ্যালয়ের অবকাশকালে একাকী উপদেশ লইতাম।

আমি অবশ্য বক্তৃতা ও বাচালতার একেবারেই পক্ষপাতী নহি। কেবল ওজস্বিতা বা বাক্যযুদ্ধ ও কথার মারপ্যাঁচ দেখাইবার জন্য আমি বক্তৃতা অভ্যাস করি নাই—এবং কখনও বক্তৃতা দিই নাই। ছেলেবেলা হইতে আমি পরোপকার কর্ম্মে ব্রতী

হইব স্থির করিয়াছিলাম। জগতের বিদ্যাভাণ্ডার ও কর্ম্ম-কেন্দ্র-গুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। আমি ভাবিতাম; যদি কোন উপায়ে সংসারের উপকার করিতে পারি তাহা হইলে সে সম্বন্ধে লোকজনকে বুঝানও আবশ্যক হইবে। আমি বুঝিয়াছিলাম,—একটা কোন অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া তাহা সফল করিতে পারিলে লোকসমাজে তাহার প্রচারের জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বুঝিয়া সদনুষ্ঠানের প্রচার, সৎকর্ম্মের বিস্তার এবং সদ্ভাবের প্রসার ইত্যাদি উদ্দেশ্যেই আমি বাগ্মিতার শিক্ষা লইতেছিলাম—ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বাহবা লইবার জন্য নহে। আমার মতে "কার্য্য আগে করিব—তাহার পরে তাহা জগৎকে জানাইব"—এই আদর্শেই বাগ্মিগণের জীবন গঠন করা কর্ত্তব্য।

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ে অনেকগুলি ডিবেটিং ক্লাব বা আলোচনা-সমিতি ছিল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে তাহাদের অধিবেশন হইত। এই অধিবেশনগুলির একটাও কখন বাদ দিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এদিকে এত ঝোঁক ছিল যে আমি এইগুলির অতিরিক্ত একটা নূতন সমিতিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। আমাদের খাওয়া শেষ হইবার পর পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রায় ২০ মিনিট ফাঁক থাকিত। এই সময়টা ছেলেরা সাধারণতঃ গল্প গুজবে কাটাইত। আমার উদ্যোগে ২০।২৫ জন ছাত্র মিলিয়া এই সময়টায় আলোচনা বক্তৃতা ইত্যাদি করিবার জন্য একটা নূতন ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসরের গ্রীষ্মাবকাশ আসিল। এবার আমার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। আমার মাতা ও দাদা কিছু টাকা পাঠাইয়াছিলেন, একজন শিক্ষকও কিছু দান করিয়াছিলেন। আমি 'স্বদেশে' চলিলাম। ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়ার ম্যাল্‌ডেনে এবার ছুটি কাটিল।

বাড়ীতে আসিয়াই দেখি, নুনের কল বন্ধ, কয়লার খাদে কাজ চলিতেছে না, কুলীরা সব 'ধর্ম্মঘট' করিয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের একটা রহস্য বলিতেছি। প্রায়ই দেখিতাম, যখন কুলী মহলের পরিবারে দুই তিন মাসের উপযুক্ত খরচের টাকা জমা হইয়া গিয়াছে তখনই তাহারা কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া মহাজনগণকে বিব্রত করিত। যখনই বসিয়া খাইতে খাইতে টাকা ফুরাইয়া আসিত তখনই আবার তাহারা দলে দলে কাজে ঢুকিত। এইরূপে অনেকে যথেষ্ট দেনাও করিয়া ফেলিত। তখন আর তাহারা তাহাদের পুরাতন অভাব অভিযোগ ইত্যাদির কথা তুলিতই না— কোন উপায়ে একটা কাজ পাইলেই খুসী থাকিত। মোটের উপরে দেখিতাম যে, ধর্ম্মঘটের ফলে কুলীদের সর্ব্বাংশেই ক্ষতি হইত। অনেক সময়ে কল ও খাদের কর্ত্তা তাহাদিগকে পুনরায় কাজ দিতে অস্বীকার করিতেন। তখন তাহারা যথেষ্ট ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইত। আমার যতদূর বিশ্বাস, কতকগুলি হুজুগপ্রিয় পাণ্ডাদিগের পাল্লায় পড়িয়া কুলীরা নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডাকিয়া আনিত। ধর্ম্মঘটের আমি আর কোন ব্যাখ্যা ত পাই না।

আমাকে দেখিয়া আমার পরিবারের সকলেই অবশ্য মহা খুসী। তাহার পর আমার নিমন্ত্রণের পালা পড়িল। পাড়ার প্রত্যেকেই আমাকে তাহাদের বাড়ীতে এক এক দিন খাইতে বলিত। আমি তাহাদিগকে হ্যাম্পটনের গল্প করিতাম। তাহা ছাড়া আমাকে ধর্ম্মমন্দিরে রবিবারের বিদ্যালয়ে এবং আরও কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিতেও হইয়াছিল। দিন মন্দ কাটিতে-ছিল না—কিন্তু ধর্ম্মঘটের ফলে আমার স্বগ্রামে কাজ জুটিল না। তাহা হইলে পুনরায় হ্যাম্পটনে যাইব কি করিয়া? একদিন অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গেলাম তথাপি কাজ পাইলাম না। ফিরিতে বেশী রাত্রি হইয়া পড়ে—রাস্তায় একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে শুইয়া থাকিলাম। শেষে দেখি ভোর রাত্রি তিনটার সময় আমার দাদা আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ 'পোড়ো' বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। আমাকে খবর দিলেন যে, রাত্রে মাতার মৃত্যু হইয়াছে।

মাতার মৃত্যুতে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। তিনি বহুকাল হইতেই ভুগিতেছিলেন জানিতাম—কিন্তু হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে ভাবিতে পারি নাই। আমার সাধ ছিল—অন্তিম-কালে আমি তাঁহার সেবা করিব। কিন্তু সে সৌভাগ্যে আমি বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার উৎসাহে ও সাহসেই আমি লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছি। তাঁহার অভাব আমার জীবনে একমাত্র দুঃখের কারণ হইল। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও যথার্থ দুঃখ অনুভব করি নাই। তাহার পরেও আমি কখন অন্যান্য দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করি নাই।

মাতার মৃত্যুর পর আমাদের গৃহস্থালী বিশৃঙ্খলতা পূর্ণ হইয়া গেল। ভগ্নীটি ছোট—সে সকল দিক দেখিয়া উঠিতে পারিত না। আমাদের কোন দিন খাওয়া জুটিত কোন দিন জুটিত না। তাহার উপর আবার আমার চাকরী নাই। এই দুঃখের দিনে রাফ্‌নার পত্নী আমাকে একটা কাজ দিলেন। তাহাতে কিছু পয়সা হইল। তাহার দ্বারা হ্যাম্পটনের পথ খরচের ব্যবস্থা হইয়া গেল। ইতিমধ্যে আমার দাদা একআধটা জামা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন।

স্কুল খুলিতে আরও তিন সপ্তাহ বাকী। এমন সময়ে প্রধান শিক্ষয়িত্রী, কুমারী ম্যাকি আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, আমাকে সপ্তাহ মধ্যেই ফিরিতে হইবে, এবং ফিরিয়া বাড়ীঘর পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। এই পত্র পাইয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। কারণ ইহাতে যে বেতন পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা স্কুলের খরচ অগ্রিম কিছু দেওয়া হইয়া থাকিবে। আমি দেরি না করিয়া হ্যাম্পটনে রওনা হইলাম।

পৌঁছিয়াই দেখি ইয়াঙ্কি রমণী নিজেই দরজা জানালা বেঞ্চ টেবিল ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কাজ কর্ম্ম দেখিয়া আমি দুইটি শিক্ষা লাভ করিলাম। প্রথমতঃ অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া এবং উচ্চ শিক্ষিতা রমণীরাও দাসদাসীর ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা হওয়া মুখের কথা নয়। তাহার জন্য দায়িত্ব যথেষ্ট। কুমারী ম্যাকির দায়িত্ব জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি

জানিতেন যে, ছুটির পর স্কুল খুলিবার সময়ে কোন বিষয়ে শৃঙ্খলা না থাকিলে তিনিই নিন্দিত হইবেন। সুতরাং তিনি সমস্ত ছুটিটা নিশ্চিন্তভাবে ভোগ করিতে পারেন না। অন্যান্য সকলে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে সকল ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিয়া রাখিতে হইবে। কর্ত্তার ঝুঁকি তিনি বেশ ভালরকম বুঝিয়াছিলেন।

তখন হইতে আমি নেতার কর্ত্তব্য এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। দায়িত্ববোধহীন পরিচালককে আমি কোন সম্মান করি না। তাহা ছাড়া, যে বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে শারীরিক পরিশ্রম শিক্ষা দেওয়া হয় না আমি তাহার প্রশংসা করিতে পারি না। ধনবান্, নির্ধন, উচ্চ, নীচ—সকলেরই হাতে পায়ে খাটিয়া কাজ করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শারীরিক পরিশ্রম অভ্যাস করাইবার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ম্যাকির দৃষ্টান্তে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

হ্যাম্পটনে এবার আমার শেষ বৎসর। খুব বেশী খাটিয়া লেখা পড়া করিতে হইল। আমি 'অনার'-পাশ করিলাম। এই পাশ বেশী গৌরবসূচক বিবেচিত হইত। ১৮৭৫ সালের জুন মাসে—অর্থাৎ প্রায় ১৬।১৭ বৎসর বয়সে আমি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিলাম। আমার এই তিন বৎসরের শিক্ষার ফল নিম্নে বিবৃত করিতেছি :—

(১) প্রথমতঃ, আমি একজন প্রকৃত মানুষের মত মানুষের দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রভাবে জীবন গঠন করিতে শিখিয়াছি।

তাঁহার নাম সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ। আমি পুনরায় বলিতেছি তিনি আমার চিন্তারাজ্যের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মহাবীর। তাঁহার ন্যায় সাধুপুরুষ আর আমি দেখি নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমি বিদ্যালাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন ধারণা অর্জ্জন করিলাম। লোকে লেখাপড়া শিখে কেন? পূর্ব্বে নিগ্রোসমাজের সাধারণ লোকজনের কথাবার্ত্তা ও চালচলন দেখিয়া ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শারীরিক পরিশ্রম হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। এবং লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাবুগিরি করিয়া কাল কাটাইতে পারে। হ্যাম্পটনে আমার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। ওখানকার আবহাওয়াতে হাতে পায়ে কাজ করা, খাটিয়া খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম করা ইত্যাদি কার্য্য প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত হইত। নিষ্কর্ম্মা মানুষ কাহাকে বলে সেই বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে জানিতে পারিতাম না। ছাত্র, শিক্ষক সকলেই পরিশ্রম করিতে ভাল বাসিতেন এবং পরিশ্রমী-লোককে সম্মান করিতেন। পরিশ্রম না করাটাই সেখানে একটা নিন্দনীয় ও গর্হিত কার্য্য ছিল এবং অশিক্ষিত লোকের লক্ষণ বিবেচিত হইত। কাজকর্ম্ম করিলে পয়সা পাওয়া যায়, অন্নের ব্যবস্থা হয়, আর্থিক দৈন্য ঘুচে, সংসার পালন নিরুদ্বেগে করা যায়। এ সকল কথা আমাদের ওখানে সকলেই বুঝিত। এই বুঝিয়া আমরা খাটিতাম—সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, আমরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর হইবার জন্যই এখানে নিজে

খাটিতে শিখিতাম। কোন বিষয়ে পরের অধীন থাকিব না, নিজের সকল অভাব নিজেই মোচন করিয়া লইব—এই আদর্শেই আমরা শারীরিক পরিশ্রমকে আদর করিতে শিখিয়াছিলাম। ফলতঃ খাটিয়া খাওয়া এবং শিক্ষালাভে কোন বিরোধ নাই—এই জ্ঞান আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

(৩) তৃতীয়তঃ স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের শিক্ষা আমি হ্যাম্পটনেই প্রথম পাই। ওখানেই শিখি, যাঁহারা নিজ উন্নতির আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া অপরের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন সংসারে একমাত্র তাঁহারাই সুখী। পরোপকার ও লোকসেবা করিতে পারাই মানব জীবনের একমাত্র সুখ।

আমি হ্যাম্পটনের গ্রাজুয়েট হইলাম সার্টিফিকেটও পাইলাম। ইতিমধ্যে পয়সা ফুরাইয়া আসিয়াছে। কনেক্টিকাট প্রদেশের একটা হোটেলে চাকরী সংগ্রহ করিলাম। একজনের নিকট কিছু ধার করিয়া পথ খরচের ব্যবস্থা করা গেল। যথা সময়ে সেই চাকরী স্থলে উপস্থিত হইলাম।

আমার বিদ্যা বুদ্ধি দেখিয়া হোটেলের কর্ত্তা আমাকে পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, কিন্তু ও বিষয়ে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। কয়েকজন বড়লোক টেবিলে খাইতে বসিয়াছেন। আমি পরিবেষণের নিয়ম জানি না দেখিয়া তাঁহারা আমাকে মারিতে উঠিলেন। আমি ভয়ে কাজ ছাড়িয়া দিলাম। তাঁহারা খাদ্যদ্রব্য আর পাইলেন না। এই ঘটনার পর আমাকে নিম্ন

শ্রেণীর খান্সামার কাজ করিতে হইল। পরে পরিবেষণের কাজ শিখিয়া লইলাম। আবার সেই উচ্চ পদে উন্নীত হইয়াছিলাম।

যে হোটেলে আমি এই সময়ে খান্সামাগিরি করিতেছিলাম, এই হোটেলেই আমি ভবিষ্যতে পয়সা খরচ করিয়া অতিথিভাবে বাস করিয়া গিয়াছি। সংসারে এইরূপ পরিবর্ত্তন অহরহ ঘটিতেছে।

হোটেলের কাজ ছাড়িয়া আমার স্বদেশ ম্যাল্‌ডেন-নগরে ফিরিয়া গেলাম। তখন হইতে আমি আমাদের সেই নিগ্রো-বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। আমার সুখের দিন আরম্ভ হইল—কারণ এতদিনে আমি নিগ্রোজাতির জন্য কর্ম্ম করিতে উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছি। এতদিন পরে আমার পল্লীবাসীদিগকে উন্নত করিবার সুযোগ পাইলাম।

প্রথম হইতেই বুঝিলাম যে নিগ্রোসমাজে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা প্রচার করিলে আমাদের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে না। কতকগুলি পুস্তক পড়িতে শিখিলেই নিগ্রোরা মানুষ হইবে না। তাহাদের সমস্ত জীবনটা নূতন ভাবে গঠন করা আবশ্যক। আমি সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত খাটিতে লাগিলাম। স্কুলে পড়ান ছাড়া পল্লী ভ্রমণ এবং গ্রাম পরিদর্শন আমার কাজের মধ্যে ছিল। আমি ছাত্রদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতাম। তাহাদিগকে চুল পরিষ্কার রাখিতে শিখাইতাম, দাঁত মাজিতে বলিতাম। তাহারা স্নান করিতে, পোষাক ধুইতে এবং অন্যান্য নানা কাজ করিতেও উপদেশ পাইত। নিজ হাতে তাহাদের

অনেক কাজ করিয়া দিতাম। এই সকল কাজের উপকারিতাও বুঝাইয়া দিতাম। নিগ্রো-পল্লীতে এই উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষার এবং শরীর পালনের সরল উপায়গুলি সহজেই প্রচারিত হইতে লাগিল। স্নান করা ও দাঁত মাজার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি সর্ব্বদাই বক্তৃতা করিতাম। যে দিন হইতে নিগ্রোরা দাঁত মাজা আরম্ভ করিল সেই দিন হইতে তাহারা যথার্থ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিল বলিতে পারি।

গ্রামের অনেক লোকেই স্ত্রী-পুরুষ সকলেই লেখা পড়া শিখিতে চাহিল। কিন্তু তাহারা দিবা ভাগে খাটিয়া অন্ন সংস্থান করে। কাজেই তাহাদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় খুলিলাম। প্রথম হইতেই নৈশ-বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী হইত। ৫০ বৎসরের বেশী বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের শিখিবার অধ্যবসায় দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম।

পল্লীসেবার অন্যান্য অনুষ্ঠানও আমি এই সঙ্গে আরম্ভ করিলাম। গ্রামের মধ্যে একটা গ্রন্থশালা এবং একটা আলোচনা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলাম। রবিবারের জন্য কয়েকটা নূতন কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া ছিলাম। ম্যাল্‌ডেন-নগরে একটা রবিবারের বিদ্যালয় ছিল—এবং এখান হইতে তিন মাইল দূরে আর একটা রবিবারের বিদ্যালয় ছিল। প্রতি রবিবারে এই দুইটি স্কুলেই আমি পড়াইতাম। এতদ্ব্যতীত, আমি কয়েকজন যুবককে ঘরে পড়াইয়া হ্যাম্পটনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম এই সকল কার্য্যের জন্য অবশ্য বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে সামান্য কিছু

[illegible]। কিন্তু বেতনের লোভেই আমি ম্যাল্‌ডেনে [illegible] নিগ্রোসমাজের উন্নতির জন্য আমার আন্তরিক [illegible] আমার এই কর্ম্মতৎপরতার কারণ ছিল'।

আমি যতদিন লেখা পড়া শিখিতেছিলাম, ততদিন আমার দাদা 'জন' আমাদের রবিবারের খরচ চালাইবার জন্য কয়লার খাদে কাজ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্যও পাইয়াছি। আমার শিক্ষালাভের জন্য তিনি নিজের বিদ্যার্জ্জনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাজেই আমি হ্যাম্পটন হইতে ফিরিয়া আসিয়া জনকে হ্যাম্পটনে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তিন বৎসরে তিনিও হ্যাম্পটনের বিদ্যা শেষ করিয়া আসিলেন। পরে তিনি আমার টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের শিল্প বিভাগের কর্ত্তা হইয়াছেন। জন যখন হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন তখন আমরা দুইজনে মিলিয়া আমাদের পোষ্য ভাই জেম্‌স্‌কে হ্যাম্পটনে পাঠাইয়াছিলাম। জেম্‌স্‌ও লেখা পড়া শিখিয়া আমার টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের ডাকঘরের কর্ত্তা হইয়াছে।

১৮৭৬।১৮৭৭ সাল ম্যাল্‌ডেনে একরূপেই কাটিল। স্কুল-পড়ান, পল্লীপর্য্যবেক্ষণ, লোকশিক্ষা ইত্যাদি নানাবিধ কাজে আমার সময় ব্যয় হইত। প্রায় এই সময়ে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ মহলে কয়েকটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহারা নিগ্রো-জাতির রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এই সমিতিগুলির নাম ছিল 'কুক্লুক্স'। গোলামীর যুগে এইরূপ কতকগুলি শ্বেতাঙ্গ সমিতি ছিল। তাহারা

রাত্রিকালে নিগ্রোদিগের মহলে মহলে ঘুরিয়া নিগ্রোরা কোন গুপ্ত পরামর্শ প্রভৃতি করিতেছে তাহার সন্ধান রাখিত। তাহাদের ন্যায় এই "কুক্লুক্‌স্"-[illegible] রাত্রিকালে আমাদের উপর ডিটেক্‌টিভের কাজ করিত আমাদের কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় উন্নতির বিরোধী ছিল তাহা নহে। তাহাদের দৌরাত্ম্যে আমাদের ধর্ম্মমন্দির, বিদ্যামন্দিরও টিকিতে পারিত না। তাহারা আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠানগৃহ পুড়াইয়া দিয়াছিল। আমাদের কোন কর্ম্ম-কেন্দ্রই ইহাদের আমলে নিরাপদ ছিল না। বহু নিগ্রোর জীবনও নষ্ট হইয়াছিল। এই সূত্রে ম্যাল্‌ডেনে একবার একটা ছোট খাট লড়াই বাধিয়া যায়। সাদা চামড়া এবং কাল চামড়া উভয় পক্ষের লোক সর্ব্বসমেত প্রায় ২০০।২৫০ মিলিয়া মহা দাঙ্গা বাধাইয়া দিল। অনেক ভাল ভাল লোক আহত হইয়া পড়েন। আমার পূর্ব্বতন মনিব জেনারেল রাফ্‌নার নিগ্রোদিগের পক্ষ লইয়া প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলেন। এজন্য শ্বেতাঙ্গ কুক্লুক্‌স্ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে এমন জখম করিয়া দিয়াছিল যে তিনি আর সারিয়া উঠিলেন না। নিগ্রোসমাজের জন্য এই সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ পুরুষের প্রাণ গেল।

কুক্লুক্‌স্‌দিগের যুগ চলিয়া গিয়াছে। আর দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ সমাজে সদ্ভাব বাড়িয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

'যুক্ত-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার যুগ

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আমার ৮।৯ বৎসর বয়সে আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে সন্ধি হয়। তাহার ফলে গোলামের জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত দুই প্রান্তের শ্বেতকায় মহলে নানা বিষয়ে বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে দুই অঞ্চলের লোকেরা মিলিয়া একটা রফা করিয়া লইলেন। যথার্থ ঐক্যবিশিষ্ট যুক্ত-রাষ্ট্র এই সময়ের মধ্যেই গড়িয়া উঠে। এই ১০।১১ বৎসর আমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষেও অতি মূল্যবান সময়। কারণ এই সময়ের মধ্যে আমি আমার বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া মানুষ হইবার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। গোলামবাদের আব্‌হাওয়া ছাড়িয়া নব নব দুঃখ দারিদ্র্যের সংসারে বাড়িয়া উঠিয়াছি। হ্যাম্পটনে লেখা পড়া শিখিবার জন্য কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। তাহার পরে ম্যাল্‌ডেনে পরোপকার ও শিক্ষাপ্রচার-কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি।

এই যুগ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রোজাতির ইতিহাসেও স্মরণীয় কাল। ইহাকে তাহাদের নবজীবনের শৈশব কাল বলিতে পারি। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের হৃদয়ে নব নব আশা

জাগিয়াছে, তাহারা নূতন চোখে পৃথিবী দেখিতে [illegible] তাহাদের চিত্তে প্রথম হইতেই দুইটি ইচ্ছা স্থায়ী [illegible]র করিয়া বসিল। প্রথমতঃ গ্রীক ও ল্যাটিন শিখিবার জন্য তাহারা অত্যধিক লালায়িত হইল। দ্বিতীয়তঃ লেখাপড়া শিখিয়া সরকারের চাকরী পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলাই বাহুল্য, যুগযুগান্তর ধরিয়া যাহারা গোলামী করিয়াছে তাহাদের পক্ষে বিদ্যালাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা সহজ নয়। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক গ্রামেই অবশ্য অসংখ্য পাঠশালা খোলা হইতে লাগিল। দিবা-বিদ্যালয়, নৈশ-বিদ্যালয়, রবিবারের বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যালয়ে নিগ্রো-সমাজ ভরিয়া গেল। স্কুলগুলি ছাত্র ছাত্রীতে পূর্ণ থাকিত। ৬০।৭০।৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধেরাও লেখাপড়া শিখিতে ছাড়িল না। শিক্ষা লাভের জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া কাহার না আনন্দ হয়? কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে নিগ্রোমাত্রেই ভাবিতে লাগিল যে, আর তাহাদের হাতে পায়ে খাটিতে হইবে না, লেখা পড়া শিখিয়া তাহারা আফিসের কেরাণী অথবা বড় সাহেব হইতে পারিবে। মাথায় তাহাদের আর একটা খেয়াল ঢুকিল যে, গ্রীক ল্যাটিন ভাষায় দুই চারিটা বুকনি না দিতে পারিলে পণ্ডিত হওয়া যায় না। এই সকল ভাষায় যাহারা কথা বলিতে পারে, তাহারা না জানি কোন্ অপূর্ব্ব জগতের লোক! এমন কি, আমারও এইরূপই অনেক সময়ে মনে হইত।

লেখা পড়া শিখিয়া আমার স্বজাতিরা কেহ শিক্ষক কেহ

[illegible]ইতে লাগিলেন। কৃষিকর্ম্ম, শিল্প, ব্যবসায়, পশু-পালন ইত্যাদি কার্য্যে মজুরের ন্যায় খাটিতে হয়। সুতরাং যথাসম্ভব সকলেই এই সকল কার্য্য বর্জ্জন করিতে প্রয়াসী হইল। বিদ্যা-দানকেই জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিতে অবশ্য খুব কম লোকই পারিত। প্রকৃত ভক্তভাবে ধর্ম্মগুরুর দায়িত্ব গ্রহণ করাও অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাহারা সহজে বিনা পরিশ্রমে বাবুগিরি করিয়া জীবন কাটাইবার জন্যই এই দুই দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। যাহারা পণ্ডিতি করিতে চাহিত তাহাদের পেটে অনেক সময়ে তিল মাত্র বিদ্যা থাকিত কি না সন্দেহ। কেহ কেহ কোন উপায়ে নাম সহি করিতে শিখিয়াই মাষ্টারী খুঁজিত। আমার মনে আছে একবার এক ব্যক্তি একটা পাঠশালার চাক্‌রী চাহিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "বল ত পৃথিবীর আকার কিরূপ ? তুমি ছেলেদিগকে এ বিষয় কিরূপে বুঝাইবে ?" সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "কেন মহাশয়, পৃথিবী গোলাকার বা চ্যাপ্টা এ সব জানিয়া আমার প্রয়োজন কি ? স্কুলের কর্ত্তাদের ও সম্বন্ধে যাহা মত আমি তাহাই ছাত্রদিগকে শিখাইতে প্রস্তুত আছি।"

এই গেল গুরুমহাশয়দিগের অবস্থা। ধর্ম্মপ্রচারকগণের অবস্থা আরও শোচনীয়। অত নিরেট মূর্খ ও কুসংস্কারপূর্ণ এবং চরিত্রহীন লোক বোধ হয় অন্য কোন ব্যবসায়ে দেখা যায় না। যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক সকলেই মনে করিত, "আমি ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি।" ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে "আদেশ"

বহু লোকেই পাইতে লাগিল! দুই তিন দিন স্কুলে অ[illegible]ার দেখিতাম ছাত্রেরা চলিয়া যাইতেছে। অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইত—তাহারা 'আদেশ' পাইয়া ধর্ম্মগুরুর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। এই 'আদেশ' পাওয়া ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক। গির্জাঘরে লোকজন বসিয়া আছে এমন সময়ে একব্যক্তি হঠাৎ মেজের উপর পড়িয়া যাইত। বহুক্ষণ নিস্পন্দ অসাড় ও বাক্‌শক্তিহীন অবস্থায় থাকিত। অমনি পাড়ায় সাড়া পড়িয়া যাইত, অমুক ব্যক্তির 'আদেশ' হইয়াছে। তাহার পর হইতেই সে ধর্ম্মগুরু! এইরূপ 'দশায়' পড়া প্রায় প্রত্যেক নিগ্রোপল্লীতে প্রতি সপ্তাহেই দুই চারিটা ঘটিত। আমি এই 'দশায়' পড়া ব্যাপারটাকে বুজরুকি মনে করিতাম। আমার ভয় হইত পাছে আমিও বা কোন দিন দশায় পড়িয়া ভগবানের আদেশ পাইয়া বসি। আমার সৌভাগ্য আমি সেরূপ আদেশ পাইবার অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছি।

সমাজে ধর্ম্মগুরুর সংখ্যা যারপরনাই বাড়িতে থাকিল। একটা ধর্ম্মমন্দিরের কথা আমার মনে আছে—তাহার অন্তর্গত খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক সংখ্যাই ছিল সর্ব্বসমেত ২০০ জন মাত্র। অথচ তাহার ধর্ম্মপ্রচারক সংখ্যাই প্রায় ২০। আজকাল নিগ্রোসমাজে ধর্ম্মের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষ্ণাঙ্গ জাতি যথেষ্ট নৈতিক শক্তি লাভ করিয়াছে। 'দশায়' পড়া এবং 'আদেশ' পাওয়ার হুজুগ অনেক কমিয়া আসিয়াছে। আর ৩০।৪০ বৎসর পরে আমাদের আরও উন্নতি হইবে আশা করিতেছি।

[illegible]প্র[illegible]রের ব্যবসায়ে না লাগিয়া কৃষিকার্য্যে শিল্পকা [illegible] [illegible]োরা মনোনিবেশ করিতে উৎসাহী হইতেছে। ইহা সুলক্ষণ। প্রকৃত চরিত্রবান্ সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। শিক্ষক-সমাজেও যোগ্য শিক্ষা-প্রচারকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৬৭ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত উত্তরে দক্ষিণে এক হইয়া জমাট বাঁধিতেছিল—প্রকৃত যুক্ত-রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছিল। এই যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচার-বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃপক্ষের নাম "ফেডারেলসরকার" বা 'যুক্তদরবার'। এই যুক্ত দরবারের নায়কতায়ই আমেরিকার গৃহবিবাদ শীঘ্র শীঘ্র ঘুচিয়া গিয়াছে। এই ফেডারেল-সরকারের চেষ্টায়ই গোলামের জাতি স্বাধীনতা পাইয়াছে। এই ফেডারেল-সরকারই এখন যুক্ত-রাষ্ট্রের নূতন শাসন-প্রণালী, নূতন বিচার-প্রণালী, ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া নবীন রাষ্ট্রগঠনে বিশেষ উদ্যোগী।

সুতরাং নিগ্রোরা এই যুক্ত-দরবারের নিকট সকল অভাব-অভিযোগের মীমাংসা আশা করিতে লাগিল। তাহারা ভাবিত যে ২০০ বৎসর নিগ্রোজাতি গোলামী করিয়া আমেরিকার ধন-সম্পদবৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। গোলামগণের রক্তেই যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বল, শিল্প বল, ব্যবসায় বল সকলই পরিপুষ্ট হইয়াছে। নিগ্রোজাতিই যুক্তরাজ্যের সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য, সকলপ্রকার সুখভোগ, সকলপ্রকার প্রতিষ্ঠা লাভের মূল কারণ। নিগ্রো-জাতিকে কেনা গোলাম করিয়া না রাখিলে আমেরিকার সভ্যতা

গড়িয়া উঠিতে পারিত না। আজ তাহা স্বাধীনতা দিয়াছে সত্য। কিন্তু ইহা নিগ্রো-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম স্বীকারের মূল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এখনও তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনেক দাবী করিতে অধিকারী। কেবল আব্দার মাত্র নয়, জননীর নিকট বালকের ক্রন্দন ও প্রার্থনা মাত্র নয়, প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাওয়া নয়, নিগ্রোজাতি যুক্তদরবারের নিকট তাহাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী করিতেছে—তাহারা এইরূপই ভাবিত। আমিও অনেক সময়ে ভাবিয়াছি—যুক্তদরবার আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন কেন? আমাদের প্রতি এই দরবারের কর্ত্তব্য, ইয়াঙ্কি-জাতির কর্ত্তব্য, সমগ্র শ্বেতাঙ্গসমাজের কর্ত্তব্য এই টুকুতেই কি শেষ হইয়া গেল—এই সামান্য কর্ম্মেই কি তাহারা আমাদের ঋণ শোধ করিয়া ফেলিল? আমি ভাবিতাম, যুক্তদরবারের আমা-দিগকে স্বাধীন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। এজন্য আমাদিগের সমাজে শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন করাও তাহার কর্ত্তব্য ছিল।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিচারাদি কার্য্য দুই দরবারে নিষ্পন্ন হয়। কতকগুলি কার্য্য প্রত্যেক প্রদেশের দরবারই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রের দরবারগুলি ঐ সকল বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। আর কতকগুলি

যাহার উপর প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাত নাই, সে গুলিকে দরবার নিয়ন্ত্রিত করিতে অনধিকারী। এই সব কার্য্য-গুলিকে আমেরিকায় 'জাতীয়' বা 'সার্ব্বপ্রাদেশিক' নামে চিহ্নিত করা আছে। এই সমুদয় কার্য্যনির্ব্বাহের ভার 'ফেডারেল-সরকার' বা যুক্তদরবারের উপর ন্যস্ত। যুক্তদরবার প্রাদেশিক রাষ্ট্রগুলির মত লইয়া একটা নূতন বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থাকে "জাতীয়" বিধান বলা হইয়া থাকে।

আমি বলিতে চাহি নিগ্রোসমস্যা আমেরিকার অন্যতম "জাতীয়" সমস্যা—প্রাদেশিক সমস্যা মাত্র নহে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে নিগ্রোজাতির ভাগ্য রাখিয়া দেওয়া উচিত নয়। নিগ্রোজাতি এত দিন যে পরিশ্রম করিয়াছে তাহার ফলে সমগ্র শ্বেতাঙ্গজাতিই লাভবান্ হইয়াছেন—আমেরিকার সকল প্রদেশেই তাহার সুফল ফলিয়াছে। সুতরাং নিগ্রোজাতিকে মানুষ করিবার জন্য প্রাদেশিক দরবারগুলিকে উপদেশ দিয়াই যুক্তদরবারের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হয় নাই। প্রাদেশিক দরবারগুলি আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন করুন। কিন্তু আমেরিকার 'জাতীয় বিধান' হইতেও আমরা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অনেক আশা করিতে পারি।

যুক্তদরবার আমাদিগের স্থাবর সম্পত্তি লাভ সম্বন্ধে সাহায্য করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদের শিক্ষার জন্য "জাতীয় কোষাগার হইতে বার্ষিক কিছু প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। যুক্তদরবার আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকারভোগের জন্য যথাবিধি

উপযুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, সাদা কাল চামড়ার প্রভেদ ধীরে ধীরে তুলিয় অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আমাদিগকে স্বাধীনতা দিবার পরক্ষণ হইতেই এই সকল সমস্যা যুক্তরাষ্ট্রে উঠিবে তাহা ফেডারেল-সরকারের জানা উচিত ছিল। তাহা জানিয়া প্রথম হইতেই আমাদিগের ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু কর্ম্ম করাও উচিত ছিল। কিন্তু যুক্তদরবার বেশী কিছু করিলেন না।

আমার স্বজাতিরা অবশ্য আশা করিতে ছাড়িল না। আমরা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট যাহাই পাই না কেন, যুক্ত-দরবারের নিকটও আমরা সকল বিষয়েই সুবিচার এবং ন্যায়সঙ্গত অনুশাসন আশা করিতে লাগিলাম। আমার বয়স তখন বেশী নয়—প্রায় ২০।২১ বৎসর হইয়াছে। তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যুক্ত-রাষ্ট্রে যে নূতন "জাতীয় বিধান" প্রস্তুত করা হইতেছে তাহাতে নিগ্রোজাতি সম্বন্ধে ন্যায্য বিচার করা হয় নাই। নিগ্রোসমস্যা কর্ত্তৃপক্ষেরা যথাযথ বুঝিতে পারেন নাই অথবা পারিয়াও তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন নাই।

সহজে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম। প্রথমতঃ আমরা অশিক্ষিত এই আপত্তি তুলিয়া তাঁহারা সকল কাজকর্ম্মে আমাদিগকে ছাড়িয়া শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিতেন। দ্বিতীয়তঃ উত্তরপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গেরা দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গদিগকে অপমান ও যন্ত্রণা দিবার জন্য তাহাদের উপর 'কাল আদমী' চাপাইতে চেষ্টা করিত। আমি দেখিলাম দুই দিকেই অন্যায়

মি বুঝিলাম এ ব্যবস্থা বেশী দিন টিকিবে না। এই উহার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী।

জোর করিয়া আমাদিগকে দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গমহলে কর্ত্তামি করিতে দিলে আমাদের বর্ত্তমান অহঙ্কার বাড়িতে পারে কিন্তু ভবিষ্যতের পক্ষে আমাদের সমূহ ক্ষতি। কারণ এই লোভে পড়িয়া আমরা আমাদের যথার্থ উন্নতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে পারি আশঙ্কা আছে।

কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ে লাভবান্ হইয়া সম্পত্তির মালিক না হইলে কখনও কি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ভোগ করা যায়? না রাষ্ট্রজীবনে প্রভাব বিস্তার করা যায়? টাকা পয়সা গৃহ-সম্পত্তি ইত্যাদির অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা করাই তখন আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল। অধিকন্তু লেখা পড়া না শিখিলেই বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিব কি করিয়া? রাষ্ট্রজীবনের জন্য দায়িত্ববোধ পুষ্ট করিবার পক্ষে বিদ্যালই প্রধান সহায়। সুতরাং শিক্ষালাভ ও সম্পত্তিলাভ এই দুই দিকে মন না দিয়া আমরা যদি হুজুগে পড়িয়া দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গসমাজে বড় বড় চাকরী করিতে থাকিতাম, তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হইত, আমি ইহা বেশ বুঝিতাম। এই জন্যই উত্তর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগের মেজাজ দেখিয়া আমি একেবারেই খুসী হই নাই। আর আমার মনে বেশ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিগ্রোজাতিকে যে অস্বাভাবিক ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা কোনমতেই টিকিতে পারে না।

তাহার উপর, আমাদের মূর্খতা ও অজ্ঞত[illegible]
যুক্তরাষ্ট্র আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে ব[illegible] [illegible]রিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাই কি চিরকাল টিকিতে পারে? আমি বুঝিয়াছিলাম তাঁহাদের এই 'অছিলা' শীঘ্রই ঘুচিয়া যাইবে। আমরা বেশী দিন অজ্ঞ থাকিব না। আমাদিগকে শিক্ষিত করিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য হইবেন।

আমি ত আমাদের ভবিষ্যতের স্থায়ী মঙ্গলের কথাই ভাবিতাম। কিন্তু নিগ্রোসমাজের সাধারণজনগণ ত অত দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ছিল না। তাহারা শিল্প, শিক্ষা, কৃষি, সম্পত্তি ইত্যাদি ভুলিয়া রাষ্ট্রীয় জীবনের দিকেই বেশী ঝুঁকিল। অতি সামান্য মাত্র বিদ্যা লইয়াই নিগ্রোরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পাণ্ডা হইতে লাগিলেন। কত নিগ্রোই যে এইরূপে প্রাদেশিক দরবারের মন্ত্রণাসভায় ঢুকিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমিও একবার এই হুজুগে পড়িবার মত হইয়াছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া সামলাইয়া লইয়াছি।

রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সমাজে বেশ সাময়িক নাম করা যায়। কিছুকাল হৈচৈ গণ্ডগোল হুজুগ আন্দোলন লাফালাফি ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করা যায়। দলপতি, জননায়ক ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হইয়া গৌরব ও অহঙ্কার করা চলে। কিন্তু দেশের মাটির ভিতর জাতীয় উন্নতির বীজ বপন করিবার জন্য ওরূপ হুজুগে মাতিলে চলে না। স্থিরভাবে, সহিষ্ণুভাবে, দৃঢ়ভাবে লোকচরিত্র ও লোকমত গঠন করা আবশ্যক। জন-

বুদ্ধি মার্জ্জিত করা প্রয়োজন—তাহাদিগকে দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন—তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার সুযোগ দিয়া নানা উপায়ে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন : তাহার উপর স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের ভিত্তি স্বরূপ কৃষিবাণিজ্য ইত্যাদি সমাজের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সকল কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে নীরবে নিঃশব্দে লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কঠিন সাধনায় ব্রতী না হইয়া লোকেরা তরলমতি শিশুর ন্যায় রাষ্ট্র-নৈতিক হুজুগে যোগ দিতেই বেশী ভালবাসে। আমার নিগ্রোসমাজেও প্রথম প্রথম এইরূপ ঘটিয়াছে।

আমার স্বজাতিরা দলে দলে রাষ্ট্র-জীবনে প্রবেশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ অবশ্য বেশ যোগ্যতার সহিতই দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্ম করিতে পারিলেন। মন্ত্রণা সভায়, বিচারালয়ে, শাসনকর্ম্মে নিগ্রোরা অনেকেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গলদই বেশী বাহির হইত। অনেক ত্রুটি, অনেক অসম্পূর্ণতা আমাদের নিগ্রো কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দেখা যাইত। আজকাল সে অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এখন আমরা নিতান্তই অজ্ঞ ও মূর্খের ন্যায় কার্য্য করি না। বিগত ৩০ বৎসরের শিক্ষার ফলে, অভ্যাসের ফলে এবং অভিজ্ঞতার ফলে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ রাষ্ট্রকর্ম্মে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যই অর্জ্জন করিয়াছে একথা বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করি না।

আজ আমি বলিতে পারি যে সাদা ও কাল চামড়ার প্রভেদ

এখন পূর্ব্বের ন্যায় রহিত হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। যোগ্যতানুসারে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের মধ্যে কর্ত্তব্য বিভাগ করা হউক, এবং সম্মান লাভের সুযোগগুলিও বিকিরণ করা হউক। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে সকল কর্ম্মের অধিকার প্রদান করা হউক। নিগ্রোকে আর সকল বিষয়ে চাপিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক রাষ্ট্রেই যথার্থ ন্যায়সঙ্গত আইন প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। যদি শীঘ্র শীঘ্রই নূতন যুক্তিসঙ্গত বিধান প্রস্তুত করা না হয় নিগ্রোদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলা হইবে। আমি বলিতেছি—নিগ্রোরা আর সহ্য করিবে না শ্বেতাঙ্গ সমাজেরও অমঙ্গল হইবে—যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে দাসত্ব প্রথা যেমন আমেরিকার প্রধান পাপ ছিল, আজ অবিচার অন্যায় আইন, সাদাকাল চামড়াভেদে রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিতরণ ইত্যাদিও আমেরিকার রাষ্ট্রজীবনের ঠিক সেইরূপ গর্হিত ও পাপপূর্ণ লক্ষণ। পক্ষপাতশূন্য অনুশাসন প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক এই পাপ দূর করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত আমি ম্যাল্‌ডেনে শিক্ষকতার কর্ম্ম করিলাম। এই দুই বৎসরে আমি আমার দুই ভাইকে এবং আরও কয়েকজন বালক ও বালিকাকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়া লইলাম। ইহারা ইতিমধ্যে হ্যাম্পটনে উচ্চ শিক্ষালাভের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর আমি নিজে কলম্বিয়া প্রদেশের ওয়াশিংটন নগরে আট মাস লেখা পড়া শিখিতে যাই। এই

যেশি... শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না—সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়েই গ্রন্থ পাঠ এখানে বেশী হইত। কিন্তু হ্যাম্পটনে কৃষি, পশু-পালন, শিল্প ইত্যাদির দিকেই বেশী দৃষ্টি থাকিত।

আমি ওয়াশিংটনে থাকিতে থাকিতে এই দুই প্রকার শিক্ষালয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারিলাম। ওয়াশিংটনের ছাত্রদের বেশ দুপয়সা আছে। তাহারা কিছু 'বাবু'—তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ উচ্চ ধরণের—বিলাসের মাত্রাও যথেষ্ট। বোধ হয় ইহারা লেখাপড়া হিসাবেও মন্দ নয়। নিতান্ত গণ্ডমূর্খ আসিয়া ওয়াশিংটনে ঢুকিতে পায় না। কিন্তু হ্যাম্পটনের আব্‌হাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ওখানকার চালচলন ভিন্ন রকমের। দাতারা ছাত্রদের বেতন দান করিতেন—সুতরাং উহা অবৈতনিক বিদ্যালয়। কিন্তু কাপড় চোপড়, কাগজ পত্র, পুস্তক সরঞ্জাম ইত্যাদি এবং খাওয়া পরার খরচ ছাত্রদিগকেই দিতে হইত। এই টাকা ছাত্রেরা খাটিয়া সংগ্রহ করিত। কেহ কেহ বাড়ী হইতেও কিছু আনিত।

ওয়াশিংটনের ছাত্রেরা একেবারেই স্বাবলম্বী নহে—তাহাদের খরচপত্র সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইত। কিন্তু হ্যাম্পটনে স্বাবলম্বন এবং নিজের খরচ নিজে চালানই ছাত্রদিগের বিশেষ লক্ষণ। ওয়াশিংটনের ছেলেরা বাহিরের 'চটকে' বেশ দৃষ্টি রাখিত। জীবনের প্রকৃত ভিত্তি আত্মসম্মান, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ইত্যাদির প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর ছিল না। জীবনের লক্ষ্য, মানবের কর্ত্তব্য, ভবিষ্যতের আদর্শ ইত্যাদি

সম্বন্ধেও তাহারা বেশী কিছু শিখিত বলিয়া মনে হয়। গ্রীক, ল্যাটিন্ ইত্যাদি কত বিষয়ই শিখিত। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। লেখাপড়া শিখিয়া তাহারা যে সমাজে বাস করিবে তাহার উপযুক্ত কাজকর্ম্ম, চালচলন তাহারা আদৌ শিখিত না। বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের ক্ষতিই হইত। কয়েক বৎসর বেশ ভাল বাড়ীতে বাস, ভাল খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করিয়া তাহারা অনেকটা অকর্ম্মণ্য, অসহিষ্ণু হইয়া পড়িত। পল্লীতে আসিয়া বাস করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইত। শারীরিক পরিশ্রমে নারাজ হইত। গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য, চাষবাস, পশুপালন ইত্যাদি তাহারা একেবারেই ভুলিয়া যাইত। আফিসের কেরাণী, পরিবারের ম্যানেজার, হোটেলের বাবুরচি, অথবা খান্সামা, দ্বারবান্ ইত্যাদি হইয়া জীবন কাটাইতে তাহারা ভালবাসিত। কিন্তু মাঠে যাইয়া কষ্ট-স্বীকার পূর্ব্বক জমি চষিতে তাহারা অসমর্থ হইয়া পড়িত।

আমি যে কয় মাস ওয়াশিংটনে ছিলাম তখন ওখানে অনেক নিগ্রো বাস করিত। সকলেই পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়াছে। গ্রামের কষ্ট তাহাদের সহ্য হয় না। সহরের বিলাস ছাড়িয়া তাহারা অন্যত্র বাস করিতে অসমর্থ। কেহ কেহ প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী, কেহ বা যুক্তদরবারের বড় চাকরী পাইবার আশায় কাল কাটাইতেছে। কেহ কেহ মন্ত্রণা সভায় এবং ব্যবস্থাপক সমিতিতে সদস্যগিরিও করিত। ফলতঃ কৃষ্ণাঙ্গ

সমাজের একটা বড় টোলা কলম্বিয়া প্রদেশের এই নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। নিগ্রোদিগের জন্য তখন এখানে কতক-গুলি বিদ্যালয়ও খোলা হইতেছিল। সকল বিষয়ে আমি এই নগরটা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমাদের সমাজের গতি-বিধি ও নৈতিক অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম।

বড় সহরের সুফল কুফল সবই আমার স্বজাতিকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোকের আড্ডা অনেক স্থানেই দেখিতে পাইতাম। বিলাসের স্রোত প্রবল বেগেই বাড়িতেছিল। ৩৫৲ টাকা মাসিক বেতনে কর্ম্ম করিয়া কত নিগ্রো যুবক জুড়ি-গাড়ী চড়িয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইতেন—আমি নিজ চোখে এসব দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতাম। পেটে তাহাদের অন্ন জুটিত না কিন্তু সংসারকে তাহারা দেখাইতে চাহিত যে, তাহারা নিতান্তই গরিব ও নগণ্য নয়। আরও কত নিগ্রোকে দেখিয়াছি যাহারা ২৫০।৩০০৲ মাসিক বেতনে সরকারের চাকরী করিত—অথচ প্রতি মাসেই তাহাকে ধার করিয়া সংসার চালাইতে হইত। অত টাকা পাইয়াও তাহারা স্বপরিবারের খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। আরও অনেক নিগ্রোর সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা কয়েক মাস পূর্ব্বে 'জাতীয়' মহাসমিতি কংগ্রেসে যাইয়া কর্ত্তামী ও দেশ-নায়কতা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাদের অর্থাভাব ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। অধিকন্তু বহুলোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। নিজে খাটিয়া অন্নের ব্যবস্থা করিতে তাহাদের চেষ্টা ছিল না। সরকারের একটা চাকরীর আশায়

বসিয়া থাকিয়া জীবন নিরানন্দময় করিতে থাকিত। তাহাদের বিশ্বাস যুক্তরাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদের খোসামোদ করিলে দুএকটা চাকরী তাহাদের কপালে জুটিবে।

বড় সহরের নিগ্রোসমাজ দেখিয়া আমি সুখী হইতে পারি নাই। তাহারা নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ ভুলিয়া সাময়িক উত্তেজনায় এবং অনর্থক বিলাসভোগে দিন অতিবাহিত করিতেছিল। আমার ইচ্ছা হইত যে, কোন যাদুমন্ত্রে তাহাদের ঐ মোহ কাটাইয়া দিই। আমার সাধ হইত যে, তাহাদিগকে সম্মোহনমন্ত্রে ভুলাইয়া জীবনের যথার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিই। আমি ভাবিতাম যে, আমার ক্ষমতা থাকিলে, আমি তাহাদিগকে সহর ছাড়াইয়া পল্লীগ্রামে বসাইতাম। সেখানে প্রকৃতি-জননীর সুকোমল ক্রোড়ে বাস করিয়া তাহারা জীবনের যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। দেশের মাটিতে তাহারা একবার বসিতে পারিলে প্রকৃত সুখভোগের উপায়গুলি তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিবে। কৃষিক্ষেত্রেই শিল্পির জন্য কাঁচা মাল তৈয়ারী হইয়া থাকে—পল্লীজীবনেই সকল জাতির যথার্থ সভ্যতার প্রধান উপাদান উৎপন্ন হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে কৃষিকর্ম্ম করিয়াই সকল দেশের জনসমাজ সভ্যতার প্রথম স্তরে পদার্পণ করিয়াছে। এই স্তরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে তাহারা শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যা, ধর্ম্ম, ইত্যাদি জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গের পুষ্টিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করা বড় কষ্ট-কল্পনা-সাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার ঐ কার্য্য হইয়া গেলে ভবি-

স্যতের সকল উন্নতিই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। এই কথাগুলি আমি আমার 'সহুরে' নিগ্রোদিগকে বুঝাইতে ইচ্ছা করিতাম। কিন্তু তখন আমার সুযোগ ছিল না। ভবিষ্যতে এই সকল কথা আমি নানা ভাবে নানা স্থানে প্রচার করিয়া আসিয়াছি।

ওয়াশিংটনের নিগ্রোরমণীদিগের অবস্থা কিছু বলিতেছি। অনেকে ধোপার কার্য্য করিয়া অন্ন সংস্থান করিত। পারিবারিক ভাবে এই ব্যবসায়গুলি চলিত। মায়ে ঝিয়ে সকলে মিলিয়া কাপড় চোপড় পরিষ্কার করিত এইরূপে সমস্ত পরিবারই কর্ম্ম করিয়া যৌথভাবে অর্থ উপার্জ্জন করিত। ইহার ফলে মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই দেখিয়া দেখিয়া এবং কাজ করিয়া বস্ত্রধৌতি কর্ম্মে পটুত্ব অর্জ্জন করিত। কিন্তু ক্রমশঃ মেয়েরা স্কুলে ভর্ত্তি হইল। ওখানে ৭।৮ বৎসর কাল লেখা পড়া শিখিত। যখন বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়া যাইত তাহারা ভাল ভাল পোষাক চাহিত। তাহাদের খরচ পত্র বাড়িয়া গেল—অথচ উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা কমিতে থাকিল। কারণ ইতিমধ্যে তাহারা গৃহস্থালী ভুলিয়া গিয়াছে, ধোপার কর্ম্ম করিতেও অপারগ হইয়া পড়িয়াছে। পুঁথিবিদ্যার ফলে তাহাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। মা, মাসীমা যে কাজ করিতে পারিত সে কাজে তাহাদের এখন লজ্জা ও অপমান বোধ হয়। পারিবারিক সুখ আর থাকিল না। মেয়েরা দুশ্চরিত্র হইতে লাগিল। সহুরে বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের রমণীসমাজ ক্রমশঃ অবনত হইতে থাকিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত জাতি

আমি যখন ওয়াশিংটনে পড়িতেছিলাম তখন ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়াপ্রদেশে একটা তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। একটা নূতন স্থানে প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছিল। ঐ জন্য দুই তিনটি স্থানও নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সেই স্থানগুলির অধিবাসীরা নিজ নিজ নগরের জন্য প্রদেশময় আন্দোলন সৃষ্টি করিতে লাগিল। আমার ম্যাল্‌ডেনপল্লীর পাঁচ মাইল দূরেই চার্লষ্টন-নগর অবস্থিত। এই নগরবাসীরাও রাষ্ট্র-কেন্দ্রের মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে নাই। আমি ওয়াশিংটনের ছুটির পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, এমন সময়ে দেখি, আমার নিকট চার্লষ্টনের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা দলবদ্ধভাবে একখানা পত্র লিখিয়াছেন। আমাকে তাঁহারা তাঁহাদের জন্য ভোট-সংগ্রহ-কার্য্যে আহ্বান করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য। আমি তাঁহাদের হইয়া প্রদেশের নানা স্থানে 'ক্যান্‌ভ্যাস' করিয়া বেড়াইতাম ; তিনমাস কাল পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা দিয়া চার্লষ্টনের দিকে জনগণের সহানুভূতি আকৃষ্ট করিলাম। ফলতঃ শেষ পর্য্যন্ত

চার্লষ্টনের অধিবাসিগণই জয়ী হইল। সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত চার্লষ্টন নগরই ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের রাষ্ট্র-কেন্দ্র এবং প্রধান নগর রহিয়াছে।

এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া আমি বেশ একটু নাম করিয়া ফেলিলাম। অনেক স্থান হইতেই আমাকে লোকেরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিল। কত দলপতি ও জন-নায়ক আমাকে তাঁহাদের দলে ঢুকিতে আহ্বান করিলেন। আমি কিন্তু হুজুগে মাতিলাম না—সাময়িক যশোলাভের মোহে পড়িলাম না। বরং সেই প্রলোভন কাটাইয়া উঠিয়া আমার জাতির স্থায়ী উন্নতিবিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়ই চিত্ত সমর্পণ করিলাম। আমি জানিতাম যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে যোগদান করিলে আমি কৃতকার্য্য হইয়া নামজাদা লোকই হইতে পারি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা, প্রবৃত্তি ও উৎসাহ সবই আমার ছিল। কিন্তু উহাতে লাগিয়া গেলে আমার স্বার্থপরতাই প্রমাণিত হইত। আমার নিজ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইত বটে, কিন্তু আমার সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

আমি বুঝিয়াছিলাম সমাজকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে হইলে তিনটি কার্য্য করিতে হইবে। প্রথমতঃ সমাজের সকল স্তরে শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ আমাদের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় পুষ্ট করা আবশ্যক। তৃতীয়তঃ আমেরিকার সমাজে নিগ্রোদিগের জন্য সম্পত্তি, গৃহ, জমিদারী ইত্যাদি সঞ্চিত করা আবশ্যক। এই তিনটির কোনটিই তখন আমাদের কৃষ্ণাঙ্গ-

সমাজে ছিল না বলিলেই চলে। সুতরাং সমাজের এই তিনটি প্রাথমিক অভাব মোচন করাই আমার কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাহা না করিয়া আমি যদি প্রথমেই নিজ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মাতিয়া যাই তাহা হইলে আমাকে স্বার্থপর এবং আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কাজেই আমার নিজের সুযোগ, সুবিধা, ক্ষমতা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য, যশোলাভ ইত্যাদি সকল কথা ভুলিয়া গেলাম। নিগ্রোসমাজকেই আমার জননীস্থানীয় বিবেচনা করিয়া একমাত্র তাহারই সুখবিধানে নিজকে নিযুক্ত করিলাম। আমার জীবনব্যাপিণী সাধনার কেন্দ্রস্থলে নিগ্রোসমাজকে রাখিয়া আমার ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিলাম। এই সমাজ-সেবা-ব্রত হইতে কোনরূপ প্রলোভনই আমাকে টলাইতে পারে নাই।

নিগ্রোজাতির অনেকেই রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিলেন। অনেকেই যুক্ত-দরবারের 'জাতীয়' মহাসমিতি কংগ্রেসের সভ্য-পদপ্রার্থী হইলেন। অনেকেই উকিল হইয়া আইন ব্যবসায় ধরিতে চেষ্টা করিলেন। কেহ কেহ ছোট বড় চাকরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেকেই সঙ্গীত-শিক্ষকতার কর্ম্ম করিতে থাকিলেন। আমি বুঝিলাম নিগ্রোসমাজের উন্নতি এই কংগ্রেস-ওয়ালা, উকিল, কেরাণী বা সঙ্গীত-শিক্ষকগণের দ্বারা সাধিত হইবে না। তাহার জন্য অন্যরূপ তপস্যা আবশ্যক। এমন কি কংগ্রেসের কার্য্য, উকিলী ব্যবসায় এবং সঙ্গীত-শিক্ষকতার কর্ম্মের জন্যও নিগ্রোদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই কঠোর সাধনা

আবশ্যক। সেই তপস্যায় ও সেই সাধনায় ব্রতী না হইয়া কেবল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ অভিলাষ পোষণ করিলে কি হইবে?

আমার স্বজাতিদিগের এই সময়কার হাব ভাব দেখিয়া আমাদের গোলামীযুগের একটা ঘটনা মনে পড়িত। এক নিগ্রো সেতার বাজান শিখিতে চাহিয়াছিল। তাহার একজন যুবক প্রভু সেতার বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার নিকট সে মনোবাঞ্ছা জানাইল। প্রভু বুঝিলেন, নিগ্রোর ইহা সাধ্য নয়। মজা দেখিবার জন্য বলিলেন, "আচ্ছা, জ্যাক্ দাদা, তোমাকে আমি সেতার শিখাইতে রাজী আছি। কিন্তু দাদা, একটা কথা বলি। এজন্য কত করিয়া আমাকে দিবে? আমার দস্তুর এই— প্রথম গৎ শিখাইবার জন্য আমি ৯৲ লইয়া থাকি, দ্বিতীয় শিক্ষার জন্য ৬৲ লইয়া থাকি এবং তৃতীয়টার জন্য আমি মাত্র ৩৲ লই। আর যেদিন তোমাকে ওস্তাদ করিয়া ছাড়িয়া দিব অর্থাৎ শেষ দিন মাত্র ৸১০ লইব। রাজী আছ কি?" নিগ্রোদাদা উত্তর করিল, "ছোট কর্ত্তা, কড়ারটা ত ভালই দেখিতেছি। তোমাকে আমি এইরূপই দিয়া যাইব। কিন্তু কর্ত্তা, আমার একটা অনুরোধ রাখিতে হইবে। তুমি শেষ গৎটাই আমাকে প্রথমে শিখাও না কেন?"

আমি আমাদের স্বজাতিদিগের জন-নায়ক ও বড় বড় কর্ম্ম-চারী ইত্যাদি হইবার আকাঙ্ক্ষাকে এই গোলামের শেষ গৎটাই আগে শিখিবার ইচ্ছার ন্যায় সর্ব্বদা মনে করিয়া আসিয়াছি। এজন্য আমি ওসব 'বড় কাজে' না যাইয়া নীরব শিক্ষাপ্রচার-কর্ম্মেই থাকিয়া গেলাম।

চার্লষ্টনে রাষ্ট্রকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি ম্যাল্‌ডেনে শিক্ষকতা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একখানা হ্যাম্পটনের পত্র পাইলাম। সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ আমাকে হ্যাম্পটনে একটা বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হ্যাম্পটনের পুরাতন গ্রাজুয়েটদের মধ্যে দুএকজন বক্তৃতা করিয়া থাকেন। এবার আমার উপর এই ভার পড়িল। আর্মষ্ট্রঙ্গের পত্র পাইয়া এক সঙ্গে লজ্জিত ও আনন্দিত হইলাম। আমি এই সম্মানলাভের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিতও হইলাম। যাহা হউক, কিছু দিনের মধ্যেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় হইল "বিজয়-লাভের সদুপায়।"

পাঁচ বৎসরের মধ্যে নূতন রেলপথ অনেক খোলা হইয়াছে। হ্যাম্পটনে যাইবার সময়ে এবার সমস্ত রাস্তা রেলপথেই গেলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কি কষ্টে আমি কত পথ হাঁটিয়া কত দিন না খাইয়া সেই একই রাস্তায় হ্যাম্পটনের বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম! আজ আমি সেইখানে সম্মানজনক পদলাভ করিয়া বক্তৃতা দিতে চলিয়াছি। অতীত ও বর্ত্তমান তুলনা করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন লোকের এরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কি না আমার জানা নাই।

হ্যাম্পটনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ আমাকে খুবই আদর আপ্যায়িত করিলেন। আমি অনেক দিন পরে আসিয়াছি, বহুবিষয়ে পরি-

বর্ত্তন ও উন্নতি লক্ষ্য করিলাম। আমাদের সমাজের যে যে বিষয়ে অসম্পূর্ণতা ও অভাব রহিয়াছে, বিদ্যালয়ে ঠিক সেইগুলি পূরণ করিবার জন্যই আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় এবং হ্যাম্পটনের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণ চেষ্টিত ছিলেন।

অনেক স্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষাপ্রচারকেরা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেন না। অবনত ও দরিদ্র লোক-সমাজে শিক্ষাবিস্তার করিতে যাইয়া বহু সৎপ্রয়াসী কর্ম্মিগণ এজন্য সুফল সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। অন্য এক সমাজে যে অনুষ্ঠানে সুফল লাভ হইয়াছে তাহাই অবনত সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে যাইয়া তাঁহারা বিফল হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, এক সমাজের যাহা শুভ, অন্য সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে। শ্বেতকায় সমাজে যাহাকে উন্নত শিক্ষাপ্রণালী বলি তাহাই যে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোসমাজেও সুফল প্রসব করিবে, কে বলিতে পারে? এমন কি, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগে হয়ত একটা অনুষ্ঠানের দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারাই যে এখনও উপকার হইবে, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি? কিন্তু শিক্ষা-প্রচারকেরা দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়াই অনেক ক্ষেত্রে কর্ম্মে অবতীর্ণ হইয়াছেন, দেখিতে পাই। ১০০০ মাইল দূরে কোন দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহাই অন্ধের ন্যায় ইহাঁরা হয়ত কোন সমাজে প্রচার করিতে থাকেন। অথবা ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যে বিদ্যা কার্য্যকরী ছিল এতদিন পরেও তাঁহারা তাহাই চালাইতেছেন। হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা

এরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহারা রহিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেন যে, নিগ্রো-জাতির জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেছেন। আর তাঁহারা মনে রাখিতেন যে, যুক্তরাজ্যের একটি প্রদেশের মধ্যেই তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে আর একটা দোষও অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষকেরা মনে করেন যে, ছাত্রেরা সকলেই একরূপ, সকলকেই একই প্রণালীতে, একই আদর্শে, একই জীবনযাপন প্রথার ভিতর দিয়া মানুষ করা যায়। এজন্য সকলের একটা 'পেটেণ্ট' ছাপ মারিয়া দিবার জন্য শিক্ষকেরা সাধারণতঃ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষ বিচিত্র, ছাত্রগণের স্বভাব বিভিন্ন, এক একজনের এক এক প্রকার মেজাজ, প্রবৃত্তি ও ধারণা। সুতরাং প্রত্যেকের অভাব বুঝিয়া শিক্ষা দিলেই সুফল ফলিতে পারে। সুখের কথা, হ্যাম্পটনে ছাত্রদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা বিষয়ে বেশ লক্ষ্য রাখা হইত এক একজনকে এক এক প্রকার শিল্প, কৃষি ও পুঁথি শিখান হইত। ফলতঃ ছাত্রেরা সজীবভাবে মনের আনন্দে বাড়িয়া উঠিত। যাহার যে বিষয়ে অভাব তাহার ঠিক সেই বিষয়েই শিক্ষা হইত। লেখা পড়া শিখিয়া যে তাহাদের উপকার হইতেছে প্রতিদিন তাহারা ইহা নিজেই বুঝিতে পারিত।

হ্যাম্পটনে আমার বক্তৃতা দেওয়া হইয়া গেল। সকলে খুসী হইলেন। আমি ম্যাল্‌ডেনে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে

শিক্ষকতার জন্য পুনরায় ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয়ের আর একখানা পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে হ্যাম্পটনে একটা শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমি, আমার দুইটি ভাই ও আমার পল্লীর অপর চারিজন, সর্ব্বসমেত ছয় জন ছাত্রকে ম্যাল্‌ডেন হইতে হ্যাম্পটনে পাঠাইয়াছি। তাহাদিগকে আমি ঘরেই এতদূর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলাম যে, তাহারা হ্যাম্পটনে যাইয়া সকল বিষয়েই উচ্চ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইহাদের লেখা-পড়া এবং স্বভাব চরিত্র দেখিয়া আর্মষ্ট্রঙ্গ আমার গুণপনায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, আমার দ্বারা বেশ ভালই শিক্ষকতার কার্য্য চলিতে পারে। এজন্যই তিনি উৎসুক হইয়া আমাকে হ্যাম্পটনে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি যে সকল ছাত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে একজন আজ কাল বোষ্টন-নগরে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। তিনি ঐ নগরে শিক্ষা-পরিষদেরও একজন সদস্য।

এই সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় লোহিত জাতিকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, লোহিতবর্ণ ইণ্ডিয়ান জাতির লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইতে পারিবে। আর্মষ্ট্রঙ্গ কিন্তু পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। তিনি ফেডারেল-দরবারের সাহায্যে প্রায় ১০০ লোহিত শিশু ও যুবক হ্যাম্পটনে লইয়া আসিলেন। তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের মধ্যেই রাখিলেন। আমি তাহাদিগের ভরণপোষণ,

রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির ভার প্রাপ্ত হইলাম। এই কার্য্য আমায় খুব ভালই লাগিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার স্বজাতির জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নূতন এক লোকসম্প্রদায়ের সেবায় নিযুক্ত হইতে তত বেশী উৎসাহী ছিলাম না। কিন্তু আর্মষ্ট্রঙ্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

প্রায় ৭৫ জন লোহিত ইণ্ডিয়ান্ আমার রক্ষণাবেক্ষণে থাকিল। আমি ছাড়া তাহাদিগের নিকট আমাদের স্বজাতীয় আর কেহ ছিল না। কাজেই দায়িত্ব আমার যথেষ্ট। একে ত ইণ্ডিয়ানেরা শ্বেতকায়দিগকেই সম্মান করে না। তাহারা শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য এইরূপই তাহাদের বিশ্বাস। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোরা তাহাদিগের কাছে উল্লেখযোগ্য জাতিই নয়। তাহার উপর আমরা এতকাল গোলামী করিয়াছি। ইণ্ডিয়ানেরা "যায় প্রাণ থাকে মান" ভাবিয়া কোন দিনই গোলাম হয় নাই। এমন কি তাহারাই তাহাদের দেশে অনেক ক্রীতদাস রাখিত। সুতরাং জাতিসমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য আমাকে প্রথম প্রথম বড় বেশী ভাবিতে হইয়াছিল।

অধিকন্তু সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছিল, আর্মষ্ট্রঙ্গের এই চেষ্টা ফলবতী হইবে না। তিনি একটা অসাধ্য সাধন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

যাহা হউক, অল্পকালের মধ্যেই আমি ইণ্ডিয়ান্‌দিগের বন্ধু হইয়া পড়িলাম। আমি তাহাদের, তাহারা আমার, এই ভাব বেশ জমিয়া গেল। আমাদের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ও প্রীতি এবং

ভালবাসার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি দেখিলাম, লোহিত ইণ্ডিয়ানেরাও মানুষ—তাহাদেরও হৃদয় আছে—তাহারাও ভালবাসিতে জানে—তাহারাও সদসৎ বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে পারে। ক্রমেই দেখিলাম, তাহারা আমাকে সুখী করিবার জন্য কত কি করিতে চাহিত।

তাহাদের একটা 'গোঁ' ছিল। তাহারা তাহাদের স্বজাতির চিহ্নস্বরূপ চুলগুলি কাটিতে দিত না। কম্বল মুড়ি দিয়া বেড়াইতেও তাহারা ভাল বাসিত—এ অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। ধূমপানের অভ্যাসও তাহাদের একটা জাতীয় চরিত্রের অন্তর্গত ছিল। তাহাদিগকে কোন মতে ইহা বন্ধ করান যাইত না। কিন্তু দোষ কি? সকল জাতিরই কতকগুলি 'গোঁ' থাকে। শ্বেতাঙ্গ জাতিদেরই কি কতকগুলি খেয়াল নাই? তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতিকেই তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের ভাষা, তাঁহাদের পোষাক, তাঁহাদের খানা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পীড়াপীড়ি করেন। যেন সাদা চামড়াওয়ালা লোকেরা যাহা যাহা করে, অন্যান্য জাতির লোকেরা ঠিক সেইরূপ অনুকরণ না করিলে তাহারা সভ্য হইতে পারে না। সুতরাং লোহিত শিশু ও যুবকদিগের স্বাভাবিক অভ্যাসগুলিতে আমি বিশেষ বিরক্ত হইতাম না।

আমার বিশ্বাস—কৃষ্ণাঙ্গ ও লোহিত ছাত্রদিগের মস্তিষ্কে কোন প্রভেদ নাই। তাহারা বোধ হয় ইংরাজী শিখিতে কিছু বেশী সময় লইত। অন্যান্য সকল বিষয়ে দুইএরই প্রতিভা এক প্রকার। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় অথবা ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি

শিক্ষা কবিবার জন্য নিগ্রো ও ইণ্ডিয়ান দুই জাতিরই একপ্রকার যোগ্যতা ও অযোগ্যতাই ছিল।

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের নিগ্রো ছাত্রেরা নানা উপায়ে ইণ্ডিয়ান-দিগকে সাহায্য করিত। ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্টই হইতাম। নিগ্রোরা অনেক সময়ে লোহিতদিগকে নিজ ঘরে থাকিতে দিত। ইণ্ডিয়ানেরা এইরূপে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নিগ্রোদিগের সহবাসে থাকিয়া ইংরাজী ভাষা সহজে আয়ত্ত করিতে পারিত।

হ্যাম্পটনের কাল ছেলেরা এই লাল ছাত্রদিগকে যেরূপ বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতেছিল, যুক্তরাজ্যের কোন অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ সন্তানেরা অন্য কোন জাতির ১০০ ছাত্রকে সেইরূপ হৃদ্যতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি কতবার শ্বেতাঙ্গ যুবকদিগকে বলিয়াছি, "যতই তোমরা অবনত জাতিকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিবে ততই তোমরা নিজেই উন্নত হইবে। সেই অবনত জাতি যেই পরিমাণে অবনত ছিল তোমাদের উন্নতি ও সভ্যতা ঠিক সেই পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে।"

এই উপলক্ষ্যে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। মাননীয় শ্রীযুক্ত ফ্রেড্রিক্ ডগলাস এক সময়ে পেনসিল ভেনিয়া প্রদেশে রেলে বেড়াইতেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো। রেল কোম্পানীকে তিনি পয়সা সমানই দিয়াছেন—কিন্তু তিনি শ্বেতাঙ্গ-দিগের সঙ্গে এক গাড়ীতে বসিতে পাইলেন না। তাঁহাকে মাল-গাড়ীতে অন্যান্য নিগ্রোর সঙ্গে বসিয়া যাইতে হইল। একজন শ্বেতাঙ্গ বন্ধু সেই মালগাড়ীতে যাইয়া ডাগলাসকে বলিলেন,

"মহাশয়, আমরা আপনার এই অপমান দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি।" ডাগলাস সোজা হইয়া বসিলেন এবং সদর্পে উত্তর করিলেন, "ডাগলাসকে অপমান কে করিতে পারে? আমার আত্মাকে কোন বাহিরের লোক স্পর্শ করিতে পারে কি? আমি বলিতেছি, এই ব্যবহারে আমার বিন্দুমাত্র অসম্মান বা নিন্দা হয় নাই। যাহারা এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে তাহারাই যথার্থ নীচাশয় এবং নিন্দনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের হৃদয়েই কালিমা জমা হইতেছে।"*

আমি রেলপথের আর একটা নিগ্রোসমস্যার ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। একজন নিগ্রোর সমস্ত শরীর অতিশয় সাদা ছিল। তাহাকে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদিগের সঙ্গে তুলনা করিয়া কেহই তাহার জাতি স্থির করিতে পারিত না। সে এক সময়ে কৃষ্ণাঙ্গদিগের গাড়ীতে বসিয়া যাইতেছে। টিকেট-সংগ্রাহক তাহাকে সেইখানে দেখিয়া থম্‌কাইয়া দাঁড়াইল। সে কি নিগ্রো, না ইয়াঙ্কি? তাহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল। যদি সে নিগ্রো হয়, ভালই। কিন্তু যদি সে শ্বেতাঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে নিগ্রো কি না? ইহাতে শ্বেতাঙ্গের অপমান হইবারই সম্ভাবনা। টিকেট-সংগ্রাহক সেই ব্যক্তির আপাদ মস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। তাহার চুল, চোখ, হাত, কান কিছুই বাকী রাখিল না। কোনমতেই বুঝা গেল না যে, ঐ লোক নিগ্রো, কি সত্য সত্যই শ্বেতাঙ্গ। শেষে উপায় না দেখিয়া লোকটা মাথা হেঁট করিয়া তাহার পায়ের

দিকে দেখিতে থাকিল। আমি সেই গাড়ীতে বসিয়াছিলাম এবং রেলের কেরাণীর ঐ পরীক্ষা দেখিয়া মনে মনে ভাবিলাম, "যাহাহউক, এইবার সন্ধান পাওয়া যাইবে।" সত্যই তাহার পা দেখিয়া সে বুঝিল যে, ঐ ব্যক্তি নিগ্রোই বটে এবং তাহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আমি সুখী হইলাম যে, গোলমালে আমার একজন স্বজাতি কমিয়া গেল না!

আমি ভদ্রতা সম্বন্ধে একটা নিয়ম স্থির করিয়াছি। কোন লোক সভ্য ও ভদ্র কিনা তাহা বিচার করিবার জন্য আমি কোন নীচ জাতির লোকের সঙ্গে তাহার আচার ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। পূর্ব্বে গোলামীর যুগে দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাঁহাদের ক্রীতদাসগণের সঙ্গে যেরূপ আচরণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদের মধ্য হইতে ভদ্র ও অভদ্র, সভ্য ও অসভ্য খুঁজিয়া বাছা সহজ ছিল। এখনও পুরাতন মনিবের সন্তানেরা পুরাতন গোলামবংশীয়দিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাই ভদ্রতা বিচারের প্রকৃষ্ট মাপকাঠি।

জর্জ্জ ওয়াশিংটন একদিন রাস্তায় হাঁটিতে ছিলেন, এমন সময়ে একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো তাঁহাকে টুপি তুলিয়া নমস্কার করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ নিগ্রোকে তাঁহার টুপি খুলিয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা এজন্য তাঁহাকে পরে নিন্দা করিতেন। তিনি উত্তর দিতেন,—"তোমরা কি বলিতে চাহ যে, একটা অশিক্ষিত অসভ্য নিগ্রো আমাকে ভদ্রতায় হারাইয়া দিবে?"

আমেরিকায় জাতি-ভেদের দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমি যখন হ্যাম্পটনে লোহিত ছাত্রদিগের অভিভাবকতা করিতে-ছিলাম সেই সময়ে আমার অধীনস্থ একজন ছাত্রের অসুখ হয়। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া "ফেড্‌রাল-দরবারে"র কর্ম্মচারীর নিকট ওয়াশিংটনে যাইতেছিলাম। তিনি ইহাকে যথা স্থানে তাহার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। ওয়াশিংটনে যাইবার পথে খানিকটা একটা ষ্টীমারে যাইতে হয়। উহাতে হোটেল ছিল। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া যাইবার পর আমি সেখানে খাইতে গেলাম। আমার লোহিত ছাত্রও আমার সঙ্গে ছিল। ষ্টীমারের হোটেল-ওয়ালা বলিল, "লোহিত যুবক খানা পাইবে, তুমি পাইবে না।" আমি অবশ্য বিস্মিত হইলাম—কারণ আমাদের দুইজনের রঙ্গে বড় বেশী তফাৎ ছিল না। কিন্তু সে এত ওস্তাদ যে, দেখিবা-মাত্রই কৃষ্ণ লোহিত সহজেই চিনিয়া ফেলিয়াছে!

তাহার পর আর একটা হোটেলেও এইরূপ ঘটিল। আমি হ্যাম্পটন হইতে আসিবার সময় সেই হোটেলে থাকিতে আদিষ্ট হইয়া ছিলাম। কিন্তু তাহারাও আমাকে জায়গা দিল না।

জাতিভেদের আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। একবার একটা সহরে মহাগোলযোগ পড়িয়া যায়। একজন লোককে "লিঞ্চ" বা সজ্ঞানে মারিয়া ফেলিবার যোগাড় হইয়া উঠিল। ব্যাপার কি অনুসন্ধানে জানা গেল যে, কাল চামড়ার একটা লোক স্থানীয় হোটেলে খাইতে গিয়াছে। কিন্তু সে নিগ্রো নয়, সে মরক্কো দেশের একজন অধিবাসী, আমেরিকায় বেড়াইতে আসিয়াছে।

তাহার রং কাল এবং ইংরাজীতে সে কথা বলিতে পারিত। কাজেই লোকেরা তাহাকে নিগ্রো ভাবিয়া লইয়াছিল। যখন রটিয়া গেল যে, সে নিগ্রো নয় আর কোন গোলযোগ থাকিল না। তাহার পর হইতে মরক্কোবাসী ব্যক্তিটি ইংরাজীতে কথা না বলাই শ্রেয়জ্ঞান করিয়াছিল।

লোহিত ছাত্রদের লইয়া হ্যাম্পটনে এক বৎসর কাটাইলাম। এই সময়ে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আর একটা সুযোগ জুটিল। তাহার ফলে আমার টাস্কেজির কর্ম্মে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। আর্মষ্ট্রঙ্গ দেখিলেন, নূতন নূতন নিগ্রো পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে শিক্ষালাভের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিতেছে। কিন্তু তাহাদের বড়ই দুরবস্থা। পয়সা দিয়া স্কুলে থাকা কঠিন, এমন কি, দুই চারি খান কেতাব কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। সেনাপতি মহাশয় ইহাদিগের জন্য একটা নৈশবিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন করিলেন।

ব্যবস্থা হইল যে, তাহারা দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া খাটিবে এবং রাত্রে ২ ঘণ্টা মাত্র স্কুলে পড়িবে। এই কাজের জন্য তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে খোরাক দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া নগদও কিছু তাহাদিগকে দেওয়া যাইবে। এই নগদ টাকাটা সম্প্রতি তাহারা বিদ্যালয়ের ধনভাণ্ডারে জমা রাখিবে। ভবিষ্যতে তাহাদিগকে দিবাভাগের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া যাইবে। তখন ঐ পুঁজি হইতে তাহাদের খোরাক পোষাক চলিতে পারিবে। অবশ্য এইরূপে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল নৈশ-বিদ্যালয়ে না

থাকিলে তাহারা দিবা-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না— এবং দিবা-বিদ্যালয়ের জন্য নিজ নিজ অভাবমোচনোপযোগী টাকাও জমা হইয়া উঠিবে না। অধিকন্তু এই দুই বৎসরব্যাপী জীবনযাপনের ফলে তাহারা কতকগুলি শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম শিখিয়া ফেলিবে। তাহাদের পুঁথিবিদ্যাও কিছু কিছু হইয়া থাকিবে। এদিকে হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়েরও কৃষিবিভাগ এবং শিল্পবিভাগ সবিশেষ পুষ্টিলাভ করিবে। সুতরাং এই নৈশবিদ্যালয়ের দ্বারা অশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

আর্মষ্ট্রঙ্গ মহোদয় তাঁহার এই নব প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের ভার আমায় দিলেন। প্রায় ১২ জন উৎসাহী ও কর্ম্মঠ ছাত্র ও ছাত্রী লইয়া নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করা গেল। দিবাভাগে পুরুষেরা বিদ্যালয়ের করাতখানায় কাজ করিত এবং মেয়েরা ধোপার কর্ম্ম করিত। দুই কাজই অত্যধিক কঠিন ছিল। কিন্তু তাহারা বেশ ভাল করিয়া করিত। এদিকে নৈশবিদ্যালয়ের জন্য পড়া প্রস্তুতও তাহারা মনোযোগের সহিত করিত। লেখাপড়া শেষ করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেলেও তাহারা উহাতে লাগিয়া থাকিত। ঘুমাইতে যাইবার সময় হইয়া যাইবার পরেও তাহারা আমাকে তাহাদিগের পড়া বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিত।

ইহাদিগের দিনের ও রাত্রের কাজ দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। ইহাদের পরিশ্রম স্বীকার এবং বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগের জন্য ইহাদিগকে আমি একটা নূতন নাম দিয়াছিলাম। তাহাদিগকে "কর্ম্মঠ-সমিতির" সদস্য বলিয়া ডাকিতাম। ক্রমে

হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের মধ্যে তাহাদের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল—হ্যাম্পটনের বাহিরেও এই নামের আদর হইতে লাগিল। নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি ছাপান সার্টিফিকেটও দিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে এইরূপ লেখা থাকিত—

"হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের 'কর্ম্মঠ-সমিতি'র'অমুক'...'অত'বৎসর নিয়মিতরূপে কার্য্য করিয়া এই প্রশংসা-পত্রের অধিকারী হইয়াছে।" সমাজে এই প্রশংসা-পত্রগুলির আদর বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাম্পটনের নামও সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া গেল। আজ সেই নৈশবিদ্যালয়ে ৩০০। ৪০০ ছাত্র লেখা পড়া শিখিয়া থাকে। ইহার ছাত্রেরা ইতিমধ্যে দেশের নানা সৎকর্ম্মে উচ্চস্থানও অধিকার করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

টাস্কেজীতে পল্লীপর্য্যবেক্ষণ

এবার হ্যাম্পটনে আমার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এক সঙ্গে চলিয়াছিল। আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে একজন ছাত্র-শিক্ষকভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলাম।

লোহিত 'ইণ্ডিয়ান' ছাত্রদিগের পরিদর্শন আমার হাতে ছিল। নবপ্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষকতাও আমি করিতাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজের উচ্চশিক্ষালাভও চলিতেছিল। আমি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সাহায্যে কতকগুলি নূতন বিষয় শিখিতে লাগিলাম। তাঁহার নাম রেভারেণ্ড ডাক্তার এইচ, বি, ফ্রিমেল। আর্মষ্ট্রঙ্গের মৃত্যুর পর ইনি হ্যাম্পটনের পরিচালক হইয়াছেন।

নৈশবিদ্যালয়ে একবৎসর "কর্ম্মঠ-সমিতি"কে পড়াইলাম। দৈবক্রমে তাহার পর আমার একটা অভাবনীয় সুযোগ আসিল। তাহাতেই আমার জীবন-কর্ম্ম আবদ্ধ হয়—সেই কাজেই আমি এখনও লাগিয়া আছি।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ আমার যখন প্রায় ২২।২৩ বৎসর বয়স সেই সময়কার কথা বলিতেছি। একদিন সন্ধ্যাকালে গির্জ্জার কার্য্য শেষ হইবার পর সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গ আমাকে বলিলেন,

"দেখ, আমি আলাবামা প্রদেশ হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি। কয়েক জন লোক সেখানে একটা শিক্ষক-বিদ্যালয় খুলিতে চাহেন। এই বিদ্যালয়ে নিগ্রোজাতিরই শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। সম্ভবতঃ টাস্কেজী নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে তাঁহাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের একজন পরিচালক আবশ্যক। তাঁহারা আমার নিকট লোক চাহিয়াছেন।"

আলাবামার পত্রলেখকগণ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্য নিগ্রোজাতীয় শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, সেনাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে একজন শ্বেতকায় লোকেরই নাম করিবেন।

পরদিন সকালে সেনাপতি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ঐ কাজ লইতে প্রস্তুত আছি কি না জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, "চেষ্টা করিতে পারি।" তিনি আলাবামায় উত্তর দিলেন, "আমি একজন নিগ্রোকে পছন্দ করিয়াছি, তাঁহার নাম বুকার ওয়াশিংটন। কোন শ্বেতাঙ্গের সন্ধান আমি দিতে পারিলাম না। যদি এই নিগ্রো যুবককে আপনারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন পত্রপাঠ লিখিবেন। ইহাঁকে পাঠাইয়া দিব।"

কয়েক দিন পরে আর্মষ্ট্রঙ্গের নিকট একটা তার আসিল তিনি ছাত্রদের সঙ্গে রবিবারে সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন কার্য্য শেষ হইয়া গেলে তিনি তারের খবর ছাত্রদিগকে দিলেন তাহাতে লেখা ছিল ঃ—"বুকার ওয়াশিংটনের দ্বারা কাজ বে চলিবে। শীঘ্রই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

বিদ্যালয়ের মধ্যে আনন্দ উৎসব হইল। শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিয়া আমাকে বিদায়ভোজ দিলেন। আমি টাস্কেজী যাত্রা করিলাম। পথে কয়েকদিন আমার পল্লী ম্যাল্‌ডেনে কাটাইয়া গেলাম।

আলাবামায় টাস্কেজী একটি ক্ষুদ্র নগর। ইহার লোক সংখ্যা মাত্র ২০০০। তাহার মধ্যে ১০০০ নিগ্রো! দক্ষিণপ্রান্তের "কৃষ্ণ-বিভাগে" এই জনপদ অবস্থিত। আলাবামাপ্রদেশের অনেক-গুলি "কাউণ্টি" বা জেলা। তাহার কয়েকটিতে নিগ্রোসংখ্যা খুব বেশী। কোন জেলায় শতকরা ৬০, কোন জেলায় শতকরা ৭৫ জন, কোন জেলায় এমন কি শত করা ৯০ জন নিগ্রোর বাস। যে জেলায় টাস্কেজী নগর সেই জেলায় শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। এই জন্যই বোধ হয় ঐ অঞ্চলকে কৃষ্ণ-বিভাগ বলা হইত।

শুনিয়াছি ঐ অঞ্চলের মাটি কাল বলিয়া উহার নাম কৃষ্ণ-বিভাগ হইয়াছিল। কাল মাটিই উর্ব্বর। এজন্য চাষাবাদের সুবিধা এই সকল স্থানে বেশী। কাজেই এ অঞ্চলে গোলাম খাটাইলে লাভ হইবার আশা যথেষ্ট। এই সকল কারণে গোলামীর যুগে গোলামখানা, গোলামাবাদ ইত্যাদি এই বিভাগকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। একে কাল মাটি তাহার উপর কাল কের বাস। সুতরাং কৃষ্ণ-বিভাগ নাম শীঘ্রই সমাজে প্রচারিত হইয়া গেল। আমাদের স্বাধীনতালাভের পর হইতে কৃষ্ণ-বিভাগ বলিলে প্রদেশ বিশেষ বুঝায়। আজকাল যেসকল স্থানে নিগ্রোর

সংখ্যা বেশী সেই সকল স্থান কৃষ্ণ-বিভাগের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

টাস্কেজীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম যে, ওখানে বাড়ীঘর, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সকলই বোধ হয় আছে। আমাকে যাইয়াই শিক্ষকতার কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইবে। আমি পৌঁছিয়া দেখি, কিছুই নাই, বাড়ী ঘর আস্‌বাব পত্র ত নাইই, এমন কি বিদ্যালয়ের জন্য কোন স্থানও নির্ব্বাচিত হয় নাই। সবই আমাকে নিজ হাতে করিয়া লইতে হইবে। তবে একথা আমি বলিতে বাধ্য যে, এখানে ইট কাঠ, চূণ শুরকি, খাতাপত্র ইত্যাদি নির্জ্জীব পদার্থ ছিল না সত্য। কিন্তু এই সমুদয় অপেক্ষা সহস্রগুণ মূল্যবান্ এবং প্রয়োজনীয় পদার্থ ছিল। সে ওখানকার নিগ্রো সন্তান-গণের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা, মানুষ হইবার ব্যাকুলতা, জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আন্তরিক পিপাসা। তাহাদের বিদ্যালাভের নিমিত্ত আগ্রহ দেখিয়া আমি বুঝিলাম এবং মনে মনে বলিলাম যে, "ইহাই বিদ্যালয়, এই ক্ষুধা ও পিপাসাই বিদ্যালয়ের প্রাণ। এই ব্যাকু-লতা হইতেই বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রাণ হইতেই শরীর আসিবে। জায়গাজমি, বাড়ীঘর, আল্‌মারী চেয়ার ইত্যাদির অভাব এই আন্তরিকতাই পূরণ করিয়া লইবে। যেখানে আত্মা আছে, সেখানে দেহের অভাব থাকিবে না।"

টাস্কেজী সহরটা নিগ্রো-বিদ্যালয়ের পক্ষে একটি অতি উপযুক্ত স্থান মনে হইল। ইহার চারিদিকেই অনেকগুলি নিগ্রো-পল্লী। স্থানও কিছু নির্জ্জন—বড় রেল রাস্তা হইতে প্রায়

৫।৬ মাইল দূরে। অথচ তাহার সঙ্গে একটা ছোট রেল লাইনের যোগ ছিল। তাহা ছাড়া আর একটা সুবিধাও দেখিলাম। এই পল্লীর শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্যার আদর করিতেন। গোলামীর যুগ হইতে এখন পর্য্যন্ত এখানে শ্বেতাঙ্গেরা একটা বিদ্যালয় চালাইয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং লেখা পড়ার একটা আব্‌হাওয়া এই অঞ্চলে মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের সৃষ্টি করিত। অধিকন্তু নিগ্রোরাও নিতান্ত দুশ্চরিত্র ছিল না। তাহারা লিখিতে পড়িতে পারিত না বটে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদিগের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক বিষয়ে তাহারা উন্নত হইয়া ছিল। দুই জাতির মধ্যে সদ্ভাবও মন্দ বুঝিলাম না। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সহরে একটা ধাতুর কারখানা ছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন নিগ্রো দুই জনে মিলিয়া ইহার যৌথ মালিক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ মালিকের মৃত্যুর পর ইহা সর্ব্বাংশে নিগ্রোর সম্পত্তি হয়।

আমি এক বৎসর পূর্ব্বেকার বৃত্তান্ত অবগত হইলাম। হ্যাম্পটনের সুনাম এ অঞ্চলে বেশ কাজ করিতে ছিল বুঝিতে পারিলাম। টাস্কেজীর নিগ্রো-সমাজ হ্যাম্পটনের আদর্শে এখানে একটি শিক্ষক-বিদ্যালয় খুলিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা আলাবামার প্রাদেশিক রাষ্ট্রের নিকট আবেদন করিয়া বার্ষিক ৬০০০৲ পাইবার আশা পাইয়াছেন। রাষ্ট্রের কর্ত্তারা নিয়ম করিয়াছেন যে, এই টাকা হইতে শিক্ষকগণের বেতনাদি দেওয়া যাইবে মাত্র। জমি, বাড়ী, আস্‌বাব, লাইব্রেরী ইত্যাদির জন্য এই টাকা হইতে কিছুমাত্র খরচ করিতে পারা যাইবে না।

আমাকে পাইয়া নিগ্রোরা যারপরনাই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই নানা উপায়ে আমার কার্য্যে সাহায্য করিতে আসিল।

আমি প্রথমেই স্থান খুঁজিতে বাহির হইলাম। একটা জায়গা পাওয়া গেল। সহরের মধ্যে নিগ্রোদিগের একটা ধর্ম্মমন্দির ছিল, তাহারই পার্শ্বে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখিতে পাইলাম। এই "পোড়ো বাড়ী"-টাতেই বিদ্যালয় খোলা হইল। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি বা বক্তৃতা ও সম্মিলনের জন্য গির্জ্জাঘরটি ব্যবহার করিতাম।

ঘর দুইটাই অতি জীর্ণ অবস্থায় ছিল। বর্ষাকালে ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল চুঁইতে থাকিত। অনেক দিন ছাত্রেরা আমার মাথায় ছাতা ধরিয়া বসিত—আমি ছেলেদের পড়া শুনিতাম। কোন কোন সময়ে আমি যখন খাইতে বসিতাম আমাদের বাড়ীর মালিক আমার মাথায় ছাতা ধরিয়া দাঁড়াইতেন।

আলাবামার নিগ্রোরা এসময়ে রাষ্ট্রনৈতিক হুজুগে খুব মাতিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা, আমিও তাহাদের আন্দোলনে যোগ দিয়া তাহাদের কার্য্যে সাহায্য করি। তাহারা অন্য জাতীয় লোককে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বেশী বিশ্বাস করিত না। এজন্য তাহারা আমাকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিতে বড় পীড়াপীড়ি করিল। এক বৃদ্ধ আসিয়া আমার কাণে প্রায়ই জপিত—"ভায়া, তুমি এবার কাহাকে ভোট দিবে স্থির করিয়াছ? আমার ইচ্ছা আমরা যাঁহাকে দিব মনে করিয়াছি তাঁহাকেই তুমিও দিও। অনুরোধটা রাখিবে কি? আমরা কাগজ পত্র পড়িতে জানি না জানইত।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয় ? আমরা ভোট দিতে শিখিয়াছি। আমাদের ইচ্ছা তুমিও আমাদের মতানুসারেই ভোট দাও।" আর একজন বলিল, "আমরা কেমন করিয়া ভোট দিয়া থাকি জান ? সাদা চামড়া-ওয়ালারা কি করে আগে দেখি। দূরে দূরে থাকিয়া খবর লই, তাহারা কাহাকে ভোট দিল। যখন আমাদের ভোট দিবার পালা আসে আমরা চোখ কাণ বুজিয়া ঠিক তাহাদের উল্টা করি। কি বল, ভায়া, আমরা মন্দ করি কি ?"

এই ছিল বিশ বৎসর আগেকার নিগ্রো-রাষ্ট্রনীতি! আজ আমি আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, এরূপ মনোভাব আমাদের সমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমরা এখন কর্ত্তব্য বুঝিয়াই কাজ করিয়া থাকি। শ্বেতাঙ্গ যাহা করে, কৃষ্ণাঙ্গের ঠিক তাহার বিপরীত করা উচিত—এরূপ ভাবনা আমাদের নিগ্রোমহলে অনেকটা কমিয়াছে।

১৮৮১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আমি টাস্কেজীতে পৌঁছি। প্রথম মাসেই আমি বিদ্যালয়ের জন্য স্থান বাছিয়া লইলাম এবং আলাবামাপ্রদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিলাম। লোক জনের আর্থিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা সবই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিতে যত্ন লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে জেলাগুলির ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইলাম। অভিভাবকগণের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়া ছাত্র সংগ্রহেও নিযুক্ত রহিলাম!

আমি অধিকাংশ সময়টা পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া

কাটাইতাম। একটা গরুর গাড়ীতে অথবা একটা খচ্চরে চড়িয়া আমার এই 'সফর' হইত। দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। তাহাদের সঙ্গেই খাওয়া দাওয়া এবং সুখ দুঃখের গল্প চলিত। তাহাদের বাগান, আবাদ, পাঠশালা, মন্দির ইত্যাদি সবই দেখিতাম। অবশ্য তাহাদিগকে আগে কোন খবর পাঠাইতাম না। হঠাৎ যে গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইতাম তাহার কোন গৃহস্থের ঘরে অতিথি হইয়া পড়িতাম। এ জন্য তাহারা আমাকে আদর অভ্যর্থনা ইত্যাদি করিবার সুযোগ পাইত না। ইহাতে আমার লাভই হইত। কারণ এই উপায়ে তাহাদের স্বাভাবিক "আটপৌরে" চাল-চলন বেশ ভাল রকম বুঝিতে পারিতাম।

এইরূপে আলাবামাপ্রদেশের পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া নিগ্রোসমাজের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থাই আমি জানিতে পারিলাম। আমি শেষে এই অঞ্চলের জেলা, নগর, গ্রাম, রাস্তাঘাট, অলিগলি ইত্যাদি আমার নখদর্পণে দেখিতে পাইতাম।

নিগ্রোসমাজে দারিদ্র্যের প্রকোপ অত্যধিক দেখিলাম। তাহাদের বাড়ীঘর ছিলই না বলিলে অন্যায় হইবে না। একটা ছোট কামরার মধ্যে সমস্ত পরিবার শুইয়া থাকিত। আত্মীয় স্বজন কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব অতিথি সকলেরই সেই কামরায় স্থান হইত। আমাকে এইরূপ সকলের সঙ্গে একই কামরায় এবং এমন কি একই বিছানায় বহু রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। স্নানের সুবিধা প্রায় কোন বাড়ীতেই থাকিত না। এমন কি মুখ হাত ধুইবারও

জায়গা ছিল না। তবে ঘরের বাহিরে উঠানের কোন স্থানে হাত পা ধুইবার জন্য জল রাখা হইত।

রুটি ও শূকরের মাংস প্রধান খাদ্য ছিল। রুটি ও ডাল ছাড়া অনেক পরিবারে আর কোন খাদ্য জুটিত না। নিকটবর্ত্তী কোন সহরের দোকান হইতে পল্লীবাসীরা বেশী দামে মাংস ও রুটি ইত্যাদি কিনিয়া আনিত। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, তাহারা নিজে জমি চষিয়া শাকশব্জী ফলমূলইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া লইতে চেষ্টা করিত না। এমন কি, এ বিষয়ে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না। দুনিয়ায় যাহা কিনিতে পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যে ঘরের সম্মুখবর্ত্তী জমিতে উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এ কথা তাহারা ভাবিতে পারিত না। সহর হইতে মামুলি ডাল, আটা ও মাংস বেশী পয়সায় কিনিয়া আনিতেও তাহারা প্রস্তুত। অথচ অল্প ব্যয়ে সুখে খাইবার পরিবার সুযোগ যে তাহাদের বাড়ীতেই রহিয়াছে তাহা এই সকল পল্লীর অধিবাসীরা জানিতই না! ঘরে তাহারা শস্য যে একেবারে বুনিতই না—তাহা নয়। তাহারা কেবলমাত্র তুলার চাষই করিতে শিখিয়াছিল। এদিকে তাহারা এতই মজিয়াছিল যে, ঘরের দুয়ার পর্য্যন্ত তাহাদের তুলার ক্ষেত আসিয়া পৌঁছিত। তথাপি দুই চারি হাত জমি স্বতন্ত্র করিয়া দৈনিক আহারের জন্য ফসল তৈয়ারী করিতে তাহারা যত্ন লইত না।

দুঃখের কথা আর কি বলিব? এই সকল দরিদ্রের কুটীরে অনেক স্থলে আমি মহামূল্য শেলাইয়ের কলও দেখিয়াছি। প্রায়

২০০৲ দিয়া কল কেনা হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার করিবার যোগ্যতা খুব কম লোকেরই দেখিতে পাইতাম। মাস মাস আংশিকভাবে ৫৲ বা ১০৲ করিয়া তাহারা অতি কষ্টে কলের দাম শোধ করিত কিন্তু কল ঘরের এক কোণে পড়িয়াই থাকিত। আবার সৌখিন ঘড়িও অনেক পরিবারের আস্‌বাবের মধ্যে দেখিতাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি—এই সকল ঘড়ির মূল্য প্রায় ৫০৲! এ দিকে ত এত সভ্যতা, বিলাস ও বাবুগিরির লক্ষণ। কিন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিয়মই তাহারা শিখে নাই। তাহারা খাইতেই জানিত না। আমি এক গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। তাহার ঘরে ঐ সকল হাল ফ্যাশনের আস্‌বাব পত্র কিছু কিছু ছিল। কিন্তু খাইতে বসিয়া দেখি—একটা টেবিলে আমরা পাঁচ জন খাইতেছি অথচ একটি মাত্র চামচ! এবং একটি মাত্র কাঁটা! ঐ একটির দ্বারাই পাঁচ জনের কাজ চালাইতে হইল! অথচ সেই কামরারই এক কোণে একটা প্রকাণ্ড টেবিল হারমনিয়াম শোভা পাইতেছে। তাহার মূল্য ২০০৲। দেখিয়া অবাক্ হইলাম, আর ভাবিলাম, ইহাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নাই! 'অর্গ্যান' বাজাইয়া সভ্য হইতে শিখিয়াছে—অথচ এখনও আহারের নিয়মই জানে না।

অবশ্য বলা বাহুল্য, প্রায়ই দেখিতাম মালিকেরা কেহই অর্গ্যান বাজাইতে জানে না। ঘড়ি দেখিয়া সময় বলিবার বিদ্যা কাহারও নাই। ঘড়ি মেরামত করা ত দূরের কথা, কাঁটা চালাইয়া সময় ঠিক রাখিতেই কেহ জানিত না। ব্যবহারাভাবে উহার চাবি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর শেলাইয়ের কলও যত্নাভাবে এবং লোকা-

ভাবে ধ্বংসের পথে যাইতেছে। অথচ অত দামী জিনিষের মূল্য একবারে দিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া তখনও মাসিক ৫।৭৲ হিসাবে দাম শোধ করা হইতেছে!

এক বাড়ীতে আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে টেবিলে খাইতে বসিলাম। তাহারা যে টেবিলে খাইতে শিখিয়াছে, আমার বিশ্বাস হইল না। অতটা সৌন্দর্য্য জ্ঞান তাহাদের জন্মে নাই। অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলাম যে, আমি একজন ভদ্রলোক তাহাদের গৃহে অতিথি হইয়াছি, কাজেই আমার খাতিরে তাহারা টেবিলে খানা পরিবেষণের আয়োজন করিয়াছে।

সাধারণতঃ তাহাদের ভোজন-ব্যাপার নিতান্তই পশুজনোচিত। ঘুম হইতে উঠিয়া নিগ্রো রমণী উনানে কড়া চাপাইয়া দেয়, তাহাতে মাংস, ডাল, যাহা হউক ভাজা হইতে থাকে। দশমিনিট পরেই উহা নামাইয়া লওয়া হয়। খানা প্রস্তুত হইয়া গেল! বাড়ীর কর্ত্তা কাজে বাহির হইবার সময়ে হাতে একটা রুটি আর কিছু তরকারী লইয়া যায়। পথে খাইতে খাইতে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। স্ত্রী ঘরের এক কোণে বসিয়া হয়ত খাইতে থাকে অথবা উনানের কড়া হইতেও খানিকটা মুখে দিয়া চিবাইতে থাকে। আর ছেলেপিলেরা উঠানে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে রুটি ও মাংস যাহা পায় তাহাই গলাধঃকরণ করে। অবশ্য ছেলেদের কপালে মাংস প্রায়ই জুটিত না। মাংসের দাম খুব বেশী।

সকালবেলার খাওয়া এইরূপে সমাপ্ত হইত। পরমুহূর্ত্তে সকলে সপরিবারে তুলার ক্ষেতে হাজির। ছেলে বুড়া কেহই

বাড়ীতে থাকিত না। সকলকেই, যে যেমন পারে, খাটিতে হইত। খোকা পর্য্যন্ত মাঠে যাইত। তূলার বস্তার পাশে তাহাকে বসাইয়া রাখা হইত। মা কাজ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিয়া আসিত। মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং নৈশভোজন ব্যাপারও সকালবেলার আহারেরই মত ছিল।

তাহাদের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি এইরূপ। শনিবার ও রবিবারের জীবনযাপন-প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। শনিবার নিগ্রোরা সপরিবারে সহরে আসিত। সমস্ত দিনটাই প্রায় সহরে কাটাইত। সহরে যাইত 'বাজার করিতে'! অথচ তাহাদের যা' অবস্থা তাহাতে দশ মিনিটের বেশী বাজার করিবার জন্য কোন মতেই লাগিতে পারে না। আর একজন লোক গেলেই চলিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। সমস্ত পরিবারই বাজারে যাইবে! ৮।১০ ঘণ্টা সহরে থাকিয়া বাড়ীতে ফিরিত। দিনটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। মেয়ে পুরুষ জায়গায় জায়গায় জটলা করিয়া নাকে নস্যি গুঁজিত অথবা ধূমপান করিত। এই গেল শনিবারের পালা।

রবিবার তাহারা একটা বড় সভা করিত। সেই সভায় খোস-গল্প বেশ চলিত।

তাহাদের আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখিতাম। প্রায় জেলারই পল্লীবাসীরা ঋণগ্রস্ত। শস্য যাহা উৎপন্ন হইত সমস্তই পূর্ব্ব হইতে পাওনাদারদিগের নিকট 'বন্ধকি' থাকিত।

পাঠশালা গ্রামে গ্রামে দেখিয়াছি সত্য কিন্তু প্রাদেশিক রাষ্ট্র তাহাদের জন্য বাড়ী ঘর, জায়গা জমির কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

কোন গির্জ্জাঘরে অথবা মামুলি কাঠের কুঠুরীতে স্কুল বসিত। শীতকালে ঘরগুলি গরম রাখিবার কোন বন্দোবস্তই ছিল না। ছেলে ও মাষ্টারেরা বড় কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিত। উঠানের এক স্থানে কাঠের আগুন জ্বালান হইত। আগুন পোহাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্র ও শিক্ষকেরা প্রয়োজন মত বাহিরে আসিত। এদিকে শিক্ষকদের যেমন বিদ্যা তেমন চরিত্র।

পাঁচ মাস করিয়া বৎসরে স্কুল খোলা থাকিত। একটা চৌথা কাল বোর্ড ছাড়া বিদ্যালয়ের আস্‌বাব কিছুই কোথায়ও দেখি নাই। পুস্তকাদি সাজসরঞ্জাম ছিল না। একবার একটা 'পোড়ো' কাঠের কামরায় ঢুকিয়া দেখি—পাঁচজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া একখানা বই পড়িতেছে! প্রথম দুইজন সম্মুখে বসিয়া পুস্তক-খানা ধরিয়া আছে। ইহাদের পশ্চাতে আর দুইজন দাঁড়াইয়া প্রথম দুইজনের ঘাড়ের উপর দিয়া দেখিতেছে। এই চারিজনের পশ্চাতে একটি ছেলে উঁকি মারিয়া, যাহা হয়, পড়া বুঝিতেছে।

বিদ্যালয়ের যেরূপ অবস্থা ধর্ম্মমন্দিরগুলির অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভাল নয়। গির্জ্জাঘরগুলি জীর্ণশীর্ণ। ধর্ম্মপ্রচারকগণও বিদ্যায় এবং চরিত্রে শিক্ষক মহাশয়গণেরই অনুরূপ।

আলাবামা প্রদেশে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি কয়েকটি লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তাহাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় নিগ্রোজাতির চিন্তার ধারা বুঝিতে পারিলাম। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহাতেই আপনারা বুঝিবেন ইহাদের মনের গতি কিরূপ ছিল। একজনকে আমি তাহার বংশ-কথা ও পরিবারের

ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার বয়স ৬০ বৎসর। সে বলিল তাহার জন্ম ভার্জ্জিনিয়ায়। ১৮৪৫ সালে সে বিক্রি হইয়া আলাবামায় আসিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার সঙ্গে কয়জন বিক্রি হইয়া আলাবামা প্রদেশে আসিয়াছিল?" সে বলিল, "আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচজন ছিলাম —আমি, আমার ভাই এবং তিনটি খচ্চর।"

জানোয়ার ও মানুষ যে একই শ্রেণীর অন্তর্গত নয় এই বৃদ্ধ গোলামের চিন্তায় তাহা আসিত না। প্রকৃতপক্ষে গোলামী করিতে করিতে মানুষে আর পশুতে কোন প্রভেদই থাকে না। মনিবেরাও মানুষে এবং পশুতে কোন প্রভেদ রাখেন না। পশুও যেমন তাঁহার সম্পত্তি, গোলামও তাঁহার ঠিক সেইরূপই সম্পত্তি বিশেষ।

অষ্টম অধ্যায়

আস্তাবলে বিদ্যালয়

আলাবামা প্রদেশের পল্লী-সমাজগুলি দেখিয়া আমার কার্য্যের দায়িত্ব বেশ বুঝিতে পারিলাম। আমি কর্ম্মক্ষেত্রে একাকী, অথচ সমাজের সর্ব্বত্রই অভাব, দুঃখ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। এই সমুদয় নিবারণ করা কি একজনের পক্ষে সম্ভবপর ? আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমি অসাধ্য-সাধনে ব্রতী হইয়াছি।

নিগ্রো-পল্লীগুলির মধ্যে একমাস কাল ছিলাম। তাহাতে আমার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক ইঙ্গিত লাভ করিলাম। মোটের উপরে বুঝিয়া লইলাম যে, নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের ইয়াঙ্কি মহলে যে নিয়মে বিদ্যাদান করা হইয়া থাকে, এ অঞ্চলে ঠিক সেই নিয়মে শিক্ষাবিস্তার করিলে সুফল পাওয়া যাইবে না। এখানে একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের পঠনপাঠনের রীতি চালান আবশ্যক। আমি ভাবিলাম যে, বোধ হয় সেনাপতি আর্ম্‌ষ্ট্রঙ্গ হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের জন্য যে নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন টাস্কেজীর বিদ্যালয়ে সেই নিয়ম প্রয়োগ করা চলিতে পারে। কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় পণ্ডিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে নিগ্রোদিগের উপকার করা হইবে না। নিগ্রো বালকের সমগ্রজীবনই তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১৮৮১ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে সেই পোড়ো বাড়ীতে স্কুল খুলিলাম। কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজ খুব উৎসাহের সহিত আমার কার্য্যে সাহায্য করিল। শ্বেতাঙ্গ-সমাজের অনেকেই আমার উপর বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা নিগ্রোমহলে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী। তাঁহাদের বিশ্বাস নিগ্রোরা লেখা পড়া শিখিলে ক্ষেতের জন্য কুলী পাওয়া যাইবে না—গৃহস্থালীর জন্য চাকর জুটিবে না। নিগ্রোরা আর শারীরিক পরিশ্রম করিতে অস্বীকার করিবে—তাহাদের মধ্যে বিলাস ও বাবুগিরি প্রবেশ করিবে। ফলতঃ দেশময় আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

শ্বেতাঙ্গদের এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণও ছিল। এতদিন যে সকল নিগ্রো লেখা পড়া শিখিয়াছে তাহারা সকলেই বাবু! আজ কাল মাথায় লম্বা টুপি, চোখে সোণার চস্‌মা, হাতে গিল্টি করা ছড়ি, পায়ে সৌখীন বুট—ইত্যাদি আমাদের "শিক্ষিত" নিগ্রোর লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আরও শিক্ষার প্রসার হইলে নিগ্রোরা যে ক্রমশঃ কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার হইয়া পড়িবে এরূপ সন্দেহ করা অন্যায় নহে। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ বদলান যায়, এবং আদর্শ বদলাইতে পারিলে শিক্ষিত লোকের মতি গতি, ভাব ভঙ্গী ইত্যাদিও বদলান যায়। যথার্থ শিক্ষাপ্রচার করিতে পারিলে প্রকৃত 'মানুষ'ই গড়িয়া তোলা সম্ভব। এই শ্বেতাঙ্গগণ তাহা বুঝিতেন না। এজন্য তাঁহারা আমার কর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন।

যাহা হউক, টাস্কেজীতে শিক্ষাপ্রচার-কর্ম্মে আমার দুইজন বন্ধু

মিলিয়াছিল। একজন শ্বেতাঙ্গ, আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ। ইহাঁরাই সেনাপতি আর্মষ্ট্রঙ্গকে লোকের জন্য লিখিয়াছিলেন। ইহাঁরা বিগত বিশবৎসর ধরিয়া আমার কার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন।

শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির নাম জর্জ্জ ক্যাম্পবেল। ইনি পূর্ব্বে অনেক ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন। এক্ষণে ইনি একজন বড় সওদাগর। শিক্ষাপরিচালনা সম্বন্ধে ইহাঁর অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির নাম লুইস য়্যাডাম্‌স্। ইনি পূর্ব্বে গোলামী করিয়াছেন, এক্ষণে চামড়ার কাজ ও লোহা পিত্তল দস্তার কাজ করিয়া অন্ন সংস্থান করেন। গোলামীর যুগে ইনি জুতা তৈয়ারী, জুতা মেরামত, ঘোড়ার লাগাম তৈয়ারী, এবং কর্ম্মকার ও সূত্রধরের কার্য্য ইত্যাদি নানাবিধ কারিগরি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি কোনদিন বিদ্যালয়ে যাইয়া লেখা পড়া শিখেন নাই কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া সামান্যরকমের কেতাবী-শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

বুঝিলাম, এই দুই ব্যক্তির জীবনে কর্ম্মেরই প্রাধান্য। ইহাঁরা কতকটা 'আটপীঠে' কর্ম্মঠ ও 'করিতকর্ম্মা' লোক। কাজেই আমার শিক্ষাপ্রণালী ইহাঁরা খুবই পছন্দ করিলেন।

এইসঙ্গে একটা কথা অবান্তরভাবে বলিতে চাহি। য়্যাডাম্‌সের বিচক্ষণতা এবং চিন্তাশীলতা দেখিয়া আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। চিরজীবন শৃঙ্খলার সহিত শিল্পে, কৃষিকার্য্যে অথবা ব্যবসায়ে লাগিয়া থাকিলে বুদ্ধিশক্তি যথেষ্টই মার্জ্জিত হয়। কর্ম্ম করিতে করিতে চিন্তা করিবার ক্ষমতা আপনা আপনি বাড়িতে থাকে। গ্রন্থপাঠ না করিয়াও সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ

করিবার যোগ্যতা জন্মে। আমার নিগ্রো বন্ধু য়্যাডাম্‌স্ এই কথার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি গোলামীর যুগে শিল্পকর্ম্মে জীবন-যাপন করিয়া উচ্চ অঙ্গের চিন্তাশক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গোলামীযুগের শিক্ষা বাস্তবিক পক্ষে এই উপায়ে অনেক লোককে কর্ম্মঠ ও চিন্তাশীল করিয়া তুলিয়াছে। গোলামীর এই সুফল উল্লেখ করা আমি অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। এমন কি, আমি এরূপও বলিতে চাহি যে, আজকাল দক্ষিণ অঞ্চলের লোক-সমাজে কর্ম্মক্ষম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের মধ্যে নিগ্রোদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। নিগ্রোদের এরূপ চিন্তাশীলতার কারণ গোলা মীযুগের কৃষিকর্ম্মে অথবা শিল্পকার্য্যে অভ্যাস।

ত্রিশজন ছাত্র লইয়া পাঠশালা খোলা হইল। আমিই এক-মাত্র শিক্ষক। ছাত্রদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ দুই-ই প্রায় সমান ভাবে ছিল। ইহারা সকলেই টাস্কেজীর সমীপবর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসী। আরও অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হইতে চাহিল। কিন্তু আমরা নিতান্ত শিশু ছাত্র গ্রহণ করিলাম না। পনরবৎসর বয়সের কম কোন ছাত্র আমরা লই নাই। যাহারা পূর্ব্বে কিছু শিক্ষা পাইয়াছে এবং শিক্ষকতার কর্ম্মে নিযুক্ত আছে তাহাদিগকে লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

আমরা যে সকল ছাত্র গ্রহণ করিলাম তাহারা অনেকেই ৪০ বৎসরের হইবে। তাহাদের সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রও আসিয়াছিল। দেখিতাম, অনেক ছাত্র তাহাদের শিক্ষকগণ অপেক্ষা বেশীই জানে। বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে এই শিক্ষক ও

ছাত্রগণের মামুলি ধারণাই ছিল। তাহারা বড় বড় বই পড়িয়াছে —খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। লম্বা চৌড়া নামওয়ালা বিষয়ের নাম করিতে পারিলেই তাহারা খুসী হয়। তাহারা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানের অধিকারী। তাহারা এই সকল 'বড় কথা'র জাহির করিয়া বেড়াইতে অত্যধিক লালায়িত।

বিদেশীয় ভাষা শিখিবার ইচ্ছাটা নিগ্রোসমাজে একটা নেশায় পরিণত হইয়াছিল। আমি আলাবামা প্রদেশে পল্লীপর্য্যবেক্ষণ-কালে দেখিতে পাই যে, একটি যুবক অতি কদর্য্য ঘরে অপরিষ্কার কাপড় চোপড় পরিয়া বসিয়া আছে, অথচ তাহার হাতে একখানা ফরাসী ভাষার ব্যাকরণ-গ্রন্থ।

আমার এই প্রথম ছাত্রদিগের পুঁথিগত বিদ্যার বড়াই দেখিয়া সত্যসত্যই লজ্জিত হইতাম। তাহারা ব্যাকরণের লম্বা লম্বা সূত্র আওড়াইয়া মনে করিত তাহারা কতবড়ই না পণ্ডিত। অথচ ভাষাজ্ঞান তাহাদের কিছুমাত্র হয় নাই। অনেকে গণিতের ফর্ম্মুলাগুলি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে—সুদকষা, ডিস্কাউণ্ট, ষ্টক সব বিষয়েরই সূত্রগুলি তোতাপাখীর মত বলিতে শিখিয়াছে। অথচ ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে চোখে দেখে নাই —এমন কি নামও শুনে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের খাতাপত্র কেমন করিয়া লিখিতে হয় তাহা জানে না। টাকা পয়সার হিসাব রাখিবার নিয়ম কখনই দেখে নাই। বলা বাহুল্য তাহারা সংসারের কাজকর্ম্মের মধ্যে গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে

নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাজেই অঙ্কে তাহাদের মাথা একেবারেই খোলে নাই।

যাহা হউক এজন্য ইহাদিগকে দোষ দিয়া লাভ নাই। তাহারা যে নিয়মে শিখিয়াছে তাহার ফল আর কত ভাল হইতে পারে? তবে তাহাদের আন্তরিকতা, শিখিবার ইচ্ছা, মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায়ই বর্ত্তমান ছিল। এ জন্যই আমি হতাশ হইতাম না।

তাহারা যে বই মুখস্থ করিয়া এবং কতকগুলি সূত্র ও শব্দ আওড়াইতে আওড়াইতে নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তাহাদের সাংসারিক জ্ঞান একেবারেই জন্মে নাই। একজন ছাত্র মানচিত্রের কোন্ স্থানে আফ্রিকার শাহারা মরুভূমি অবস্থিত বিনা ক্লেশেই দেখাইয়া দিল। এমন কি চীন দেশের রাজধানী পর্য্যন্ত সেই মানচিত্রের মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করিল। কিন্তু জমির উত্তর দক্ষিণ ভাল করিয়া নির্দ্দেশ করিতে সে শিখে নাই। টেবিলে খাইতে বসিয়া দেখি কোন্ দিকে বাটি কোন্ দিকে গ্লাস রাখিতে হয় তাহার ইহা জানা নাই! কেতাবী শিক্ষার ফলে সত্যসত্যই তাহারা নিরেট মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে।

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে ৫০ জন ছাত্র হইয়া গেল। সপ্তাহ ছয়েক পরে আমি আমার কর্ম্মে একজন নূতন সহায়ক পাইলাম। শ্রীমতি ওলিভিয়া ডেভিড্সন নামে একজন শিক্ষিতা রমণী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষা ও সেবা-

কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট পটুত্ব ও অভিজ্ঞতা ছিল। নিগ্রো-সমাজের নানা স্থানে তিনি ইতিপূর্ব্বে শিক্ষাবিস্তার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট। জাতিতে তিনি নিগ্রো।

নানা স্থানে বসবাসের ফলে এবং নানা কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া তিনি বিদ্যাদানের অনেক নূতন নূতন প্রণালীর পরিচয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাথায় সর্ব্বদা কর্ম্মের নব নব উপায় আসিত। তাঁহার উদ্ভাবিত কার্য্যপ্রণালীর সাহায্যে আমার টাস্কেজী বিদ্যালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তিনিও আমারই মত পুঁথি বিদ্যার আদর করিতেন না। আমরা দুই জনে দেখিলাম, আমাদের ছাত্রেরা লেখাপড়ায় মন্দ ফল দেখাইতেছে না। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা শরীরপালন ইত্যাদি বিষয়ে তাহারা কোন যত্নই লয় না। তাহাদের গৃহে এ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা নাই। কাজেই বিদ্যালয়েও তাহারা অপরিষ্কার ভাবেই থাকিত। আমরা বুঝিলাম—ইহাদের মধ্যে কেতাবী শিক্ষা বেশী প্রচার করিয়া কোন লাভ নাই। আমরা স্থির করিলাম—প্রথমতঃ ইহাদের শরীর গঠন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দাঁতমাজা, হাত পা ধোয়া, কাপড় পরিষ্কার করা, খাওয়া পরা, ঘর ঝাড়া ইত্যাদি বিষয় ইহাদিগকে প্রথমেই শিখান আবশ্যক। গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ইহাদিগের স্বাস্থ্যজ্ঞান ও সাংসারিক জ্ঞান জন্মিতে পারিবে। তাহার পর এক আধটা অন্নসংস্থানের উপায়ও ইহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কেবল দেখান নহে—হাতে কলমে শিখান আবশ্যক। তাহা হইলে ভবিষ্যতের খাওয়া পরার সংস্থানও হইতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে কম খরচে ও কম সময়ে বেশী কাজ করিবার চেষ্টা, পরিশ্রমের উপকারিতা, সময়নিষ্ঠা, ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণেরও ইহারা অধিকারী হইতে পারিবে।

আমরা দেখিলাম ইহাদের পল্লীতে কৃষিকার্য্যই অন্নসংস্থানের প্রধান উপায়। শতকরা প্রায় ৮৫ জন নিগ্রো চাষাবাদের উপর বাঁচিয়া থাকে। কাজেই আমরা চাষাবাদের উপযোগী করিয়া আমাদের ছাত্রগণের জন্য বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টিত হইলাম। যাহাতে তাহারা সহুরে বাবু না হইয়া পড়ে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলাম। লেখাপড়া শিখিবার পর যেন তাহারা আবার জমি চষিতে পারে এবং পশুপালন করিতে প্রবৃত্ত হয়—এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই আমরা শিক্ষার প্রণালী স্থির করিতে লাগিলাম। তাহারা বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়ও হইতে পারিবে—অথচ কৃষিকর্ম্মেও লজ্জা বোধ করিবে না—এই আদর্শে আমরা টাস্কেজী বিদ্যালয়ের নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

এক কথায়, অর্দ্ধশিক্ষিত কুশিক্ষিত এবং চরিত্রহীন বাবু-সমাজের পরিবর্ত্তে আমরা সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ চাষী ও শিল্পীর পরিবার গঠন করিবার জন্য সকল উদ্যোগ করিতে প্রয়াসী হইলাম। আমরা স্থির করিলাম গ্রন্থপাঠকে অতি নিম্ন স্থানে রাখিব। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সংসারের কাজকর্ম্মের

সাহায্যেই নিগ্রোপুরুষ ও রমণীগণকে গড়িয়া তুলিব। এই নূতন শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু কার্য্য উদ্ধার করা যায় কি করিয়া ? আমাদের স্থানাভাব ত যথেষ্ট। কয়েকজন নিগ্রো অনুগ্রহ করিয়া বিনা-পয়সায় সেই পোড়ো বাড়ীটা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন এই যা রক্ষা। ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল। ইহারাই ত আমাদের 'নূতন আদর্শ পল্লীতে লইয়া যাইয়া ভবিষ্যতের পল্লীসেবক, পল্লী-শিক্ষক, ও পল্লী-সংস্কারক হইবে। এই ছাত্রগণই ত আমাদের যন্ত্র স্বরূপ থাকিয়া সমাজে সকল প্রকার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও বীজ বপন করিবে। কিন্তু ইহা-দিগকে এখন স্থান দিই কোথায় ?

তিন মাস আমাদের বিদ্যালয়ের কার্য্য চলিল। প্রতিদিনই সকল দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। আলাবামার ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে কত ছাত্র আসিতে চাহিল। বুঝিতাম আমাদের নামও প্রদেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই সময়ে একটা জমির সন্ধান পাওয়া গেল। টাস্কেজীর প্রায় দেড়মাইল দূরে একটা পুরাতন গোলামাবাদ বিক্রী হইবে জানিতে পারিলাম। মূল্য ১৫০০৲। জমির মালিক আমাদের নিকট দুই কিস্তীতে টাকা লইবেন। একে জমিটা সস্তা তাহার উপর এই অনুগ্রহ। কিন্তু হাতে যে আমাদের এক পয়সাও নাই—৭৫০৲ প্রথমেই দিব কিরূপে ? বিপদ বুঝিয়া হ্যাম্পটনের

ধনরক্ষক মার্শ্যালের নিকট ধার চাহিলাম। তিনি লিখিলেন "হ্যাম্পটন বিদ্যালয়ের তহবিল হইতে টাকা ধার দিবার নিয়ম নাই। তবে আমি নিজের ৭৫০৲ পাঠাইলাম।"

৭৫০৲ পাইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি এক সঙ্গে ২৫০।৩০০৲ টাকাও দেখি নাই। জমিটা কেনা হইয়া গেল। একবৎসরের মধ্যে বাকি ৭৫০৲ দিব স্বীকার করিলাম।

নূতন স্থানে স্কুল উঠাইয়া লওয়া হইল। জমিতে সর্ব্বসমেত চারিটা পুরাতন ঘর ছিল। গোলামীর যুগে যখন বড় সাহেব এই কুঠিতে থাকিতেন তখন ইঁহাদের একটা ঘরে রান্না হইত ও একটা খাবার ঘর ছিল। আর দুইটা ঘরে ঘোড়া ও মুরগী থাকিত। কয়েক দিনের মধ্যে কুঠরীগুলি মেরামত ও পরিষ্কার করিয়া লইলাম। আস্তাবল ও মুরগীশালায় পাঠশালা বসিতে লাগিল।

আস্তাবলেই প্রথমে কাজ চলিতেছিল। পরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া যায়। এজন্য মুরগীখানায়ও ছাত্রদের জন্য 'ক্লাশ' খুলিতে হইয়াছিল। একদিন সকালে একজন নিগ্রোকে বলিলাম, "মুরগীশালাটা পরিষ্কার করা আবশ্যক। আমাদের ছেলে বাড়িয়াছে। ঐ ঘরটায় নূতন ক্লাশ বসিবে।" সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "কি বলেন মহাশয়, আপনি দিবাভাগে লোক জনের সম্মুখে ঐ ঘর পরিষ্কার করিবেন? লোকে নিন্দা করিবে যে?" চক্ষুলজ্জা এবং লোকনিন্দার ভয় নিগ্রোসমাজে এতদূর পৌঁছিয়াছিল।

এই নূতন স্থানে নূতন গৃহে স্কুল বসান কাজটার মধ্যে কতকটা বিষয় লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। আমরা একজনও বাহিরের কুলী এজন্য নিযুক্ত করি নাই। আমরা নিজেই স্বহস্তে সূত্রধরের কর্ম্ম, কর্ম্মকারের কার্য্য, ঝাড়ুদারের কাজ, ইত্যাদি করিয়াছিলাম। বিকালে স্কুলের ছুটির পর ছাত্রেরা এই সকল কার্য্যে সাহায্য করিত। মেরামত করা, পরিষ্কার করা, ধোয়া, ঝাড়া, যথাস্থানে সাজান—সকলই আমরা সমবেত হইয়া সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

যখন এই আস্তাবলে ও মুরগীশালায় স্কুল বেশ নিয়মিতরূপে চলিতে লাগিল তখন আমাদের জমির সম্মুখের খানিকটা অংশ পরিষ্কার করিয়া লইলাম। ইহাতে শাকশব্জী, ফুল ফল ইত্যাদি বুনিবার জন্য ইচ্ছা ছিল। ছাত্রেরা এ কাজ করিতে প্রথম প্রথম বেশী রাজি হইত না। তাহারা মাটি কোদ্‌লাইতে অপমান ও লজ্জা বোধ করিত। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া কোদাল ধরিতে হইবে—স্বপ্নেও তাহারা পূর্ব্বে ভাবে নাই। লেখা পড়া শিখিবার সঙ্গে মাটি কাটার সম্বন্ধই বা কি—তাহারা বুঝিত না। তাহারা মনে করিত তাহাদিগকে মজুরের কাজ করাইয়া লইয়া স্কুলের পয়সা বাঁচান হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই অন্যান্য পাঠশালার গুরুমহাশয়গিরি করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা এরূপ নিন্দাকর ও অপমানজনক কাজে একেবারেই নারাজ। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল—সময় বৃথা নষ্ট করা হইতেছে মাত্র।

কিন্তু আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা আমি লোক লাগাইয়া জমি পরিষ্কার করিব না। আমার সুচিন্তিত শিক্ষাপ্রণালী কোন মতেই অর্জ্জন করিব না। শারীরিক পরিশ্রম করা আমার মতে উচ্চ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। যাহারা হাতে পায়ে খাটিয়া কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহারা আমার বিবেচনায় অশিক্ষিত, এমন কি কুশিক্ষিত। আমি সকল ছাত্রকেই এই নূতন শিক্ষার আদর্শ বুঝাইতে লাগিলাম। কথায় বেশী উপকার হইল না। আমি নিজে একাকী মাটি কাটিতে আরম্ভ করিলাম। জমি অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। তাহাদের সাহায্য না লইয়াই বিদ্যালয়ের চারি পাশ যথেষ্ট সুন্দর করিয়া ফেলিলাম। ছাত্রেরা দেখিল আমার অপ-মান কিছুই হইতেছে না। ক্রমশঃ তাহারাও আমার কাজে সাহায্য করিতে আসিল। এইরূপে ৬০ বিঘা জমি সকলে মিলিয়া চষিয়া ফেলিলাম।

এদিকে শ্রীমতী ডেভিড্‌সন জমির দাম শোধ করিবার জন্য নানা কৌশলে টাকা তুলিতে থাকিলেন। তিনি আমাদের বিদ্যা-লয়ে কএকটা প্রদর্শনী বা মেলা খুলিলেন। এজন্য কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ দুই মহলেই তিনি সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেন। মেলার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। টাস্কেজীর লোকেরা কেহ কিছু আলু, কেহ কয়েকটা রুটি কেহ কোন ফল ইত্যাদি দান করিলেন। এইগুলি বেচিয়া পয়সা আসিল। এইরূপ গোটা-কয়েক মেলার ফলে টাকা মন্দ জমা হইল না।

তাহার পর নগদ টাকার জন্য চাঁদার খাতা খোলা গেল।

কোন নিগ্রো দশ পয়সা, কেহ বা চৌদ্দ পয়সা দান করিতে লাগিল। কেহ একটা রুমাল, কেহ বা খানিকটা চিনি, কেহ বা একখানা সতরঞ্চি দান করিল। একদিন এক বুড়ি ছেঁড়া কিন্তু পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের স্কুলে হাজির হইল। সে বলিতে লাগিল, "মহাশয় আপনি ও ডেভিড্‌সন যে কাজ করিতেছেন তাহার জন্য ভগবান্ আপনা-দিগকে সাহায্য করুন। নিগ্রোজাতিকে তুলিবার জন্য আপনারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আপনাদের ধন্য! আর আমিও ধন্য যে এতকাল গোলামী করিবার পর আপনাদের ন্যায় নিঃস্বার্থ সমাজসেবকদিগকে দেখিয়া মরিতে পারিলাম। আপনাদের ন্যায় কর্ম্মবীর যখন তন্ময় হইয়া সমাজ-সেবায় লাগিয়াছেন, তখন নিগ্রোজাতি অতি সত্বরই জগতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। আজ আমার জীবনের অন্তিম দশায় সেই আশার আলোক দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তাহার পর সে আবার বলিল, "দেখুন, আমি নিতান্ত দরিদ্র। কাঁচা পয়সা আমি চোখে দেখিতে পাই না। আপনারা পাঠশালার জন্য চাঁদা চাহিয়াছেন। আমি আপনা-দিগকে আমার ক্ষুদ্র জীবনের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই ছয়টি ডিম দান করিতেছি। আশা করি, এইগুলি বেচিয়া আপনারা কাজ চালাইতে পারিবেন।"

এইরূপ মুষ্টিভিক্ষার ফলে আলু, চিনি, কম্বল, জামা, ডিম, ইত্যাদি পাইতাম। পরে, সেইগুলি বাজারে বেচিয়া টাস্কেজীর

ধনভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই উপায়ে সরি কুড়াইয়া বেল তৈয়ারী করিতে প্রয়াসী হইলাম। বৃহৎ ব্যাপারে খুদ কণার সাহায্য কম কার্য্য করে না!

নবম অধ্যায়

অর্থচিন্তা ও বিনিদ্র যামিনী

টাস্কেজীবিদ্যালয়ের কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথম বৎসরের উৎসবে আমি নিগ্রোসমাজকে আরও ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইলাম। আমাদের বাড়ীতে বড়দিনের সময়ে রোজ প্রায় ১০০।১৫০ ছেলে মেয়ে আসিত। তাহারা আমাদের নিকট টাকা পয়সা বক্‌শিষ উপহার ইত্যাদি পার্ব্বণী চাহিত। রাত্রি দুইটা হইতে সকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগের ভিড় কমিত না। আজও দক্ষিণ অঞ্চলে বড়দিনের আগমনী উপলক্ষ্যে শিশুরা এইরূপ করিয়া থাকে।

গোলামীর যুগে বড়দিনের উৎসবের জন্য নিগ্রোরা সপ্তাহকাল ছুটি পাইত। সেই সময়ে পুরুষেরা মদ খাইয়া পড়িয়া থাকিত। টাস্কেজীতেও দেখিলাম, বড়দিনের একদিন পূর্ব্ব হইতেই নিগ্রোরা কাজ ছাড়িয়াছে। নববর্ষ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কাজে আর ফিরিল না। যাহারা বৎসরে অন্য কোন দিন মদ খাইত না তাহারাও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এ কয়দিন বেশ মাতলামী করিল। পল্লীময় উৎসব, আনন্দ, নৃত্যগান;—কোথায়ও সংযম বা শ্লীলতা কিছুই দেখিলাম না। কেহ কেহ

বন্দুক পিস্তল লইয়া শিকারেও বাহির হইল। হায়, ভগবানের জন্মতিথি কি এইরূপ উদ্দামতা উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নির্দ্দয়তার অভিনয়ে উপলক্ষ্যমাত্রে পরিণত হইয়াছে !

সহর ছাড়িয়া জেলার ভিতরকার পল্লীগ্রামের মধ্যে 'বড়দিন' দেখিতে গেলাম। এই দরিদ্র সমাজ যীশুর শুভাগমনে কিরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে জানিতে ইচ্ছা হইল। কোন কামরায় যাইয়া দেখি কতকগুলি ভুঁই পট্‌কা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা সেইগুলি মাটিতে আছড়াইয় আওয়াজ করিতেছে। কোন কামরায় গোটা কয়েক কল ঝোলান আছে। সেইগুলি আট দশ জনে মিলিয়া খাইতে বসিবে। কাহারও ঘরে কয়েকটা আখ দেখিতে পাইলাম আর এক গৃহস্থ সস্তায় এক বোতল মদ কিনিয়া আনিয়াছে স্বামী ও স্ত্রী দুই জনে এক সঙ্গে বসিয়া উহা পান করিতেছে অথচ সেই ব্যক্তি ঐ পল্লীর একজন ধর্ম্মগুরু ! কোন কোন গৃহে ছেলেরা নানারংএর ছাপান "কার্ড" লইয়া খেলা করিতেছে সেই কার্ডগুলি বিশেষ কিছু মূল্যবান্ জিনিষ নয়। বড় বড় সহরের ব্যবসাদারেরা নিজেদের মাল প্রচার করিবার জন্য ঐরূপ কার্ড ছাপাইয়া নানা স্থানে বিলি করিয়া থাকে। কেহ বা একটা নূতন পিস্তল কিনিয়া পাড়ার মধ্যে তাহা জাহির করাইয়া বেড়াইতেছে।

মোটের উপরে, বুঝিলাম, ইহারা সকলেই কাজ বন্ধ করিয়াছে। যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি এবং আর্থিক অবস্থা সে সেইরূপ

পান-ভোজন ও আনন্দ উৎসবের উদ্যোগ করিতেছে। রাত্রিকালে সকলে মিলিয়া একটা বাড়ীতে নাচ গান করিবে। সেখানে মদ খাওয়ারও সবিশেষ আয়োজন আছে। শুনিয়াছি এই উদ্দাম-নৃত্যগীতের আসরে অনেক সময়ে মারপিট এবং রক্তারক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

বড়দিনের সফর করিতে করিতে এক বৃদ্ধ স্বজাতির সঙ্গে দেখা হইল। সে বলিল, "বুঝিলেন, ইডন উদ্যানে আদমের জীবন লক্ষ্য করিলেই জানা যায় যে, ভগবান্ কাজ কর্ম্ম ভালবাসেন না। এইজন্য আজকাল বড়দিনের সময় সর্ব্বত্রই দিবসব্যাপী উৎসব। কোথায়ও কাজ কর্ম্ম কিছুই দেখিতে পাইবেন না। বাঁচিয়াছি, এ কয়দিন খাটিতে হইতেছে না, হাড় জুড়াইল।" সে আরও বলিল "এক বৎসর কি পাপেই না জীবন কাটিয়াছে—কেন না এক-দিনও যথার্থ বিশ্রাম পাই নাই। আজ আমার কি পুণ্যের দিন—কিছুই কাজ করিবার ভাবনা নাই।"

নিগ্রোসমাজের ধর্ম্মমত এবং লোকচরিত্র দেখিয়া শুনিয়া আমার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলাম। আমার স্কুলে ছাত্রদিগকে বড়দিনের সার্থকতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। আমাদের চেষ্টায় পল্লীতে পল্লীতে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছে। আজ ১৫।২০ বৎসর কার্য্যের ফলে দেখিতে পাইতেছি যে, নিগ্রোরা বড়দিনের উৎসবে যথেষ্ট সংযম, শৃঙ্খলা, চরিত্রবত্তা এবং ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া চলে।

টাস্কেজীবিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আজকাল বড়দিনের সময়ে বিশেষভাবে সমাজ-সেবা লোক-হিত এবং পরোপকারের কর্ম্মে

লাগিয়া যায়, দুঃখী ও দরিদ্র লোকদিগকে সুখ দিতে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে। সেদিন তাহারা একজন দরিদ্র বৃদ্ধা নিগ্রোরমণীর কামরা নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে। একজন লোক শীতে জামা অভাবে কষ্ট পাইতেছিল। একথা আমি আমার ছাত্রদিগকে জানাইবামাত্র তাহাদের নিকট দুইটা জামা পাইলাম।

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, টাস্কেজীর শ্বেতাঙ্গেরাও আমাদের অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করিতেন। আমাদের মুষ্টি ভিক্ষা তাঁহাদের নিকটও আদায় হইত। নগদ টাকাও মাঝে মাঝে তাঁহারা দিতেন। তাহা ছাড়া কুমারী ডেভিড্‌সন যখনই তাঁহাদের নিকট ভিক্ষার ঝুলি লইয়া হাজির হইতেন তখনই কিছু না কিছু পাইতেন।

আমি প্রথম হইতেই বিদ্যালয়টিকে সমগ্র পল্লীর জীবন-কেন্দ্র-রূপে গড়িয়া তুলিতেছিলাম। পল্লীর সকল কাজ কর্ম্মেই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ রাখিতাম। গ্রামের লোকেরা সহজেই বুঝিতে পারিত যে, বিদ্যালয়ের সাহায্যে তাহাদের নানা বিষয়ে উপকার হইতেছে। তাহা ছাড়া উহা সকলেরই সম্পত্তি—টাস্কেজীর সাদা কাল সকলেই উহার মালিক ও কর্ত্তা। সাধারণ জনগণের সৎপ্রবৃত্তিতেই উহার ভিত্তি। কেহই যেন না বুঝিতে পারে যে, কয়েকজন বাহিরের লোক আসিয়া গ্রামের উপর একটা বোঝা চাপাইয়াছে। এই ভাব মনে রাখিয়া আমি বিদ্যালয় চালাইতাম। গ্রামের লোকের উৎসাহ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ববোধ আমি সর্ব্বদাই নানা উপায়ে জাগাইয়া রাখিতাম। জমির মূল্য দিবার জন্য সকলের নিকটই চাঁদার খাতা

লইয়া যাইতাম। ইহাতেও তাহারা বিদ্যালয়কে নিজের জিনিষ বলিয়া আদর করিতে অভ্যস্ত হইত। জমির দাম শোধ করিবার জন্য তাহাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ইহা জানিবামাত্র তাহারা বিদ্যালয়েরজন্য নূতনভাবে আত্মীয়তার সম্বন্ধ পোষণ করিতে লাগিল। সাদা কাল চামড়ার ভেদ ভুলিয়া যাইয়া সকলেই বিদ্যালয়কে সমস্ত টাস্কেজীর যৌথ প্রতিষ্ঠানরূপে ভাবিতে থাকিল।

শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে আজ টাস্কেজীর অনেক বন্ধু রহিয়াছেন। আমি প্রথম হইতেই ইহাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। দক্ষিণ প্রান্তের নিগ্রোগণকেও আমি এই বন্ধুত্বের সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতে চিরকাল উপদেশ দিয়াছি।

আমরা টাকা তুলিতে লাগিলাম। মেলা, প্রদর্শনী, মুষ্টিভিক্ষা, চাঁদা ইত্যাদি নানা উপায়ে আমরা তিন মাসের মধ্যেই মার্শ্যালের ৭৫০৲ দেনা শোধ করিলাম। তার পর দুই মাসের ভিতর অবশিষ্ট ৭৫০৲ জোগাড় করিয়া জমির মালিককে দিয়া ফেলিলাম। জমিটা সম্পূর্ণরূপেই আমাদের সম্পত্তি হইয়া গেল। সুখের কথা এই সমস্ত টাকাই টাস্কেজী নগরের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের নিকট হইতেই উঠিয়াছিল।

এখন আমরা জমি চষিবার সুব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, এই চাষবাস করিলে বিদ্যালয়ের জন্য কিছু লাভ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা ক্ষেতে কাজ করিয়া কৃষিকর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। তৃতীয়তঃ, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক খাওয়ার সুখও বেশ হইবে।

আমরা সব কাজই এক সঙ্গে আরম্ভ করিতাম না। ভাল কাজ হইলেও তাহা যখন তখন আমাদের কর্ম্মকেন্দ্রে প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টিত হইতাম না। আমাদের যখন যেরূপ অভাব হইত তখন ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থাই করিতাম। আমাদের সর্ব্বপ্রথম অভাব হইয়াছিল—বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের জন্য ভাল শাক শব্জীর। এইজন্য সর্ব্বপ্রথমেই আমরা চাষে লাগিয়া গেলাম।

ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, আমাদের ছাত্রেরা এতই দরিদ্র যে বৎসরে তিন মাসের বেশী পয়সা খরচ করিয়া স্কুলে থাকিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। তাহাদের অন্যান্য মাসের খরচ চালাইবার জন্য আমাদের নূতন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইল। এজন্যও চাষের ব্যবস্থা ভাল করিয়াই করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধরের কার্য্য, কর্ম্মকারের কার্য্য ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প-কর্ম্ম খুলিবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

আমাদের টাস্কেজীতে একটা কাণা ঘোড়া লইয়া পশু পালন আরম্ভ হয়। ঘোড়াটা একজন শ্বেতাঙ্গ আমাদিগকে দান করিয়া ছিলেন। আজকাল আমাদের বিদ্যালয়ের পশুশালায় ২০০ ঘোড়া, খচ্চর, গরু, বাছুর, বলদ ইত্যাদি, ৭০০ শূকর এবং কতক-গুলি মেষ ও ছাগল রহিয়াছে।

ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়াই চলিল। পুরাতন বাড়ীতে আর কোন মতেই কাজ চলে না। তখন একটা নূতন গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিলাম। প্রায় ২০,০০০৲ টাকার আনুমানিক ব্যয়ে এই গৃহ নির্ম্মিত হইবে হিসাব করিয়া দেখিলাম। এত টাকা আমাদের

চিন্তার অতীত বোধ হইল। কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি তখন হয় আমাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেই হইবে, না হয় পুরাতন অবস্থায়ই পচিতে হইবে। বিশেষতঃ আমরা ছাত্রদিগকে এক সঙ্গে এক জায়গায় রাখিয়া আমাদের আদর্শ অনুসারে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম। সে উদ্দেশ্যে অতি সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করা আবশ্যক। এজন্য বিলম্বের আর সময় ছিল না। কাজেই এত ব্যয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীর ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ সংবাদ রটিয়া গেল যে, এক বৃহৎ ব্যাপার টাস্কেজীর কর্ত্তারা আরম্ভ করিয়াছেন। এক দিন সকালে দক্ষিণ প্রান্তের একজন শ্বেতকায় কাঠের সওদাগর আসিয়া আমায় বলিলেন, "শুনিতেছি, আপনারা নূতন বিদ্যালয় গৃহের প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে সমস্ত কাঠ জোগাইতে প্রস্তুত আছি। এক্ষণেই মূল্য দিতে হইবে না। আপনাদের যখন সুবিধা হয় তখন দিবেন।" আমি বলিলাম "আমাদের হাতে কিন্তু সম্প্রতি এক কড়িও নাই।" তিনি বলিলেন "তাহা আমি জানি। তথাপি আমি আপনাদের জমিতে কাঠ পৌঁছাইয়া দিব।" আমি বলিলাম "মহাশয়, কিছু অপেক্ষা করুন। আগে আমাদের হাতে কিছু টাকা জমা হউক। তাহার পর আপনাকে জানাইব।"

এই ঘটনায় আমি অতিশয় আশান্বিত হইলাম। ভাবিলাম— সৎকার্য্যে অর্থাভাব হয় না।

কুমারী ডেভিড্‌সন আবার নানা কৌশলে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ

সমাজ হইতে টাকা তুলিতে চেষ্টিত হইলেন। নিগ্রোরা এই গৃহের কথা শুনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইয়াছিল। আমরা একদিন টাকা তুলিবার জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলাম। সভার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ় নিগ্রো দাঁড়াইয়া উঠিল। সে প্রায় ১২ মাইল দূর হইতে আসিয়াছে—সঙ্গে একটা বড় শূকর বহিয়া আনিয়াছে। সে বলিতে লাগিল, "ভাই সকল আমার টাকা পয়সা নাই। আমার সম্পত্তির মধ্যে দুইটা বড় শূকর আছে। তাহাদের একটি আমি এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ-তহবিলে দান করিবার জন্য আনিয়াছি। আমি আপনাদিগকে করুণভাবে নিবেদন করিতেছি যে, যদি স্বজাতির জন্য আপনাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, অথবা আপনাদের চিত্তে যদি বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান ও আত্ম-গৌরব বোধ থাকে, তাহা হইলে আপনারা সকলেই একটি করিয়া শূকর এই বিদ্যালয়ের জন্য দান করুন। আমার বিশ্বাস আপনারা আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না।" আর কয়েক জন নিগ্রো এই সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি আমার স্বজাতির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে এই বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে আমি দুই সপ্তাহ শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিব!"

দক্ষিণ অঞ্চল হইতেই ২০,০০০ টাকা উঠা অসম্ভব। কুমারী ডেভিড্‌সন উত্তর প্রান্তের ইয়াঙ্কি মহলে চাঁদা আদায় করিতে বাহির হইলেন। সেখানে নানা গির্জ্জায় যাইয়া এজন্য বক্তৃতা করিতে হইল। বিভিন্ন বিদ্যালয়-গৃহে এবং সভা সমিতির সম্মুখেও তিনি

টাস্কেজীর বৃত্তান্ত জানাইলেন। বড়ই কঠিন কার্য্য। কেহই উহার নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। এদিকে লোকের উৎসাহ আকৃষ্ট করা অল্প পরিশ্রমের ব্যাপার নহে। যাহা হউক, ডেভিড্‌সন ধীরে ধীরে উত্তর প্রান্তের ভালবাসা পাইতে লাগিলেন।

ডেভিড্‌সন একদিন এক ষ্টীমারে নিউইয়র্ক যাইতেছিলেন। সেখানে একটি ইয়াঙ্কি রমণীর সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। রমণী ষ্টীমার ত্যাগ করিবার সময়ে ডেভিড্‌সনকে ১৫০৲ টাকার একটা 'চেক্' লিখিয়া দিলেন।

ডেভিড্‌সনকে অর্থসংগ্রহের জন্য যারপর নাই খাটিতে হইয়াছিল। এজন্য তিনি এত দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন যে অনেক সময় তাঁহার চলিবার ক্ষমতা থাকিত না। একদিন বোষ্টন নগরে একটি রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া ডেভিড্‌সন তাঁহার 'কার্ড' পাঠাইলেন। কার্ড পাইয়া রমণী বৈঠকখানায় আসিলেন। আসিয়াই দেখেন ডেভিড্‌সন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

ডেভিড্‌সন যে সময়ে অর্থসংগ্রহ করিতেছিলেন সেই সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্যও তাঁহার ছিল। তাহা ছাড়া তিনি টাস্কেজীর রমণী-মহলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শিক্ষা দিতেন, এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনের চেষ্টা করিতেন। অধিকন্তু একটি রবিবারের বিদ্যালয়ের ভারও তিনি লইয়াছিলেন।

তিনি আমাদের সাহায্যকারী বন্ধুগণের সঙ্গে সর্ব্বদা চিঠিপত্রের সাহায্যে আলাপ রাখিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে

বিদ্যালয়ের অবস্থা জানাইতে চেষ্টাও করিতেন। এইরূপে টাস্কেজীর জন্য নানা স্থানে স্থায়ী বন্ধুর সৃষ্টি হইয়াছিল।

গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া গেল। ঘরের নাম রাখা হইয়াছিল "পোর্টার হল"। পোর্টার নিউইয়র্কের ব্রুক্‌লিন নগরের একজন সহৃদয় ইয়াঙ্কি। ইনি কিছু বেশী টাকা দিয়াছিলেন—এজন্য গৃহের নাম ইহাঁর সঙ্গে সংযুক্ত রাখিয়াছিলাম। এই ঘর তৈয়ারী করিবার সময়ে টাকার অভাব খুব বোধ করিতে লাগিলাম। একজন পাওনাদারকে কথা দিয়াছিলাম, অমুক তারিখে তাঁহার প্রাপ্য ১২০০৲ দিব। সেই তারিখ আসিল। সকালে একটিমাত্র টাকাও হাতে নাই দেখিলাম। দশটার সময়ে ডাক পাইলাম। সেই সঙ্গে কুমারী ডেভিড্‌সনের একখানা চিঠি ছিল। তাহার মধ্যে একটা ১২০০৲টাকার চেক্! আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আরও অনেক সময়েই এইরূপ অবাক্ হইয়াছি। এই ১২০০৲ বোষ্টনের দুই জন রমণী দান করিয়াছিলেন। এই দুই রমণী এক বৎসর পরে আরও ১৮,০০০৲ দান করিয়াছিলেন। বিগত ১৪ বৎসর ধরিয়া এই দুইটি রমণী ১৮,০০০৲ করিয়া প্রতি বৎসর দিয়া আসিতেছেন।

গৃহ নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে মাটি কাটা আরম্ভ হইল। ছাত্রেরাই এই কাজ করিল। অবশ্য এখন পর্য্যন্ত তাহারা নবভাবে সম্পূর্ণরূপে মজিয়া উঠে নাই। এখন ত তাহাদের সেই পুরাতন বাবুগিরির ভাব কিছু কিছু ছিল। "আমরা লেখা পড়া শিখিতে আসিয়াছি, মাটি কাটিব বা ইট গড়িব কেন?"—

অনেকেরই এই ভাব! যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে শারীরিক পরিশ্রমের উপকারিতা ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

মাটি কাটা হইয়া গেলে—দেওয়ালের ভিত্তি গুলি প্রস্তুত হইয়া গেল। এখন সমারোহ করিয়া প্রকাশ্যভাবে 'ভিত্তি প্রতিষ্ঠা' উৎসবের আয়োজন করিলাম।

১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমরা কেনা গোলাম ছিলাম। দক্ষিণ প্রান্তের এই অঞ্চলেই গোলামাবাদ বেশী ছিল। এই বিভাগের নামই "কৃষ্ণ বিভাগ।", গোলামী যুগে এই বিভাগে নিগ্রোকে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সংসার দেখিতে লাগিল।

আলাবামা প্রদেশের শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধায়ককে উৎসবের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। তিনিই প্রধান বক্তৃতা করিলেন। গৃহের যে কোণে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল সেখানে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, বন্ধু, আত্মীয়, প্রদেশ-রাষ্ট্রের কর্ম্মচারী, মহাজন, ব্যবসাদার সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহারা গোলামখানার মালিক ছিলেন আজ তাঁহারা গোলাম-জাতির হাত ধরিয়া এই শিক্ষা মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় লেখাপড়া শিখান মহাপাপের কার্য্য বিবেচিত হইত। যে শিক্ষক নিগ্রোকে শিখাইতে চাহিত সমাজে তাহার কুখ্যাতি রটিত, আইনেও সে দণ্ডনীয় হইত। আজ ১৬ বৎসরের ভিতর সেই গোলামাবাদের আব্‌হাওয়ার মধ্যে বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা, এবং ভিত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব! সর্ব্বত্র আনন্দের মহা কোলাহল—সকলের চিত্তেই স্ফূর্ত্তি। যেন কি এক দেবভাবে টাস্কেজীর

সাহায্য করিলেন। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সকলেই সেই ভিত্তি প্রস্তরের নীচে কিছু না কিছু চিহ্ন রাখিতে উৎসুক হইল।

গৃহ-নির্ম্মাণের কার্য্য যখন অগ্রসর হইতে ছিল সেই সময়ে বহুবার আমাদের বড়ই দুশ্চিন্তায় দিনরাত্রি কাটাইতে হইত। হাতে পয়সা থাকিত না—অথচ পাওনাদারদিগের টাকা দিবার দিন চলিয়া আসিত। ভুক্তভোগী ভিন্ন এই উদ্বেগ আর কে বুঝিবে ? কত রাত্রি বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই।

আমি জানিতাম যে, আমি অসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছি। এখন আমাকে কেহই সাহায্য করিবে না। বরং সকলেই বাধা দিবে। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই অবস্থায় আমাকে একাকীই সকল কার্য্য করিতে হইবে। আমি কষ্টভোগ করিয়া, নীরবে দুঃখ সহিয়া, লোকজনের উপহাসে বিচলিত না হইয়া, দৃঢ়ভাবে কাজ করিতে করিতে যদি সফল হইতে পারি, তবে ভবিষ্যতে আমি সমাজের সাহায্য পাইব। সাধারণ লোকেরা আগে কোন কাজ করিতে চাহে না—তাহারা যখন দেখে যে অন্যের আরব্ধ অনুষ্ঠানটা কৃতকার্য্য হইতে চলিল তখন তাহারা উহার প্রতি অনুরক্ত হয়। সুতরাং সকল দুঃখ নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তার বোঝা এক্ষণে আমাকেই নিজ মাথায় বহন করিতে হইবে। আমার কবরের উপরই নিগ্রোসমাজের জাতীয় বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক।

দশম অধ্যায়

অসাধ্য সাধন

প্রথম হইতেই টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে আমি আমার নূতন আদর্শে তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মতে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কাজই ছাত্রদের নিজ হাতে করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বোর্ডিং-গৃহের ঘরঝাড়া, কাপড় ধোয়া, রান্নাকরা ইত্যাদি সকল কাজই ছাত্রদের করা উচিত। তার পর স্কুলঘরের টেবিল চেয়ার মেঝে পরিষ্কার রাখা, এবং আসবাবপত্র সাজান এ সবও ছাত্রদেরই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু বিদ্যালয়ের উঠান মাঠ ও জমির শ্রীবিধান সম্বন্ধে ছাত্রদের দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া পশুপালন, কৃষিকার্য্য, চাষবাস, মাটিকাটা ইত্যাদি কর্ম্মের জন্যও বাহিরের মজুর লাগান উচিত নয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই এই সকল কাজ সম্পন্ন করা আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে—বাড়ীঘর মেরামত, নূতন নূতন গৃহ-নির্ম্মাণ, করাতে কাঠ চেরা, ইট তৈয়ারী করা, চূণ শুরকি প্রস্তুত করা—এই সমুদয় ঘরামি ও মিস্ত্রিগিরির কাজও ছেলেদেরই করা প্রয়োজন।

সকল প্রকার গৃহস্থালী, কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ছাত্রেরা বেশ পাকা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। নানা-বিধ কারিগরি এবং শিল্পিমহলের নূতন নূতন আবিষ্কারগুলি তাহাদের 'হাতে কলমে' শিক্ষা হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহারা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য অর্জ্জন করে ও কর্ম্মঠ হইতে থাকে; এবং নৈতিক চরিত্র বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। খাটিয়া খাওয়া নিন্দনীয় কাজ নয়। লেখা পড়া শিখিলেই 'বাবু' হইয়া যাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকদেরও স্বহস্তেই চাষ করা উচিত এবং নিজের ঘর বাড়ী নিজেই প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এক কথায়, সকলেরই নিজ অভাবগুলি যথাসম্ভব নিজেই মোচন করিয়া লওয়া উচিত। খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা ইত্যাদি কোন বিষয়েই পরের উপর নির্ভর করা শিক্ষিত ও সভ্য লোকের লক্ষণ নয়। এই সকল ধারণা আমার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে ছাত্রদের মাথায় সহজেই বসিতে পারে।

শারীরিক পরিশ্রম এবং স্বাবলম্বন এই দুইটি গুণই আমি প্রকৃত শিক্ষালাভের চিহ্ন মনে করি। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি শারীরিক পরিশ্রমকে কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। নিজে খাটিলে অনেক বিষয়ে খরচ কম হয়—তাহা সকলেরই জানা আছে। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহাও বুঝেন। কিন্তু একমাত্র এই জন্যই তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রমের আদর করেন না। তাঁহারা খাটিয়া খাওয়াকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও ধর্ম্মের মধ্যে গণ্য করেন। পরিশ্রমের অন্য কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক,

তাঁহারা পরিশ্রম করিতে পারিলেই সুখী ও আনন্দিত হন। পরিশ্রম করিতে পারাটাই একটা মহাগুণ—পরিশ্রমী ব্যক্তিমাত্রই গুণবান্ এবং সকলের প্রশংসাযোগ্য। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি এইরূপ ভাবিয়া থাকেন।

এই ধর্ম্মভাবে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে খাটিয়া খাওয়ায় কোন অপমান, কষ্ট ও লজ্জাবোধ হইতেছে না। কারণ পরিশ্রম করা তখন অপর লোকের কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়-মাত্র মনে হইবে না। উহার দ্বারা নিজেরই উপকার হইতেছে ভাবিতে পারিবে। উহা নিজ জীবনেরই সার্থকতা লাভের অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইবে। পরিশ্রমের ফলে তুমি প্রকৃত মানুষ হইতেছ এই জ্ঞান থাকিবে। কাজেই পরিশ্রম গৌরবজনক পুণ্যের কাজরূপেই আদর পাইতে পারিবে—কোন মতেই ঘৃণ্য বা কষ্টকর বোধ হইবে না। নিজের আত্মার যাহাতে উন্নতি হয় তাহাতে কেহ কখনও কষ্টবোধ করে কি ?

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে ছাত্রেরা শারীরিক পরিশ্রমের এইরূপ মর্য্যাদা ও গৌরব দান করিতে শিখে। তাহা ছাড়া বিদ্যালয় চালাইবার পক্ষেও খুব সুবিধা হয়। কারণ এই উপায়ে প্রায় সকল খরচই কমাইয়া ফেলান যায়। ছাত্রদের পরিশ্রমেই ঝাড়ুদার, ধোপা নাপিত মিস্ত্রি ছুতার কামার কুমার চাষী ইত্যাদি সকল প্রকার মজুরের কাজ চলিয়া থাকে। এজন্য অর্থব্যয় প্রায় হয়ই না বলিলে চলে। সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছাত্রেরা নূতন নূতন শিল্পবিদ্যা শিখিতে থাকে। জল,

বায়ু, বাষ্প, তড়িৎ, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের সকল শক্তি মানুষকে নানা উপায়ে সাহায্য করিতেছে। কৃষিকর্ম্মে এবং শিল্পকার্য্যে লাগিয়া থাকিলে অতি সহজেই এ বিষয়ে ধারণা জন্মে। বস্তু-জ্ঞান, ব্যবহারিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় ছাত্রদিগকে আর নূতন করিয়া শিখাইতে হয় না। তাহারা বিশ্বশক্তিগুলি প্রতিদিনকার নানা কাজে লাগাইতে লাগাইতে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, পদার্থ তত্ত্ব ইত্যাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলে।

আমার প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষা প্রণালীর সুবিধাগুলি বর্ণনা করিলাম! এই আদর্শে আমি টাস্কেজী বিদ্যালয় চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুতরাং যখন নবগৃহ নির্ম্মণের সুযোগ আসিল আমি ছাত্রদিগকেই এ কাজে লাগাইতে চাহিলাম। কেহ কেহ বলিলেন "ছাত্রেরা এখন মিস্ত্রীর কাজ জানেই না। কাঠ কাটিতেও তাহারা তত পটু নয়। ঘরামিগিরি করিবে কিরূপে? এত বড় ইমারত তৈয়ারী করা কি ইহাদের সাধ্য? পারিলেও যে বাড়ীটা অতি বিশ্রী ও কদাকার দেখাইবে! আপনার এ পরামর্শ ভাল হয় নাই। সহর হইতে পাকা মিস্ত্রী ডাকিয়া আনাই উচিত। ছাত্রেরা না হয়, ইহাদের কাজে সাহায্য করিবার জন্য জল, হাতিয়ার, চূণ, শুরকি ইত্যাদি বহিয়া দিবে।"

আমি আমার বন্ধুগণকে বলিতাম, "দেখুন, আমি বুঝিতেছি যে আমাদের বাড়ীটা ছেলেরা প্রস্তুত করিলে নিতান্তই কদাকার দেখাইবে। কিন্তু গৃহের সৌন্দর্য্যবিধানই কি আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য? নাই বা হইল বাড়ীটা দেখিতে সুশ্রী! কিন্তু ছেলেরা ত

এতগুলি কাজ শিখিয়া ফেলিবে। তাহারা স্বাবলম্বী হইতে অভ্যস্ত হইবে। আর, এত বড় ইমারতের জন্য মাটি খুঁড়া হইতে আরম্ভ করিয়া চূণকাম ও রংকরা পর্য্যন্ত সকল কাজ নিজহাতে সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পাইবে। তাহাতে শিল্পশিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রগঠন যথেষ্টই হইতে থাকিবে। অধিকন্তু, আনুষঙ্গিকভাবে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের অশেষবিধ উৎকর্ষ এবং সাধারণ সভ্যতা বিষয়েও ইহাদের ধারণা পরিষ্কার হইবে। এইগুলি কি কম লাভ? আমার বিবেচনায় এজন্য ঘরবাড়ীগুলি যদি অতি বিশ্রী ভাবেই তৈয়ারী হয় তাহাতেও দুঃখ করা উচিত নয়।”

আমি আরও বলিতাম, “আমাদের ছেলেরা সকলেই গরিব। ইহারা পল্লীগ্রামে বাস করে। ইহাদের গৃহসম্পত্তির মধ্যে একটা করিয়া কাঠের কামরা আছে মাত্র। তুলা, চিনি ও চাউলের আবাদে ইহাদিগকে সারা দিন খাটিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহারা যদি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রথমেই একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের মত বাড়ীতে থাকিতে পায় তাহা হইলে ইহাদের আনন্দের ও গৌরবের সীমা থাকিবে না। ইহা স্বাভাবিক, কারণ কষ্টের পর সকলেই সুখ আশা ও ইচ্ছা করে। কিন্তু আমরা যদি এই অবস্থায় ইহাদিগকে কিছু নূতন আদর্শ ও জীবনের নূতন লক্ষ্য না দিতে পারি তাহা হইলে আমরা ইহাদের জন্য কি করিলাম? পূর্ব্বে ইহারা যে চিন্তা ও যে ধারণা লইয়া লেখা পড়া শিখিতে আসিয়াছিল গৃহে ফিরিবার সময়েও ইহাদের সেই চিন্তাও ধরিয়া থাকিয়া যাইবে না কি?

এইজন্যই আমি মনে করিয়াছি যে, ইহারা ইটের ঘরে থাকিয়া সুখভোগ করিবার পূর্ব্বে নিজ হাতে ইট তৈয়ারী করিতে শিখুক। তারপর সেই ইট দিয়া ইহারাই ঘর প্রস্তুত করিবে। নিজ বসবাসের জন্য নিজহস্তে গৃহনির্ম্মাণ করাও মানুষের স্বাভাবিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়? আর ছাত্রগণ ইহাতে গৌরব এবং আনন্দও কি কম পাইবে? অধিকন্তু নিজহাতে গড়া জিনিষ সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে থাকিলে তাহাই শিক্ষালাভের একটি প্রধান উপায় হইবে। কারণ তাহা দেখিয়াই ছাত্রেরা অতীতের ভুলগুলি বুঝিতে পারিবে। তাহারা সেইগুলি সহজেই সংশোধন করিবার উপায় বুঝিয়া লইবে, এবং ভবিষ্যতের জন্য উন্নতি বিধানের পথও খুলিতে থাকিবে। ছাত্রেরা এইরূপে নিজেই নিজেদের শিক্ষক হইয়া পড়িবে। এই 'আত্মশিক্ষা'র সুযোগ আর কোন উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে কি?"

টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের প্রথম গৃহ ছাত্রেরাই নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ১৯বৎসরের ভিতর বিদ্যালয়ের জন্য যতগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে প্রায় সকলগুলিই আমাদের ছাত্রগণের প্রস্তুত। আমি আমার শিক্ষাপ্রণালী কোন সময়েই বর্জ্জন করি নাই। আজ আমাদের সর্ব্বসমেত ছোটবড় ৪০টা গৃহ। এইগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ৪টার জন্য ছাত্রদের খাটান হয় নাই। অবশিষ্ট ৩৬টা গৃহই ছাত্রেরা নিজহাতে তৈয়ারি করিয়াছে। বাহিরের মিস্ত্রির সাহায্য একেবারেই লওয়া হয় নাই বলা যাইতে পারে।

এই বিশ বৎসরের কার্য্যফলে দেখিতে পাই যে, আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় লোকেরা আজকাল সকলেই ঘরবাড়ী তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছে। টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৪০ টা গৃহনির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণ ঘরামি, মিস্ত্রী ও ছুতারের কাজে ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য লোকেরাও কিছু কিছু গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। আর আমাদের বিদ্যালয়ের উপকারই কি হইয়াছে কম? বৎসরের পর বৎসর ছাত্র আসে যায়—কিন্তু গৃহনির্ম্মাণ-বিদ্যা আমাদের স্কুলের স্থায়ী আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন ছাত্রদের উত্তরাধিকারের সূত্রে নূতন নূতন ছাত্রেরা মাটি কাটা, গর্ত্ত খুঁড়া, কাঠ চেরা, ইট গড়া, গৃহের চিত্র অঙ্কন করা, এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব করা হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যাসের কল লাগান, ইলেক্ট্রিক বাতীর ব্যবস্থা করা সবই শিখিয়া লয়, এখন আমরা গৃহনির্ম্মাণ সংক্রান্ত কোন বিষয়েই বাহিরের লোকের সাহায্য চাই না।

কোন সময়ে একজন নূতন ছাত্র ছেলেমানুষী করিয়া দেওয়ালে পেন্সীলের দাগ দিতে থাকে অথবা টেবিলে ছুরি দিয়া নাম লিখিতে থাকে, অমনই পুরাতন ছাত্রেরা তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়। তাহাদের তিরস্কার আর কিছুই নয়—এইমাত্র "ওহে, ও দেওয়ালটা আমরাই প্রস্তুত করিয়াছি, এই টেবিলটাও আমাদের হাতে গড়া। নষ্ট করিলে আমাদিগকেই সারিতে হইবে।"

সর্ব্বপ্রথম গৃহনির্ম্মাণ সময়ে ইট প্রস্তুত করিতেই আমাদিগকে বিশেষ ভুগিতে হইয়াছিল। আমাদের নিজের প্রয়োজন ছাড়া ইট তৈয়ারী করিবার আর একটা কারণও ছিল; আমাদের টাস্কেজী অঞ্চলে সেই সময়ে ইট গড়িবার কোন কারখানা ছিল না। অথচ বাজারে ইটের কাট্‌তি যথেষ্ট। কাজেই ইটের ব্যবসায় বেশ লাভ করা যাইত। এই লাভের আশায়ও আমি বিদ্যালয়ে ইটের কারবার খুলিতে ইচ্ছা করিলাম।

বাইবেলে পড়িয়াছি—ইজবেলদের শিশুরা বিনা খড় কুটায় ইট তৈয়ারী করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আমি দেখিলাম আমাদের কাজ তাহা অপেক্ষা কম কষ্টকর নয়। কারণ প্রথমতঃ এ বিষয়ে আমাদের কাহারও কিঞ্চিৎ মাত্র অভিজ্ঞতা নাই। দ্বিতীয়তঃ তহবিলে এই ব্যবসা চালাইবার জন্য এক পয়সাও মজুত নাই।

তার পর, ইট গড়া কাজটাও নেহাত সোজা নয়। কাদামাটির গর্ত্তের মধ্যে ২।৪ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া কাজ করা বড়ই দুঃখজনক। হাঁটু পর্য্যন্ত কাদা লাগিয়া থাকে। ছাত্রদিগকে এ কার্য্যে ব্রতী করিতে বড়ই বেগ পাইতে হইত। এতদিন তাহাদিগকে বুঝাইতে বুঝাইতে জমি চষিবার কাজে লাগান গিয়াছে। কিন্তু যখন এই কাদামাটি ঘাঁটিবার কাজ আসিল তখন তাহাদিগের সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া শারীরিক পরিশ্রম করাই ত তাহারা আদৌ পছন্দ করিত না। তাহার উপর এইরূপ জঘন্য ও কষ্টকর

কাজ করিতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নারাজ। কষ্টে দুঃখে অপমানে ও লজ্জায় অনেক ছাত্র আমাদের স্কুল ছাড়িয়া গেল।

আমি পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, ইট তৈয়ারী করিতে গেলে বেশী বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কাজে নামিয়া দেখিলাম, খুব পাকা হাত না হইলে ইট গড়া বড় কঠিন। প্রথমতঃ কাদামাটি প্রস্তুত করিতেও বিশেষ অভিজ্ঞতা চাই। আমরা এজন্য এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় আমাদের মাটির গর্ত্ত সরাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শেষে একস্থানে বেশ ভাল মাটি পাওয়া গেল। সেইখানে ইট প্রস্তুত হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ ; পোড়ান কাজ খুবই কঠিন। ২৫,০০০ ইট মাটি দিয়া প্রস্তুত করা হইল। কিন্তু এই গুলি পোড়াইতে যাইয়াই মহা বিপদ। আমরা একটা, দুইটা, তিনটা পাঁজা প্রস্তুত করিয়া তিন তিনবার অকৃতকার্য্য হইলাম। আমার কয়েক জন শিক্ষক হ্যাম্পটনে ইট প্রস্তুত করিতে শিখিয়া ছিলেন। তাঁহারা তৃতীয় পাঁজাটা বিশেষ দক্ষতার সহিতই প্রস্তুত করিলেন। এক সপ্তাহ আমাদের ইটগুলি বেশ পুড়িতে লাগিল। ভাবিলাম এ যাত্রায় সফল নিশ্চয়ই হইব। কিন্তু সাত দিন পরে রাত্রি ১২। ১ টার সময় পাঁজাটা ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা তৃতীয়বার বিফল হইলাম।

সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আর চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। ইট গড়া আমাদের দ্বারা হইবে না।" তাহার উপর আমার পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে। চতুর্থবার এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট বা

পরীক্ষা করিতে হইলেও টাকার প্রয়োজন। একে নৈরাশ্য তাহাতে দারিদ্র্য। পুনরায় চেষ্টা করা অসম্ভব মনে হইতে লাগিল। আমার একটা পুরাতন ঘড়ি ছিল। এই সময়ে সেটা একটা দোকানে বাঁধা রাখিয়া ৫০৲ ধার লইয়া আসিলাম। এই টাকার সাহায্যে ইটের পাঁজা তৈয়ারী করিতে যাওয়া গেল। এইবার কৃতকার্য্য হইলাম। এতদিন পরে ২৫,০০০ ইট আমাদের কারখানায় তৈয়ারী হইল।

আজ ইটের কারবার টাস্কেজী-বিদ্যালয়ে খুব জোরের সহিতই চলিতেছে। গত বৎসর আমাদের ছাত্রেরা ১,২০০,০০০ ইট গড়িয়াছিল। এগুলি এত সুন্দর ও নিরেট যে আমি যে কোন বাজারে ফেলিয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্য আদায় করিতে পারি তাহা ছাড়া বিগত বিশ বৎসরের শিক্ষার ফলে, আজ আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে গণ্ডায় গণ্ডায় নিগ্রো যুবক ইটের ব্যবসায় করিয়া অন্নসংস্থান করিতেছে।

ইটের কারবার করিতে করিতে আমার একটা নূতন দিকে দৃষ্টি পড়িল। আমাদের বিদ্যালয়ে বহু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ইট খরিদ করিতে আসিত। তাহারা পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বলিত না। কিন্তু অন্যত্র ইট পাওয়া যায় না কাজেই ইহারা কৃষ্ণাঙ্গের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল।

আর পূর্ব্বে অনেক শ্বেতাঙ্গই ভাবিত যে, লেখা পড়া শিখিয়া নিগ্রোরা বাবু হইয়া পড়িবে। তাহারাও এখন বুঝিল যে, নিগ্রোরা এই জাতীয় বিদ্যালয় খুলিয়া সত্য সত্যই নিজেদের

উন্নতি করিতেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সহরেরই উপকার হইতেছে। এই উপায়ে কৃষ্ণাঙ্গ সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গের ধারণা বদলাইতে লাগিল।

ফলতঃ আমাদের দুই সমাজে কর্ম্মবিনিময় ও ভাব-বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হইল। আজ দক্ষিণ অঞ্চলে নিগ্রোয় ও শ্বেতাঙ্গে যে সদ্ভাব রহিয়াছে তাহার অন্যতম কারণ আমাদের টাস্কেজীর এই ইটগড়া এবং ইটের কারবার। বহু বক্তৃতা দ্বারা যে কার্য্য করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে তাহা নীরবে ও সহজে সিদ্ধ হইয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গ যে কৃষ্ণাঙ্গকে বাদ দিয়া সংসারে চলিতে পারিবে না —এই ব্যবসায় হইতে তাহারা বেশ বুঝিয়া লইল। কাজেই আজ দুই সমাজই এক বৃক্ষের ফলের ন্যায় পরস্পর সাপেক্ষ। পরস্পর পরস্পরের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। শ্বেতাঙ্গের কার্য্যে কৃষ্ণাঙ্গের উপকার হয়, এবং কৃষ্ণাঙ্গের বিদ্যায় শ্বেতাঙ্গের অভাব মোচন হয়। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ আজ আমেরিকাজননীর যমজ সন্তানের ন্যায় চলাফেরা করিয়া থাকে। শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার মূল্য কি কম?

আমি আমার স্বজাতিগণকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকি, "দেখ, গলাবাজী করিয়া কখনও একটা বড় কিছু করা যায় না। তোমরা ভাবিয়াছ যে, চেঁচামেচি করিলেই তোমাদিগকে শ্বেতাঙ্গেরা ভাই বলিয়া ডাকিবে, এবং তাহাদিগের সমান ক্ষমতা তোমাদিগকে দিতে থাকিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর নয়। কাজ করিতে

লাগিয়া যাও। কৃষিকর্ম্মে লাগিয়া যাও, শিল্পকার্য্যে লাগিয়া যাও, ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগিয়া যাও। বাড়ী, গাড়ী, রেল, জাহাজ, ষ্টীমার তৈয়ার করিতে থাক। এ সকল বিষয়ে তোমাদের 'হাত' দেখাও। তাহাদিগকে তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় দেখাও। তাহারা বুঝুক যে, তোমরাও মানুষ, তোমরাও মাথা খাটাইয়া একটা জিনিষ দাঁড় করাইতে পার। তাহা হইলেই তাহারা তোমাদিগকে সম্মান করিবে—তোমাদের সঙ্গে বসিতে চাহিবে—তোমাদের সঙ্গে খাইতে চাহিবে। দেখিতে পাও না—যে যে অঞ্চলে নিগ্রো শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা বেশ দক্ষতার সহিত কারবার চালাইতেছে সেই সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গে বিরোধ বড় বেশী নাই? সেখানে কালচামড়া সাদা চামড়ায় প্রভেদ অল্প মাত্রই দেখা যায়!"

আমি বিশ্বাস করি, গুণ যাহার মধ্যেই থাকুক না কেন, সমস্ত জগৎই তাহাকে সম্মান করিতে বাধ্য। দুদিন আগে কিম্বা দুদিন পরে—এই যা। গুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা, চরিত্র-বত্তা এ সকল জিনিষ চাপিয়া রাখা যায় না। কেহ এগুলিকে কোনদিন ঢাকিয়া রাখিয়া দাবিয়া ফেলিতে পারিবে না। আর একটা কথাও আমি সর্ব্বদা মনে রাখি এবং সকলকে বলিয়া থাকি,—"কথা অপেক্ষা কাজের মূল্য শতগুণ বেশী। একশত জন লোক ঐক্য-বিধান, সুবিচার, অধিকার-বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সমাজের যে উপকার করিতে না পারে, একজন লোক একটা সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করিয়া সেই উপ-

কার করিতে পারে। যখনই শ্বেতাঙ্গেরা রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে নিগ্রোনির্ম্মিত একখানা সুন্দর গৃহ দেখিবে তখনই তাহারা নিগ্রোর ক্ষমতায় বিশ্বাস করিবে। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার পরক্ষণ হইতেই কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের বন্ধু ও পূজার পাত্র হইয়া পড়িবে। কেবল গৃহনির্ম্মাণে কৃতিত্ব কেন, সকল বিষয়েই কৃতিত্ব, দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট না করিয়া যায় না। তখন তাহারা কে গান করিতেছে, কে চিত্র আঁকিতেছে, বা কে মূর্ত্তি গড়িতেছে, বা কে বাগান তৈয়ারী করিতেছে—এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কৃতিত্বের দাস হইয়া পড়ে। গুণপনার ক্ষমতা অসীম। সুতরাং শ্বেতাঙ্গদিগকে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে এখন আমাদের গুণপনা দেখান আবশ্যক। গুণমুগ্ধ হইলে শীঘ্রই তাহারা আমাদিগকে আদর করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের কাল চামড়ার জন্য বেশী বাধা পাইব না।”

ছাত্রেরাই টাস্কেজীর গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে, ঠিক সেই আদর্শের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তাহাদিগের দ্বারা আমাদের বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী জুড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করাইয়াছি। আজ কাল আমাদের এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা প্রায় ১২টা। সকল গুলিই ছাত্রদের নিজ হাতে প্রস্তুত। তাহা ছাড়া আরও অনেক গাড়ী তৈয়ারী করিয়া আমরা বাজারে বেচিয়াছি। আমাদের গাড়ীর কারখানার সাহায্যেও শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গে সদ্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। আমাদের শিক্ষিত ছাত্রেরা যে অঞ্চলে গাড়ীর কারবার করে

তাহারা সেই অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গমহলে বিশেষ প্রতিপত্তিই অর্জ্জন করিয়াছে, দেখিতে পাই।

সংসারে লোকের যাহা অভাব তাহা তুমি যদি মোচন করিতে পার, তোমার প্রভুত্ব সেখানে সুনিশ্চিত জানিয়া রাখিও। লোকে চায় শাক শব্জী, ইট কাঠ; লোকে চায় স্বাস্থ্য ও আর্থিক উন্নতি; লোকে চায় বাড়ী ঘর, আসবাব, গাড়ী ইত্যাদি। তোমরা যদি সেখানে তোমাদের গ্রীকভাষার ব্যাকরণ লইয়া হাজির হও তাহা হইলে তোমাদিগকে তাহারা সম্মান করিবে কেন? বাজারের কাট্তি বুঝিয়া মাল জোগান দিতে থাক, দেখিবে সংসার তোমার গোলাম।

আমার নূতন আদর্শের শিক্ষাপ্রণালী ত প্রবর্ত্তিত হইল। ধনী নির্ধন বিচার না করিয়া সকল ছাত্রকেইশারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য করিলাম। সকলকেই শিল্পে, কৃষিকর্ম্মে, গৃহস্থালীতে লাগাইয়া দিলাম। আমার নিয়মগুলি টাস্কেজীময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই ভাবিতে লাগিল আমি একজন কিম্ভূত কিমাকার লোক। যা খুসী তাই করি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। ছেলেগুলির মাথা খাইতে বসিয়াছি। ছাত্রদের অভিভাবকেরা পত্র দিলেন—তাঁহাদের সন্তানদিগকে যেন হাতে পায়ে খাটিতে না বলা হয়। এইরূপ অসংখ্য আপত্তি আসিল। অনেকের বাপ মা স্কুলে স্বয়ংই আসিয়া হাজির। তাঁহারা চাহেন পুস্তক-শিক্ষা। যত পুস্তকের সংখ্যা ততই তাঁহাদের ধারণায় পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি।

দেখিতে দেখিতে আমার বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে, আমার শিক্ষা-প্রণালীর বিরুদ্ধে এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে বেশ একটা বিদ্রোহ বাধিয়া উঠিল। পাড়ার লোকেরা, সহরের লোকেরা, জেলার লোকেরা, ছাত্রদের অভিভাবকেরা এবং ছাত্রেরা একাকী বা দলবদ্ধভাবে আমার নিন্দা ও অপমান করিতে লাগিল। তাহারা আমার ঐরূপ নূতন নিয়মে শিক্ষাপ্রচার চাহে না। আমি কিন্তু অটল অচল ও গম্ভীরভাবে রহিলাম। আমার মত পরিবর্ত্তন করিলাম না। অনেক ছাত্র নাম কাটাইয়া চলিয়া গেল। অনেকে বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করিল। তথাপি আমি নড়িলাম না—আমার মত ধীরভাবে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। আমি নানাস্থানে যাইয়া অভিভাবকগণকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলাম। ক্রমশঃ লোকজনেরা কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। দুই বৎসরের মধ্যে আমার ছাত্রসংখ্যা ১৫০ হইল। দেখা গেল, আলাবামাপ্রদেশের সকল জেলা হইতেই টাস্কেজীতে ছাত্র আসিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশ হইতেও দুই চারিজন আসিয়াছে। মোটের উপর টাস্কেজী বিরোধ কাটাইয়া উঠিয়া উন্নতির পথে দাঁড়াইল। আমার একটা অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল। আমার শিল্পশিক্ষা-নীতির জয় হইল।

"পোর্টার হল" নির্ম্মিত হইয়া গেল। সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের উপযোগী হইবার কিছু বাকি থাকিল। তথাপি আমরা শীঘ্র শীঘ্র গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন করিয়া লইলাম। উত্তর অঞ্চলের একজন শ্বেতাঙ্গ ধর্ম্মগুরুকে এই উপলক্ষ্যে সভাপতির আসনে নিমন্ত্রণ

করা হইয়াছিল। তাঁহার নাম রেভারেণ্ড রবার্ট সি বেড্‌ফোর্ড। তিনি আমার নাম পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই। যাহা হউক তিনি একজন অতিশয় সহৃদয় ব্যক্তি—আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিগ্রোজাতিকে উৎসাহিত করিলেন। তাহার পর হইতে তিনি আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাষ্টী বা অভিভাবক ও রক্ষকরূপে কার্য্য করিতেছেন।

ইহারই কিছুকাল পরে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ে একজন কর্ম্মী পুরুষ হ্যাম্পটন হইতে আসিলেন। তখন হইতে বিগত ১৭ বৎসর কাল তিনি আমাদের হিসাব রক্ষকের কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁর নাম ওয়ারেণ লোগান। এই অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ যুবকের সাহায্যে আমাদের আর্থিক অবস্থা যৎপরোনাস্তি উন্নত হইয়াছে।

আমরা "পোর্টার হলে" কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিলাম। এইবার আমরা ছাত্রাবাস সম্বন্ধে সবিশেষ উদ্যোগী হইলাম। দেড় বৎসর হইল টাস্কেজীর কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে বহুদূর দেশ হইতেই ছাত্র আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছাত্রসংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং ইহাদিগের গতিবিধি, স্বভাব চরিত্র বুঝিবার জন্য বড় রকমের ছাত্রাবাসের অয়োজন করা অত্যন্ত আবশ্যক। এই বুঝিয়াই আমরা এত বৃহৎ গৃহনির্ম্মাণে উৎসাহী হইয়াছিলাম। এতদিনে তাহার সুযোগ সত্যসত্যই আসিল।

"পোর্টার হল" তৈয়ারী করিবার সময়ে তাহাতে রান্নাঘর এবং

ভোজন-শালার কামরা রাখা হয় নাই। কাজেই নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইল। আবার ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করা গেল। স্থির করিলাম যে, গৃহের নীচে একটা গর্ত্ত করিতে হইবে। মেজে কাটিয়া মাটি তোলান হইল। একটা বড় গর্ত্তের মত জায়গা প্রস্তুত করিলাম। সেই স্থানেই রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা হইবে।

এখন ছাত্রাবাস চালান যায় কি করিয়া? কাজ আরম্ভ করিতে পয়সার প্রয়োজন। থালা, বাটি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি না হইলে ছাত্রদিগকে শৃঙ্খলা ও ভোজনের রীতি শিখাইব কি করিয়া? বাজারে ধার পাওয়া সহজ নয়। ষ্টোভও নাই যে ভাল রান্না করা যাইবে। অগত্যা বাহিরেই কাঠ জ্বালাইয়া সেকেলে নিয়মে রান্না করান যাইতে লাগিল। বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময়ে যে সকল বেঞ্চের উপর রাখিয়া কাঠ পালিশ করা হইত সেই বেঞ্চগুলিকে খানা খাইবার টেবিল করা গেল। আর থালা, বাটি বেশী সংগ্রহ করিয়া উঠা গেল না।

গৃহস্থালী চালাইতে কেহই জানে না, বুঝিলাম। নিয়মিত সময়ে খাইতে হয়, তাহাই ছাত্রদের জানা নাই। তারপর সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া, সকল ছাত্রের সুখ সুবিধা বুঝিয়া কাজ করা সেত আরও কঠিন। প্রথম দুই তিন সপ্তাহ সকল বিষয়েই হট্টগোল চলিল—কেহ খাইতে পাইল, কেহ পাইল না। কেহ এক তরকারী কম, কেহ বা বেশী পাইল। কোন খাদ্যে নুন বেশী, কোন খাদ্য বেশী পুড়িয়া গিয়াছে। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত।

আমি এই সব দেখিতাম তথাপি উন্নতির জন্য চেষ্টিত হইতাম না। ভাবিতাম, দেখা যাউক আপনা আপনি শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠে কি না। এক দিন সকাল বেলার খাওয়া চলিতেছে। আমি ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি শুনিতে লাগিলাম। ছাত্রছাত্রীরা মহা হল্লা আরম্ভ করিয়াছে। সকলের মুখেই বিরক্তির ভাব। কারণ সে বেলা কাহারই কপালে খাওয়া জুটিল না, সমস্ত রান্নাটাই পুড়িয়া অখাদ্য হইয়া গিয়াছে। একজন ছাত্রী বকিতে বকিতে কূপের নিকট গেল। ভাবিয়াছিল কূপ হইতে জল তুলিয়া খাইবে এবং জল পান করিয়াই সকাল বেলার ভোজন শেষ করিবে। যাইয়াই দেখে কূপের দড়ি ছেঁড়া। তাহার জল পান করা হইল না। মহা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "আঃ, এই স্কুলে একটুকু জল খাইতেও পাই না!" আমি নিকটেই ছিলাম, সে আমাকে দেখিতে পায় নাই।

একসময়ে আমাদের নূতন বন্ধু বেড্‌ফোর্ড টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের অতিথি হইয়াছিলেন। ভোর রাত্রে তিনি শুনিতে পাইলেন তাঁহার নীচের ঘরে মহা গোলযোগ হইতেছে। ব্যাপার কি? ছাত্রদের প্রাতরাশ চলিতেছে। দুইজনের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াছে, পেয়ালায় কাফি খাওয়া আজ কা'র পালা? আগেই বলিয়াছি আমাদের তখনও বাসন-কোসন, থালা, বাটি বেশী জুটে নাই। কাফি পান করিবার জন্য পেয়ালা সকলেই রোজ পাইত না। তিন চারিদিন পর এক এক জনের ভাগ্যে পেয়ালা পড়িত।

ছাত্রাবাসের এই দুর্দ্দশা অবশ্য বেশী দিন ছিল না। ক্রমশঃ

আমাদের শৃঙ্খলা আসিল। এই সকল অসুবিধা, বিরক্তি, এবং দুঃখ ভোগের পর আমরা এখন অনেকটা সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছি। পূর্ব্ব হইতে এইরূপ কষ্টের মধ্যে না পড়িয়া উঠিলে আজ কি এত নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম ?

আজ সেই পুরাতন ছাত্রেরা টাস্কেজীতে আসিয়া কি দেখে ? অনেকগুলি বড় বড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ। চক্‌চকে টেবিল চেয়ার আসবাব পত্র। পরিপাটি গৃহস্থালী, রন্ধন ও ভোজনের সুব্যবস্থা। যথাসময়ে ভোজন শয়ন। এইসব দেখিয়া অনেকেই আমাকে বলিয়াছে—"আমরা পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে দুঃখে কাটাইয়াছি। তাহারই স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে দেখিতেছি, এই সুন্দর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ বুঝিতেছি,—অগ্রগামীদিগের দুঃখ স্বীকারেই ভবিষ্যৎ সমাজের সুখের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই টাস্কেজীর নিকট আমাদের শেষ শিক্ষা।"

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষালয়ে বিশ্বশক্তি

আমি সমগ্র জগতকেই মানুষের বিদ্যালয় মনে করি। এজন্য টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে সংসারের সকল প্রকার কাজ কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিতাম। আমাদের বিদ্যালয়টা এইরূপে একটা ছোট খাট পৃথিবীর মত হইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত বিশ্বের সকল প্রকার শক্তিই এই শিক্ষালয়ের আবহাওয়ায় স্থান পাইত। উৎসব আমোদের ভিতর দিয়া, পশুপালন, অতিথি-সেবার ভিতর দিয়া, লোকহিত পরোপকারের ভিতর দিয়া টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মানুষ হইতে থাকিত। এজন্যই আমি ছাত্রাবাসের সকল গৃহস্থালীর কাজই ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দিয়া করাইতাম।

ছাত্রাবাস খোলা হইবার অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অভাবিতরূপে বাড়িয়া গেল। ইহাদের ভোজন শয়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য আমারা বিব্রত হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কাহারই গৃহস্থালীজ্ঞান ছিল না, সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। তাহার উপর অর্থাভাব।

এখন স্থানাভাবও বেশ ভোগ করিতে হইল। কাজেই স্কুলের নিকটে নূতন ছাত্রদের জন্য কতকগুলি কাঠের কামরা ভাড়া করিয়া লইলাম। এগুলির বড়ই জীর্ণ অবস্থা। শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাসে ছেলেরা অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল।

আমরা ছেলেদের নিকট মাসিক ২৪৲ টাকা করিয়া লইতাম। ঘরভাড়া, খাওয়া, স্নানের জল, ঘর গরম করিবার জন্য কয়লা ইত্যাদি সকল খরচই এই টাকায় চলিত। এই সঙ্গে বলা আবশ্যক যে, মাত্র ২৪৲ টাকায় কুলাইত না। খরচ আরও বেশী পড়িত। কিন্তু অনেক ছাত্রই স্কুলের নানা কাজ করিয়া দিত। এজন্য তাহাদের বেতন না দিয়া আবশ্যক খরচ হইতে কাটিয়া রাখিতাম। বিদ্যালয়ে পড়িবার খরচ বার্ষিক ১৫০৲ টাকা। এই টাকাটা আমরা নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া দিতাম। সুতরাং এই বিদ্যালয়কে ছাত্রদের পক্ষে অবৈতনিক বলা যাইতে পারে।

দেখা গেল, ছাত্রদের নিকট মাস মাস নগদ ২৪৲ টাকা মাত্র আদায় হইত। সকলের টাকা একত্র করিয়া একসঙ্গে খরচ চালাইতে কিছু সুবিধাই পড়িত সন্দেহ নাই। কিন্তু হাতে কিছুই বাঁচিত না। অথচ পুঁজি বা মূলধন না থাকিলে ছাত্রা-বাসের হোটেলখানা ভাল করিয়া চালান কঠিন। আমরা শুইবার ঘরে খাট, গদি, তোষক ইত্যাদি কিছুই জোগাইতে পারিতাম না। শীতকালের রাত্রে ছেলেরা কষ্ট পাইত। রাত্রে উঠিয়া অনেক সময়ে আমি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে যাইতাম।

দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম হইত না। কোন কোন ঘরে যাইয়া দেখিতাম—তিন চারিজন ছাত্র জড়াজড়ি করিয়া আগুন পোহাইতেছে। সকলের পীঠের উপর দিয়া একটা কম্বল ফেলা আছে। কেহই ঘুমাইতে পায় নাই। একদিন রাত্রে খুব বেশী শীত পড়িয়াছিল। পরদিন সকালে ধর্ম্ম-মন্দিরে যাইয়া ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম "কাল রাত্রে তোমাদের কার কার হাত পা জমিয়া গিয়াছিল ?" অমনি তিন জন ছাত্র হাত তুলিয়া বুঝাইল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও ছাত্রেরা কখন বিরক্তির ভাব দেখায় নাই। তাহারা দেখিত যে আমরা যথাসাধ্য তাহাদিগকে সুখে রাখিতেই চেষ্টা করিতেছি। বরং তাহারা শিক্ষকদিগেরই কষ্ট যাহাতে না হয় তাহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইত। শীত সহ্য করা তাহাদের ছাত্রজীবনের অন্যতম ব্রত স্বরূপ হইয়াছিল।

আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মহাশয়েরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, "নিগ্রোজাতি শাসন-কর্ম্মে স্বায়ত্ত বিধান চাহে কেন ? আমরা উহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করি বলিয়া উহাদের মধ্যে সংযম, শান্তি, শৃঙ্খলা থাকে। আমরা ছাড়িয়া দিলে উহাদের সমাজে অশান্তি, অত্যাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি বিরাজ করিবে। এক নিগ্রো অন্য নিগ্রোর অধীন থাকিতেই চাহে না। উহারা কখনই নিজে মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে পারিবে না। আমাদের শাসনেই উহারা সুখে আছে।" আমি পূর্ব্বে এ কথা কিছু কিছু বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায় একথা আর আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের পরিচালনা একটা রাষ্ট্রশাসন অপেক্ষা নিতান্ত কম ব্যাপার নয়। অথচ এখানে একজন শ্বেতাঙ্গেরও কিঞ্চিন্মাত্র আধিপত্য নাই। ইহা একটা পূরাপূরি নিগ্রো-জাতির কর্ম্ম-কেন্দ্র। কৃষ্ণাঙ্গসমাজে স্বায়ত্ত শাসন অসম্ভব নয়—এই প্রতিষ্ঠানে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। বিগত ১৯ বৎসরের ভিতর এখানকার কোন ছাত্র শিক্ষক বা অন্য কর্ম্ম-চারিকে অপমান বা নিন্দা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ছেলেমানুষীগুলি ধরা উচিত নয়। আমাদের অধ্যাপক, কেরাণী এবং পরিচালকেরাও কখন অত্যাচারী হইয়াছেন—একথা শুনি নাই। বরং ছাত্রে শিক্ষকে, কেরাণীতে পরিচালকে সর্ব্বদা প্রীতি, সৌহার্দ্দ্য এবং ঐক্যের বন্ধনই লক্ষ্য করিয়াছি। পরস্পর পরস্পরকে সম্মান করিয়া চলে। একজনের সুখ দুঃখে অভাব-অভিযোগে অন্যান্য সকলেই সাড়া দেয়। এই প্রকাণ্ড নিগ্রো-সংসারের সকল কাজই সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজ কি সত্য সত্যই স্বায়ত্ত শাসনের এবং ঐক্যগ্রন্থনের অনুপ-যুক্ত? টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের পরিচালনা দেখিলে কেহই নিগ্রো-জাতি সম্বন্ধে আর মিথ্যা অপবাদ রটাইতে পারিবেন না। আজ আমি সাহসভরে একথা জগতে প্রচার করিতেছি।

নিগ্রো যুবকেরা ভক্তি জানে—গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারে। আমি কতবার দেখিয়াছি—কোন শিক্ষক বা পরিচালক স্বহস্তে পুস্তক, ছাতা বা আর কিছু বহিয়া লইতেছেন দেখিলে ছাত্রেরা তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া সেইগুলি লইয়া সঙ্গে সঙ্গে

যাইতে চাহে। শিক্ষকগণকে সুখী রাখিতে তাহারা কি যত্নই না করে? বৃষ্টি পড়িতেছে এমন সময়ে কোন শিক্ষক যদি ঘরের বাহিরে থাকেন, ছাত্রেরা তৎক্ষণাৎ ছাতা লইয়া তাঁহার মাথায় ধরিতে আসে। নিগ্রো-সন্তানও মানুষ—তাহাদেরও হৃদয় আছে—তাহারা গুরুকে ভক্তি করিতে পারে।

আজকাল শ্বেতাঙ্গমহলে নিগ্রো সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্বেতাঙ্গেরা আমাদিগকে বর্ব্বর পশু অসভ্য কিছু কম মনে করিতে শিখিয়াছেন। টাস্কেজীর শ্বেতাঙ্গেরা সকলে আজকাল আমাকে সম্মান করিয়া থাকেন। অনেক সময়ে গায়ে পড়িয়াও শ্রদ্ধা দেখাইতে কুণ্ঠিত হন না। টাস্কেজীর বাহিরেও নিগ্রোজাতির প্রতি সুদৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি এখন নানাস্থানে শ্বেতাঙ্গসমাজ হইতে আদর আপ্যায়ন পাইয়া থাকি। সেদিন টেক্সাসপ্রদেশে রেলগাড়ীতে যাইতেছিলাম। প্রত্যেক ষ্টেশনেই দেখি কত শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী আসিয়া আমার সঙ্গে "যেচে" আলাপ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে কখনও দেখি নাই। কিন্তু তাঁহারা আমার নাম শুনিয়াছেন। সকলের মুখেই এক কথা "আপনি আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে যে সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহার জন্য আমরা সকলেই গৌরবান্বিত। আপনাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

আমি আর একবার শ্বেতাঙ্গদিগের "ভালবাসার অত্যাচারে" পড়িয়াছিলাম। ইহাঁরা আমার সঙ্গে অনেক সময়ে গায়ে পড়িয়া

আলাপ করেন, সম্মান করেন, ভোজ দেন। আমি তাহাতে বড়ই বিব্রত বোধ করি। একদিন উত্তর অঞ্চলে রেলে যাইতেছিলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত থাকায় বেশী পয়সা দিয়া শুইবার কামরার জন্য টিকিট করিয়াছিলাম। রেলগাড়ীর এই কামরাগুলিকে "পুলম্যান শ্লীপার" বলে। গাড়ীতে উঠিয়াই দেখি দুইজন ইয়াঙ্কি রমণী। ইহাঁদিগকে আমি চিনিতাম। ইহাঁরা বোষ্টন-নগরের বড়ঘরের মেয়ে। ইহাঁরা আমাকে তাঁহাদের কামরায়ই জায়গা দিলেন। আমি ভাবিলাম,—ইহাঁরা বোধ হয় দক্ষিণ অঞ্চলের আদব কায়দা জানেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের উপরোধে সেই কামরাতেই গেলাম। পরে দেখি, ইহাঁদের আদেশ অনুসারে গাড়ীর হোটেলওয়ালা খানা আনিয়া হাজির করিল। আমি বড়ই লজ্জিত হইতেছিলাম। গাড়ীর মধ্যে অনেক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ছিলেন। তাঁহারা আমাদের দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং কাণাঘুষা করিতে লাগিলেন। আমি রমণীদ্বয়ের নিকট বিদায় চাহিলাম। তাঁহারা কোন মতেই ছাড়িলেন না। আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে এক টেবিলে নৈশভোজন করিতে হইল!

কেবল তাহাই নহে। তাঁহাদের একজনের ব্যাগে নূতন ফ্যাসানের একপ্রকার উৎকৃষ্ট চা ছিল। তিনি জানিতেন হোটেলের বাবুরচি সে চা কখনও দেখে নাই। সুতরাং তাহারা উহা ভাল করিয়া তৈয়ারী করিতে পারিবে না। এজন্য তিনি নিজেই উঠিয়া গিয়া হোটেল হইতে চা তৈয়ারী করিয়া আনিলেন। আমার জন্য শ্বেতাঙ্গদিগের এত আয়োজন! প্রায় ১॥-২ ঘণ্টা

ধরিয়া গল্প করিতে করিতে খানা খাওয়া শেষ হইল। জীবনে আর কখনও আমি এতক্ষণ ধরিয়া খানা খাই নাই। খাওয়ার পরই আমি ধূমপান করিবার জন্য ওখান হইতে অন্য ঘরে উঠিয়া গেলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচা গেল। কিন্তু সেইখানে গিয়াই দেখি শ্বেতাঙ্গ পুরুষেরা আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। সকলেই আমার সঙ্গে আলাপ করিল। আমার টাস্কেজীর কথা তুলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতে লাগিল।

আমার ছাত্রদিগকে আমি সর্ব্বদাই বুঝাইয়া থাকি, "দেখ, এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমি সত্য। ইহার শিক্ষক ও পরিচালকগণ সকলেই আমার বন্ধু বা পুরাতন ছাত্র এবং নিজ হাতে তৈয়ারী করা লোক, ইহাও সত্য। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আমরা সকলেই ইহার সেবক ও ভৃত্য মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, এই বিদ্যালয় তোমাদের, তোমরাই ইহার সুনাম কুনামের জন্য দায়ী। ইহার উন্নতি অবনতিতে তোমাদেরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল। তোমরা আমাকে তোমাদের শাসন-কর্ত্তা মনে করিও না। তোমাদের একজন প্রবীণ বন্ধু বা অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করিও। কিন্তু বিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে সকল বিষয়ে তোমাদিগকেই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।" আমি এগুলি কেবল কথার কথা বলিতাম না—নানা উপায়ে ছাত্রদিগকে দায়িত্বের মধ্যে ফেলিতাম। এমন সব ঘটনাচক্র সৃষ্টি করিয়া তুলিতাম যাহাতে ছাত্রেরা নিজ নিজ কর্তৃত্ব ফলাইবার সুযোগ

পাইত। তাহারা বুঝিতে পারিত যে, সত্যসত্যই তাহারা বিদ্যালয়ের জন্য দায়ী।

আমি সরলভাবে ছাত্রদিগের সঙ্গে মিশি। তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ করি—তাহাদের মতানুসারে কার্য্যও করি। তাহাদের সঙ্গে আলোচনা না করিয়া বিদ্যালয়ের ছোট বড় কোন কাজেই আমি হাত দিই না। বৎসরে ৩।৪ বার ছাত্রেরা আমার নিকট পত্র দ্বারা বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রস্তাব লিখিয়া পাঠায়। এই নিয়ম আমিই করিয়া দিয়াছি। এই সকল প্রস্তাব পড়িয়া আমার নিজের অনেক গলদ বুঝিতে পারি—এবং বিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে আরও সতর্ক হই। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাই। খোলাখুলি অনেক বিষয় আলোচিত হয়। আমাদের ভুল এবং অসম্পূর্ণতাগুলি সংশোধন করিবার উপায় নির্দ্ধারিত হয়—পরে সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকি। অধিকন্তু, ছাত্রদিগের অনেক আলোচনা-সমিতি আছে। সেখানেও বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা তর্কপ্রশ্ন উঠে। তাহাতে আমি যোগদান করিয়া অনেক নূতন কথা শিখিতে পারি।

ছাত্রদের পরামর্শ অনুসারে কাজ যখন হইতে থাকে তখন তাহারা যার পর নাই আনন্দিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানও বাড়িতে থাকে। তখন আবোল তাবোল বকিতে, অথবা বিশেষ চিন্তা না করিয়া যাহা তাহা বলিয়া ফেলিতে তাহারা পারে না। যাহাদের কথার দাম নাই তাহারা অনর্থক বাক্যব্যয় করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু টাস্কেজীতে ছাত্রেরা যে কথা বলে সেই কথা

অনুসারে সত্য সত্যই কাজ হইয়া থাকে। কাজেই তাহারা সংযত, ধীর ও গম্ভীরভাবে সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়। এইরূপে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিতে করিতে ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ব-জ্ঞান সঞ্চিত হয়। ক্রমশঃ তাহারা বড় বড় কাজ করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে।

যত লোকের মধ্যে এই কর্ত্তৃত্ববোধ জাগান যায় ততই সমাজের মঙ্গল। সকল মানুষকেই বুঝান উচিত, "তুমি মানুষ। তোমার নিজের মাথা খাটাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, তোমার স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি আছে। তুমি পরের সাহায্য না লইয়া কাজ ও চিন্তা করিতে থাক। তুমি কর্ত্তারূপে নানা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিতে লাগিয়া যাও। তুমি কি সর্ব্বদা অপর লোকের কেরাণীমাত্র থাকিবে? তুমি কি পরকীয় চিন্তার অনুবাদক-মাত্ররূপে জীবন কাটাইবে? না। তুমিও লোকজন খাটাইতে শিখ, তুমিও দশজনকে কাজে নামাইতে চেষ্টা কর। তুমি মানুষ, তুমি কর্ম্মকর্ত্তা হইবার আকাঙ্ক্ষা কর, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার জন্য উদ্যোগী হও।"

আমার বিশ্বাস, কুলী ও মজুরমহলে যদি এইরূপে কর্ত্তৃত্ববোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান জাগান যায়, তাহা হইলে সমাজে বহু ধর্ম্মঘট, কুলীবিভ্রাট, অপব্যয়, উৎপীড়ন ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ধনবান্ মহাজনেরা এবং কলকারখানার মালিক মহাশয়েরা তাঁহাদের কর্ম্মচারী কেরাণী এবং শ্রমজীবীদিগকে এই কথা বলিতে অভ্যস্ত হইবেন না কি? একবার যদি তাঁহারা নিজেদের অহঙ্কার

ত্যাগ করিয়া কুলী মজুর কেরাণী ও কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে মিশিতে পারেন তাহা হইলে সমস্ত কারবার ও কারখানার মধ্যে একটা নূতন প্রাণ সৃষ্টি হয়। মালিকেরা বেতনপ্রাপ্ত কর্ম্মীদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিলে আপনা আপনিই ইহারা কারবারটিকে কৃতকার্য্য করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইবে। তাহারা ইহাকে আপনার নিজের বলিয়া জ্ঞান করিবে।

এই আত্মবোধ জাগাইবার উপায় আর কিছুই নয়। কেরাণী, কুলী সকলেরই কর্ত্তৃত্ববোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জন্মিলে এই কার্য্য সহজেই সিদ্ধ হইবে। এজন্য ইহাদের সঙ্গে মালিক মহাশয়-দিগের সরল আলোচনা, কথাবার্ত্তা, পরামর্শ গ্রহণ এবং ভাবের আদান প্রদান আবশ্যক। অজস্র টাকা খরচ করিয়া যে ফললাভ না হয়, সহৃদয়তার দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, মুখের কথায় তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়, বিশ্বাস করিলে তাহা অপেক্ষা বেশী কাজ হয়। আমি যদি কখনও কাহাকে বিশ্বাস করি, সে কখনই আমাকে বিপদে ফেলিতে পারিবে না। সে যদি বুঝে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি কোন কাজে নামিয়াছি, সে যথাসাধ্য সেই কাজে লাগিয়া থাকিবে। বিশ্বাস সর্ব্বত্রই জয়লাভ করে—অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধ চিত্ততায় কখনও কাজ হয় না। বিশ্বাসের ক্ষমতা সকল সমাজেই দেখা যায়। নিগ্রোকে বিশ্বাস কর, তাহার দ্বারা অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। কুলী মজুর-দিগের উপর যথার্থভাবে নির্ভর কর, তোমার কারবার কখনই বিফল হইবে না। এই বুঝিয়াই আমি আমার ছাত্রগণকে এত

বিশ্বাস করিতাম—তাহাদের উপর সকল বিষয়ে নির্ভর করিতাম—তাহাদিগকেই বিদ্যালয়ের কর্ত্তা বিবেচনা করিতাম—তাহাদের কর্ত্তৃত্বে আমরা সুফলই পাইয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর সবই প্রস্তুত করিয়াছে। এখন বলিতেছি যে, তাহারা তাহাদের ব্যবহারোপযোগী টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ডেস্ক ইত্যাদিও প্রস্তুত করিয়া লইয়াছে। প্রথমে আমাদের ছাত্রাবাসে খাট ছিল না। একখানা করিয়া খাট ছাত্রেরা তৈয়ারী করিতে লাগিল। ততদিন তাহারা মাটিতেই শুইয়া থাকিত। এদিকে গদি বা তোষকও ছিল না। তাহাও নিজ হাতে তাহারাই করিয়া লইল। কতকগুলি সস্তা কাপড়ের বস্তা কিনিয়া আনা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে সালপাতা ভরিয়া গদি তৈয়ার হইত। প্রথম প্রথম এগুলি বড় অপরিষ্কার প্রস্তুত হইয়াছিল। গদির ভিতর হইতে গোঁজ বাহির হইয়া থাকিত। শুইতে গেলে এগুলি গায়ে লাগিত। ক্রমশঃ গদি তৈয়ারী ব্যবসায় আমরা বেশ দক্ষতালাভ করিয়াছি। আজকাল টাস্কেজী-বিদ্যালয়ে গদি, তোষক তৈয়ারীর কাজ খুব ভাল রকমই চলে। আমাদের গদির কারখানার সুনামও বেশ প্রচারিত হইয়াছে। ফলতঃ আমাদের একটা বড় আয়ের উপায় এই গদি-খানা হইতে দেখিতে পাইতেছি।

এইরূপে ছাত্রাবাস, বোর্ডিং-গৃহ, ভোজনালয়, রন্ধনশালা ইত্যাদি সকল ঘরের জন্য সকল প্রকার আসবাবই আমাদের ছাত্রেরা নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লইল—প্রথম অবস্থায় প্রায়

সবই বিশ্রী ও কদাকার হইত। পরে কারিগরিতে উন্নতি হইয়াছে। এখন সব জিনিষেই উচ্চ অঙ্গের শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং বিদ্যালয়ের আব্‌হাওয়ার মধ্যে সৌন্দর্য্য বেশ আছে। অধিকন্তু এই সকল কারবার হইতে ব্যবসায়ও চলিতেছে—তাহাতে বিদ্যালয় চালাইবার খরচ কিছু কিছু উঠিয়া থাকে।

আমি ছাত্রাবাসের প্রথম অবস্থায় ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতাম। তাহাদিগকে প্রায়ই বলিতাম, "আমরা গরিব—থালাবাটি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাই। আমাদের চেয়ার টেবিল, গদি ইত্যাদি সবই বিশ্রী ও কোন রকমে চলনসই। লোকে এগুলি দেখিয়া দুঃখিত হইতে পারে—কিন্তু কেহই নিন্দা করিবে না। তাহারা জানে, পয়সা থাকিলেই আমরা বেশী দামে চক্‌চকে জিনিষ তৈয়ারী করিতে বা কিনিতে পারিতাম। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ত পয়সার জিনিষ নয়। উহা আমাদের যার যার নিজের হাতে! ইহার জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। আমরা যদি অপরিষ্কারভাবে গৃহস্থালী চালাই, বা চলিফিরি তাহার জন্য লোকেরা আমাদিগকে নিন্দা করিবে, তিরস্কার করিবে। এ-নিন্দা ও তিরস্কার এড়াইবার কোন উপায় থাকিবে না। আমাদের স্বভাবই ইহার জন্য দায়ী। অতএব লোকে যেন আমাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখে।"

এই শরীর-পালন ও স্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কে আর একটা কথা বলিব। আমি দাঁত মাজার গুণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা

উপদেশ দিয়া থাকি। আমি আমার গুরুদেব আর্মষ্ট্রঙ্গের নিকট দাঁত মাজার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা পাইয়াছি। তিনি বলিতেন, 'দাঁত মাজা একটা ধর্ম্মবিশেষ'। আমি টাস্কেজীর ছাত্রাবাসে এই ধর্ম্ম প্রচারে কোন ত্রুটী করিতাম না। তাহার পর দুইটা চাদরের মধ্যে কেমন করিয়া শুইতে হয় ছাত্রদিগকে তাহাও শিখাইতাম। আমার ছাত্রাবস্থায় এ বিষয়ে যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল আমার বেশ মনে আছে। তাহা ছাড়া জামা পরিষ্কার রাখা, কোটে বোতাম লাগান ইত্যাদি বিষয়ও ছাত্রদিগকে শিখাইতে হইত। এইরূপে উৎসব, আমোদ, কষ্টস্বীকার, শীত ভোগ, খাওয়া, পরা, চলা, ফেরা, লেন দেন ইত্যাদি জীবনের নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতির ভিতর দিয়া ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

আমার টাকা আসে কোথা হ'তে ?

পোর্টার হল নির্ম্মিত হইবার পর ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা খুব বাড়িতে লাগিল। এজন্য আমাদের চতুঃসীমার বাহিরে কতকগুলি কাঠের কুঠরী ভাড়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতেও কুলাইল না। অগত্যা আমরা আর একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য উদ্গ্রীব হইলাম।

এই গৃহের আনুমানিক ব্যয় স্থির করা গেল। দেখিলাম ৩০,০০০৲ টাকার কমে কোন মতেই এ-ঘর তৈয়ারী হইতে পারে না। সুতরাং এবার পোর্টার হল অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

প্রথমেই আমরা বাড়ীটার নাম ঠিক করিয়া লইলাম। সকলে মিলিয়া সাব্যস্ত করিলাম—'আলাবামা-ভবন' নাম দিলে ঐ প্রদেশের সকল অধিবাসীর সাহানুভূতি আকৃষ্ট করা যাইবে। সুতরাং আলাবামা-ভবনের জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। ছাত্রেরা মাটী খুঁড়িয়া জমি পরিষ্কার করিতে লাগিল—দেওয়ালের জন্য ভিত্তির গর্ত্ত খুঁড়া হইতে থাকিল। অথচ আমাদের হাতে

তখনও পয়সা নাই। শ্রীমতী ডেভিড্‌সন আমার টাস্কেজীর পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষার ঝুলি লইয়া বাহির হইলেন।

অর্থাভাবে আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি এমন সময়ে আমার গুরুদেব মহাপ্রাণ আর্মষ্ট্রঙ্গের একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমার সঙ্গে উত্তরপ্রান্তের ইয়াঙ্কিমহলে অর্থ সংগ্রহের জন্য বাহির হইতে পারিবে? একমাস লাগিবে। যদি পার শীঘ্রই হ্যাম্পটনে চলিয়া এস।" তৎক্ষণাৎ আমি হ্যাম্পটনে চলিয়া গেলাম। যাইয়াই দেখি আমাদের ভিক্ষা আদায়ের জন্য আর্মষ্ট্রঙ্গ সকল ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি উত্তর প্রান্তের স্থানে স্থানে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে আমরা টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহে সেই সকল স্থানে উপস্থিত হইব। হ্যাম্পটনের গায়কদলের দুই চারিজন আমাদের সঙ্গে শফরে বাহির হইল। এই অভিযানের সমস্ত খরচ হ্যাম্পটনের বিদ্যালয় হইতে বহন করা হইবে তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

আর্মষ্ট্রঙ্গের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এই উপায়ে আমাকে ইয়াঙ্কিমহলে সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন ভাবিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলাবামা-ভবনের জন্যও টাকা উঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। আর্মষ্ট্রঙ্গের উদারতা ও ত্যাগশীলতা আমাদের জন্য আরও কতবার দেখিয়াছি।

উত্তরপ্রান্তে বক্তৃতা করিবার সময়ে আর্মষ্ট্রঙ্গের একটা উপদেশ আমি সর্ব্বদা মনে রাখিতাম। তিনি বলিতেন, "ফাঁকা কথা কখনও বলিবে না। প্রত্যেক শব্দেই যেন একটা নূতন

বস্তু, নূতন ভাব মনের মধ্যে আসে। শ্রোতারা যেন বুঝে যে, কতকগুলি কাজের কথা বলিতেছ।" বক্তৃতা করিবার নিয়ম ইহা অপেক্ষা আর কি ভাল হইতে পারে ?

নিউ-ইয়র্ক, ব্রুকলিন, বোষ্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং অন্যান্য বড় সহরে টাস্কেজীর জন্য সভা হইল। সভায় অনেক লোক আসিত। আমরা দুই জনেই বক্তৃতা করিতাম। টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী বিবৃত হইত। সঙ্গে সঙ্গে আলাবামাভবনের জন্যও ভিক্ষা করা হইত। লোকেরা সন্তুষ্টই হইত বুঝিতাম। একমাস এইরূপ সভা করিয়া মন্দ টাকা উঠে নাই। আমাদের প্রচার-কার্য্যও খুব ভাল হইয়াছিল।

পরে আমি অনেকবার একাকী ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উত্তর অঞ্চলে বাহির হইয়াছি। বলিতে কি, গত ১৫ বৎসরের ভিতর অধিকাংশ কালই আমি টাস্কেজীর বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছি। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বেশী রাখিতে পারি নাই। আমাদের নূতন নূতন বিভাগের উন্নতি করিবার জন্য অর্থাভাবে যুক্ত-রাজ্যের প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। এই বার আমরা অর্থসংগ্রহের অভিজ্ঞতা পাঠকগণকে কিছু বলিব।

পরোপকারী এবং লোক-হিত-ব্রতধারী ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থ সংগ্রহে বাহির হইতে হয়। বিদ্যাদানের জন্য, অথবা দরিদ্রের অভাব নিবারণের জন্য—যে জন্যই হউক, ভিক্ষা না করিলে বড় কাজ কখনই সমাধা হয় না। এরূপ বহু "ভিক্ষুকে"র সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে আমার দেখা হইয়াছে। তাঁহারা অনেকেই আমাকে

জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "মহাশয়, আপনি এত টাকা পান কোথা হইতে ? লোকেরা আপনার কথায় কাণ দেয় কেন ? তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আপনি কিরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন ? আপনার অর্থসংগ্রহ-কার্য্যের কোন নিয়ম বা প্রণালী আছে কি ? আমাদিগকে পরমর্শ দিলে বড়ই উপকৃত ও বাধিত হইব। কারণ আমরাও দুই একটা কাজের ভার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। লোকের সহানুভূতি কোন মতেই আকৃষ্ট করিতে পারিতেছি না। আপনার সঙ্গে দৈবক্রমে দেখা হইল ভালই হইয়াছে। আপনার প্রদর্শিত পথে চলিতে পারিলে আমাদের অর্থ-দৈন্য বোধ হয় ঘুচিতে পারিবে।"

পরোপকার ও মানবসেবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা-বৃত্তির জন্য কোন নিয়ম আছে কি না বলিতে পারি না। আমি সংসারে ঘুরিয়া "ভিক্ষা-বিজ্ঞানের" দুইটি সূত্র মাত্র আবিষ্কার করিয়াছি। প্রথমতঃ তুমি যে কাজটা করিতেছ তাহা জগতে প্রচার করা আবশ্যক। এই প্রচার কার্য্যে তন্ময় হইয়া যাওয়া প্রয়োজন। নিজের সমগ্র চিন্তা এই প্রচারে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অধিকন্তু কেবল মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষের নিকট কার্য্যের পরিচয় দিলে চলিবে না। সাধারণ জনগণও যেমন তোমার আরব্ধ অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানিতে ও শুনিতে পায়। এজন্য দেশের মধ্যে যতগুলি কর্ম্মকেন্দ্র, সভা সমিতি, পরিষৎ, প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ বর্ত্তমান আছে সকলগুলির ভিতরই তোমার কর্ম্মের আন্দোলন পৌঁছাইবার চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রচারের ফল কি হইতেছে তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। ধর্ম্মভাবে প্রচারকার্য্যে লাগিয়া যাও। টাকা না পাইলেও দুঃখিত হইবার প্রয়োজন নাই। উদ্বেগে শরীর অবসন্ন হয়, চিত্তবিক্ষিপ্ত হয়—কার্য্য করিবার ক্ষমতা কমিয়া আসে।

ভিক্ষাবিজ্ঞানের এই দ্বিতীয় সূত্র কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়ে ধার করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছি। পাওনাদারের বিল উপস্থিত—টাকা দিবার ক্ষমতা নাই। সেই সময়ে রাত্রে বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ না করিয়া থাকা অসম্ভব। আমি অনেক স্থলেই আমার চিত্তের শান্তিরক্ষা করিতে পারি নাই—বহুরাত্রি না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। রাস্তায় বা বারান্দায় পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। অবশ্য এত দুরবস্থার মধ্যেও আমার ধীরতা এবং গাম্ভীর্য্য অনেকটাই ছিল। তাহা না হইলে এতদিন সহ্য করিয়া এককাজে লাগিয়া থাকিতে পারিতাম কি ?

সংসার দেখিয়া আমার জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, জগতের যত বড় বড় কাজ সবই এইরূপ স্থিরচিত্ত সহিষ্ণুতাসম্পন্ন গাম্ভীর্য্য-বিশিষ্ট কর্ম্মবীরগণের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মাথার বোঝা বড় কম থাকে না। অসাধ্যসাধনেই তাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন —নিতান্ত 'না'কেও তাঁহাদের 'হাঁ'তে পরিণত করিতে হইয়াছে। নৈরাশ্য, বিফলতা এবং দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহাদিগকে বহু ব্যয়সাপেক্ষ বিশালকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা শান্ত, গম্ভীর এবং লোকপ্রিয় ও সৌজন্যবান্ রহিয়াছেন।

এই চরিত্রবলেই জগৎকে পদানত করা যায়—বিশ্বশক্তিকে স্ববশে আনা যায়।

যখনই কোন মহৎকর্ম্ম আরম্ভ কর, তখনই উহাতে তন্ময় হইয়া যাইবে—সেই কর্ম্মের মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া ফেলিবে নিজকে এই উপায়ে ভুলিতে না পারিলে অর্থাৎ কার্য্যকে তোমার কৃতিত্ব অপেক্ষা বেশী ভাল না বাসিলে তুমি সুখ পাইবে না—চিত্তের উদ্বেগও কমিবে না। তোমার জীবনের লক্ষ্যকে আন্তরিক ভাবে ভালবাস, নিজের অহঙ্কার ভুলিয়া যাও,—দেখিবে কর্ম্মের সুফলাভাবেও তুমি দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিতেছ। কিন্তু যদি নিজকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে না পার, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মের বিফলতায় তুমি পাগল হইয়া পড়িবে।

অতএব নিজকে ভুলিতে শিখ—নিজের অহঙ্কার বিসর্জ্জন দাও। যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ তাহাকে ধ্যান করিতে করিতে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাও। তবেই দেখিবে, অল্পমাত্র ফললাভেও চিত্তে শান্তি থাকিবে। চোখের সম্মুখে তোমার আরব্ধ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া গেলেও তুমি আনন্দে থাকিতে পারিবে, এবং প্রয়োজন হইলে নূতন উৎসাহে নব নব কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিবে।

আমি টাস্কেজীর জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া দেখিয়াছি, অনেক লোকে ধনী লোকদিগকে তিরস্কার করেন। তাঁহারা বলেন, "কি বলিব মহাশয়, এই বড় লোকগুলা যদি মানুষ হইত তাহা হইলে আমাদের একটা দুইটা অনুষ্ঠান কেন, একসঙ্গে ৫০টা কর্ম্মই

অনায়াসে চলিতে পারিত। ইহাঁরা বিলাসসাগরে সাঁতার কাটিতে-ছেন—নিজ সুখভোগে অর্থের অপব্যয় করিতেছেন—অথচ দশের কাজে এক পয়সাও দিতে নারাজ।" ইহাঁরা সকলেই মহাদুঃখে এরূপ কথা বলিয়া থাকেন। ইহাঁদের উদ্দেশ্য ভালই—কারণ ইহাঁরা লোকহিতব্রতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইহাঁদের বিষয়টা একটুকু গভীরভাবে না বুঝিবার দোষ আছে।

আমি এইরূপ পরোপকার ব্রতধারী লোকসেবক ভিক্ষুকগণকে বলিয়া থাকি, "মহাশয়, মনে করুন, দেশে একজনও ধনী লোক নাই। মনে করুন বড়লোকদিগের টাকাকড়ি সবই সংসারের সকল লোকের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল। ভাবিয়া দেখুন ত, তখন দেশের অবস্থা কি হইবে ? এই যে এত বড় বড় কারবার, কারখানা, ফ্যাক্টরী, জাহাজ-কোম্পানী, চাষ বাস ইত্যাদি কত কি দেখিতেছেন—এই সমুদয়ের একটাও থাকিবে কি ? এইগুলি না থাকিলে এত কুলীমজুর কেরাণী কর্ম্মচারীর অন্নসংস্থান হইবে কি ? দেশময় দারিদ্র্য দুঃখ ছড়াইয়া পড়িবে যে ! দেশের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সবই লুপ্ত হইয়া যাইবে যে ! সমাজের লক্ষ্মীশ্রী কোথায়ও থাকিবে না। বড় লোকেরা কি সত্য সত্যই সমাজের পাপ ও কলঙ্কস্বরূপ ?"

ধনীলোক সম্বন্ধে আমার আরও অনেক বক্তব্য আছে। আমি আমার 'ভিক্ষুক' বন্ধুগণকে বলিয়া থাকি, "কত শত লোক ধনী মহাত্মাদের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, আপনারা তাহার খবর রাখেন ? প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিরই গুপ্তদান অসংখ্য আছে। সকল

দানের খবরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। আপনি হয়ত একজনের নিকট কিছু পাইলেন না। কিন্তু তাঁহা বলিয়াই তাঁহাকে আপনি নির্দ্দয়, বিলাসী বা স্বার্থপর বিবেচনা করেন কেন? আপনার অজ্ঞাতসারে তিনি হয়ত কত দরিদ্রের অন্ন বস্ত্র সংস্থান করিতেছেন।"

আমি সত্য কথা বলিতে পারি, আমেরিকার ধনী ব্যক্তিগণকে প্রতিদিন অন্ততঃ ২০।২২ জন নূতন নূতন লোকের সাহায্য করিতে হয়। আমি বড় বড় সহরের নামজাদা লোকদের বাড়ীতে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া দেখিয়াছি—আমার মত আরও ১২ জন লোক তাঁহাদের নিজ নিজ প্রস্তাব লইয়া হাজির হইয়াছেন। এই ত গেল সাক্ষাতে ভিক্ষার কথা। তাহা ছাড়া চিঠিপত্রের দ্বারা কত দূর দূর স্থান হইতে লোকেরা বড় লোকের নাম শুনিয়া ভিক্ষা-প্রার্থী হয় তাহার সন্ধান কে রাখে?

তার পর সৎকর্ম্মের নীরব বন্ধু আমেরিকায় কত আছেন তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। তাঁহাদের নাম জগতে কেহই জানিতে পায় না। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিয়া তাঁহারা দরিদ্রের সুখবিধান করিতেছেন। আমি ১০।১২ ব্যক্তির সন্ধান পাইয়াছি—তাঁহারা লোকসমাজে বড়ই অর্থপিশাচ, লোভী, হৃদয়-হীন বলিয়া খ্যাত। অথচ প্রতি বৎসর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তাঁহারা অজস্র টাকার সদ্ব্যয় করিতেছেন। নিউ-ইয়র্কেই এইরূপ পরদুঃখে দুঃখী অথচ নীরব দাতা দুই জনকে আমি জানি। ইহাঁরা ইয়াঙ্কি রমণী। তাঁহারা গত ৮ বৎসর ধরিয়া

আমাকে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে এবং অন্যান্য কাজে অর্থসাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের অন্যান্য দানও আছে।

আজ আমি একটা কথা খোলাখুলি বলিব। অনেক কোটি টাকা-আমার হাত দিয়া টাস্কেজীর জন্য জলের মত খরচ হইয়াছে —একথা কাহারও অজানা নাই। কিন্তু আমি বলিতে চাহি— ইহা আমার "ভিক্ষা"লব্ধ টাকা নহে! আমি কখনও 'ভিক্ষা' করি নাই—আমি 'ভিক্ষুক' নহি! আমার অর্থসংগ্রহ-কার্য্যকে আমি কোন মতেই 'ভিক্ষা,' 'ভিক্ষুকবৃত্তি' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতে পারিব না।

আমি জানি, 'ভিক্ষা' করিলে টাকা পাওয়া যায় না। দিন-রাত্রি বড় লোকের দরবারে বসিয়া অর্থ সাহায্যের কথা পাড়িলে অর্থ সংগ্রহ হয় না। যাঁহারা ঐরূপ করিয়া থাকেন তাঁহারা আত্মসম্মানবোধহীন—সত্য সত্যই ভিক্ষুক। কিন্তু আমার আত্মসম্মানবোধ সর্ব্বদাই থাকে—আমি নিজকে কখনও কাহার নিকট ছোট করি না। আমি বুঝি, মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, মানুষ মাত্রেরই সেবা-প্রবৃত্তি আছে, মানুষ মাত্রেই লোকের উপকার করিতে পারিলে সুখী হয়। সুতরাং কোন স্থানে একটা ভাল কাজ হইতেছে,—একথা জানিতে পারিলেই সকলে সেদিকে দৃষ্টি দেয়। যাহার যে ক্ষমতা, সে সেই উপায়ে তাহার সাহায্য করে। ধনী ধন দান করিতে উৎসাহী হন। বিদ্বান্ তাহার জন্য লোক-সমাজে সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া আত্ম-

প্রসাদ লাভ করেন। যাহাদের শারীরিক শক্তিই একমাত্র সম্বল তাহারা সেই কর্ম্মের জন্য হাতে পায়ে খাটিয়া আনন্দিত হয়। আমি আরও বুঝি যে, দাতা সংসারে অনেকেই আছেন, কিন্তু দান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকই খুব অল্প। টাকা পাওয়া খুব সহজ—কিন্তু টাকা পাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করাই বড় কঠিন। হায়, যাঁহারা বড় লোকের নিকট টাকা আদায় করিতে যান তাঁহারা যদি এই কথাগুলি মনে রাখিতেন তাহা হইলে তাঁহারাও হতাশ হইতেন না, এবং বড়লোকদিগকেও তিরস্কার করিতেন না।

আমি অর্থসংগ্রহের দায়িত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। টাকার কথা লোকজনকে বেশী বলি না—কার্য্যের কথাই বেশী বলি। কোন কার্য্যের সুফল কুফল, এদিক ওদিক, কর্ম্ম-প্রণালী, সমাজের অন্যান্য কার্য্য ও চিন্তার সঙ্গে আমার আরব্ধ কর্ম্ম ও চিন্তার সম্বন্ধ, আমার জীবনের লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয়েই আমি লোকজনের সঙ্গে আলোচনা করি। এই উপায়ে ধনী নির্ধন সকল সমাজেই আমি প্রচারকের কার্য্য করিয়া থাকি। এইরূপ নানাবিধ কথা-প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি ভিক্ষা করিতে বড়ই নারাজ। আমি কোন দিনই ভিক্ষা করি নাই। আমি ভিক্ষুক নহি। আমি কর্ম্মের উপাসক—আমি কর্ম্মের প্রচারক। আমি সর্ব্বত্র সদ্ভাবের বিস্তারই করিয়াছি—আমি সকল মহলেই শিক্ষা-প্রচারক রূপে পরিচিত। আমার অর্থসংগ্রহ এই লোক-শিক্ষা-বিস্তারের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র।

অর্থসংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে পরোক্ষভাবে একটা মস্ত লাভ হয়। সাংসারিক জ্ঞান খুব বাড়িয়া যায়—লোকচরিত্র বুঝিতে পারা যায়। অনেক লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়—নানা কথা বুঝা যায়—নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। তাহা ছাড়া জগতের অনেক গুপ্ত মহাপুরুষ এবং চরিত্রবান্ নরনারীর সাক্ষাৎ লাভ হয়। যাঁহাদের নাম খবরের কাগজে উঠে না অথচ যাঁহারা পরহিত করিতে পারিলেই সুখী হন এরূপ অনেক মহাত্মার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল লোকের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলিতে পারাও মহা সৌভাগ্যের বিষয়। আমি এরূপ দাতা ব্যক্তির সংশ্রবে আসিয়া বহুবার জীবন ধন্য করিয়াছি। আমি বোষ্টন-নগরের দুই একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এক বাড়ীতে গৃহস্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নিকট আমার সংবাদ পাঠান হইল। ইতিমধ্যে স্বামী আসিয়া উপস্থিত। আমাকে দেখিয়াই বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি চাই ?" আমি আমার উদ্দেশ্য বুঝাইতে গেলাম। তিনি আরও ক্ষেপিয়া উঠিলেন। আমি আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলাম। এই বাড়ীর নিকটেই আর একজন ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। আমার কথা শুনিবামাত্রই তিনি বেশ মোটা টাকার জন্য চেক্ সহি করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদদিবারও অবসর পাইলাম না। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমাদেরই কার্য্য করিতেছেন। মহাশয়, আপনাকে সাহায্য করিবার সুযোগ পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।"

আমি বলিতে পারি যে, সংসার হইতে প্রথম শ্রেণীর লোক কমিয়া আসিতেছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক সংখ্যাই বাড়িতেছে। ধনী লোকেরা পরহিতব্রতধারী ব্যক্তিগণকে আর 'ভিক্ষুক' বা উৎপাতস্বরূপ মনে করেন না। তাঁহারা আমাদের মত লোককে সৎকর্ম্মের যন্ত্র ও উপলক্ষ্যস্বরূপ শ্রদ্ধা করেন। তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য কর্ম্মের কিয়দংশ আমরা করিতেছি—এইরূপই আজকাল-কার ধনী মহাত্মাগণের ধারণা জন্মিতেছে।

বোষ্টন-নগরে যাঁহারই বাড়ীতে আমি প্রার্থী হইয়াছি, তিনিই আমাকে বলিয়াছেন, "আপনার এই মহৎকর্ম্মের জন্য আমার নিকটেও আসিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। আপনার অনুগ্রহে আমিও একটা সৎকার্য্যে আমার ক্ষুদ্রশক্তি প্রয়োগের সুযোগ পাইলাম। এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে আসিলে যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।" ধনী ব্যক্তিরা ধনদানের উপযুক্ত সুযোগ খুঁজিয়া থাকেন—এই বিশ্বাসই আমার দিন দিন বাড়িতেছে।

প্রথম প্রথম অর্থসংগ্রহে বাহির হইয়া বড় কষ্টেই পড়িতাম। মনে আছে তখন উত্তর অঞ্চলের সহরে সহরে পল্লীতে পল্লীতে দিনরাত খাটিয়াও একটাকা মাত্র পাইতাম না। অনেক লোকের নিকট বড় আশা করিয়া যাইতাম কিন্তু তাঁহারা এক পয়সাও না দিয়া বিদায় করিতেন। এইরূপে নিষ্ফলভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিত। হঠাৎ দেখিতাম, যাহার নিকট কখনও কিছুমাত্র আশা করিতে পারি নাই, সেই ব্যক্তিই

সাহায্য দান করিয়া ভগ্নহৃদয়ে আশার আলোক বিকিরণ করিতেন।

একদিন নানা লোকের পরামর্শে কনেক্টিকাট প্রদেশের এক পল্লীতে ধনী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইলাম। সহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে তাঁহার গৃহ। সেইখানে শীতে ঝড়ে হাঁটিয়া গিয়া দেখা করিলাম। তিনি কত কথাই পাড়িলেন—অনেক গল্প হইল। কিন্তু একটি পয়সাও দিলেন না। আমি বুঝিলাম ইহাঁর নিকট প্রচার করাও কর্ত্তব্য ছিল। তাহাই করিয়াছি। নাই বা পাইলাম কিছু সাহায্য।

কিন্তু দুই বৎসর পরে এই ব্যক্তি আমার নিকট টাস্কেজীর ঠিকানায় পত্র লিখিলেন, "মহাশয়, এই পত্রের সঙ্গে নিউ ইয়র্ক ব্যাঙ্কের উপর আপনার নামে একখানা চেক্ সহি করিয়া দিলাম। চেকের মূল্য ৩০,০০০৲। আমি এই টাকা আপনার বিদ্যালয়ের জন্য উইল করিয়া রাখিয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়াছি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই ইহা দিয়া যাওয়া ভাল। আপনি দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে কথা আপনার মনে থাকিতে পারে। সেদিনকার কথোপকথন আমি বেশ মনে রাখিয়াছি।"

এই ৩০,০০০৲ টাকা আমার নিকট এক অতি দুঃসময়ে পৌঁছিয়াছিল। ইহা না পাইলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিই হইত। পাইয়া আমাদের ঘাড়ের বোঝা অনেকটা হালকা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কলিস্ হাণ্টিংডনকে রেল-বিভাগের কে না চিনে ?

তিনি আজ সমগ্র আমেরিকায় সুপ্রসিদ্ধ। তিনি আমাকে প্রথম সাহায্য করেন মাত্র ৬৲ দিয়া। মৃত্যুকালে আমাদিগকে ১৫০,০০০৲ দিয়া গিয়াছেন। এই দুই দানের মধ্যে আমরা ইঁহার নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

অনেকে বলিয়া থাকেন "টাস্কেজীর বরাত ভাল—তাই ১৫০,০০০৲ পাইয়াছে।" আমি তাঁহাদিগকে বলি, "তাহা নহে—কপালের গুণে টাকা একবার আসিতে পারে, দুইবার আসিতে পারে। কিন্তু বার বার আসে না। স্থিরভাবে নিয়মিতরূপ কর্ম্ম করিয়া উন্নতি না দেখাইতে পারিলে সংসারের লোক মজে না।" হান্টিংডনের কথা বলিলেই বুঝা যাইবে। তিনি প্রথমে ৬৲ দিয়াই মনে করিয়াছিলেন—"টাস্কেজীওয়ালারা আর বেশী পাইবার যোগ্য নয়।" আমি তাঁহার নিকট এত কম কোন মতেই আশা করি নাই। যাহা হউক আমি তখনই স্থির করিলাম যে, আমাদের কার্য্যফলে ইঁহাকে খুসী করিবই, এবং তখন তিনি উদারতার সহিতই দান করিতে বাধ্য হইবেন। সত্যই তাহা ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমশঃ দেখিতে লাগিলেন যে, টাস্কেজীর কাজ কর্ম্মে উন্নতি হইতেছে, ইহার মধ্যে নিত্য নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে—ইহারা কোন এক জায়গায় বসিয়া নাই। ঠিক সেইরূপই তিনি তাঁহার দানের মাত্রা বাড়াইয়াছিলেন। এই অনুপাতে ৬৲ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইয়াছি।

একবার সাহস করিয়া বোষ্টন-নগরের ট্রিনিটি-ধর্ম্মমন্দিরের

প্রচারক রেভারেণ্ড উইন্‌চেষ্টার ডোনাল্ড মহোদয়কে টাস্কেজীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইবার ইচ্ছায় এইরূপ করা হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে লোকজন অনেক আসিবে, বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের মধ্যেই মহাসমারোহ পড়িয়া গেল। কাজেই আমাদের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দিরে বক্তৃতার স্থানাভাব বিবেচনা করিয়া সামিয়ানা খাটাইয়া একটা ঘর তৈয়ারী করা হইল। লতাপাতা ফুলপত্রে গৃহ সুসজ্জিত করাও হইল। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পরক্ষণ হইতেই মহা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। ডোনাল্ড মহোদয় ভিজিতে লাগিলেন। আমাদের একজন আসিয়া তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিল। অনেকক্ষণ পর বৃষ্টি থামিলে আবার বক্তৃতা হইল। শেষে সভা হইয়া গেলে পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে করিতে ডোনাল্ড মহোদয় বলিলেন—'ওয়াশিংটন মহাশয়, টাস্কেজীর যে বিরাট ব্যাপার দেখিতেছি, এখানে একটা বড় ধর্ম্মমন্দির থাকা আবশ্যক।"

একথা অবশ্য প্রচারিত হইবার সময় ছিল না। মহা বিস্ময়ের কথা—পরদিন সকালেই ইটালী হইতে একখানা পত্র পাইলাম। দুই জন রমণী লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মমন্দিরের জন্য সকল অর্থব্যয়ের ভার বহন করিবেন।

সম্প্রতি য়্যাণ্ড্রু কার্ণেজি মহোদয়ের নিকট আমি ৬০,০০০৲ টাকা পাইয়াছি। এই টাকার দ্বারা গ্রন্থশালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে—তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা। এতদিন আমাদের গ্রন্থশালা ছিল না বলিলেই চলে। সেই পোড়োবাড়ীর এক কোণে কতকগুলি

আলমারী ছিল। তাহাকেই গ্রন্থশালা বলিতাম। ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র—১২ ফিট লম্বা এবং পাঁচ ফিট চৌড়া। আজ কার্ণেজির কৃপায় আমাদের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থশালা নির্ম্মিত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু কার্ণেজি মহোদয়ের অনুগ্রহ পাইলাম কি করিয়া? একদিনে তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করেন নাই। তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য আমাকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। ১৮৯০ সালে আমি তাঁহার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি আমার কার্য্যে কিছুই সাহানুভূতি দেখাইলেন না। দশ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর আমি তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখি :—

"টাস্কেজী আলাবামা,"
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯০০।

সবিনয় নিবেদন,

কয়েকদিন পূর্ব্বে আপনার ভবনে আমার সঙ্গে আপনার যে কথাবার্ত্তা হয়, তদনুসারে আপনার নিকট এই পত্র পাঠাইতেছি। আপনি আমাদের গ্রন্থশালার আবশ্যকতা বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য জানাইতেছি যে,—

১। আমাদের বিদ্যালয়ে সম্প্রতি ১১০০ ছাত্র এবং ৮৬ জন শিক্ষক ও কর্ম্মচারী এই গ্রন্থশালা ব্যবহার করিবেন। অধিকন্তু শিক্ষক ও কর্ম্মচারিগণের পরিবারস্থ লোকজন এবং আমাদের বিদ্যালয়ের সমীপস্থ প্রায় ২০০ নিগ্রো পুরুষ ও রমণী এই গ্রন্থশালা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

২। আমাদের এক্ষণে ১২,০০০ গ্রন্থ, সংবাদপত্র ইত্যাদি রহিয়াছে। এগুলি বন্ধুগণের দানে সংগৃহীত। স্থানাভাবে ইহাদিগকে রক্ষা করা যাইতেছে না। পাঠাগার না থাকায়ও গ্রন্থ-ব্যবহারের অসুবিধা ঘটিতেছে।

৩। আমাদের বিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়া অনেক ছাত্র বাহির হইয়াছে। ইহাঁরা দক্ষিণ অঞ্চলের প্রত্যেক প্রদেশেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। গ্রন্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাঁদের সাহায্যে সমগ্র নিগ্রোসমাজে সৎসাহিত্য প্রচারিত হইতে পারিবে।

৪। আমাদের প্রয়োজনীয় গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে ৬০,০০০৲ টাকা লাগিবে। ইট গড়া, মিস্ত্রীর কাজ, সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কার্য্য ইত্যাদি গৃহ-নির্ম্মাণ বিষয়ক সকল ব্যাপারই আমাদের ছাত্রগণ স্বহস্তে নিষ্পন্ন করিবে।

৫। সুতরাং আপনার দানে এক সঙ্গে তিন কার্য্য হইবে। প্রথমতঃ, গ্রন্থশালা ত নির্ম্মিত হইবেই। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রেরা গৃহ-নির্ম্মাণের সুযোগ পাইয়া কতকগুলি নূতন শিল্প শিখিয়া ফেলিবে। অধিকন্তু, এই কার্য্যে যোগদান করিয়া তাহারা যে পারিশ্রমিক পাইবে তাহার দ্বারা তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সংগ্রহ হইবে। এক দানে এত সুফল ফলিবার সুযোগ সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না।

অন্যান্য সংবাদ আবশ্যক হইলে পরে দিতে পারি।

ইতি নিবেদক—

বুকার টি ওয়াশিংটন,

পরিচালক,

টাস্কেজী-শিল্প-বিদ্যালয়।

ঠিকানা :—

স্যাণ্ড কার্ণেজি

৫, ওয়েষ্ট ৫১নং ষ্ট্রীট,

নিউইয়র্ক।

যথা সময়ে উত্তর আসিল, "আমি, আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। আপনার সৎকার্য্যে আমি যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়া পুলকিত হইলাম। গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যাপারে যে খরচ পড়িবে তাহার বিলগুলি আমার নিকট পাঠাইবেন। আমি ৬০,০০০৲ পর্য্যন্ত আপনার পাওনাদারদিগকে টাকা শোধ করিয়া দিব।"

এতক্ষণ বড় বড় দানের কথাই বলিলাম। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্যের মাহাত্ম্য কম নয়। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকসমাজ হইতে ছোট ছোট দান টাস্কেজীর জন্য আমি অসংখ্য পাইয়াছি। এই ক্ষুদ্র দানগুলির প্রভাবেই টাস্কেজীর নাম সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত হইয়াছে। এই সমুদয়ের সাহায্যেই সহস্র সহস্র নরনারীর সহানুভূতি এবং অনুরাগ আমার শিক্ষাসমিতির প্রতি আকৃষ্ট

হইয়াছে। আমার মতে, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুষ্টিলাভেই অনুষ্ঠানগুলি 'জাতীয়' এবং সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠে। ইহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মকেন্দ্রগুলি গণশক্তির উপর দাঁড়াইয়া যায়—দেশের জনসাধারণ এইগুলিকে আপনার নিজের সম্পত্তি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে।

দরিদ্র লোকেরা এক পয়সা, এক আনা, চৌদ্দপয়সা, বা একটা জামা, দুটা আলু, একটা শূকর বা খানিকটা চিনি ও নুন মাত্র দান করিতে পারে সত্য। কিন্তু এইগুলির সমবায়ে কম অর্থ সঞ্চিত হয় না। অধিকন্তু, এই নগণ্য দানের অন্যবিধ মূল্যও অসীম। কারণ ইহাতে নিরন্ন, বিদ্যাহীন, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা নিতান্ত দরিদ্র লোকের পূর্ণ হৃদয়ই থাকে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সঙ্গে আমরা অনেকগুলি হৃদয় ও প্রাণ আমাদের কর্ম্মকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লাভ করি। এতগুলি হৃদয়ের রাজা হইতে পারা কি কম সৌভাগ্যের কথা ? এই মূল্যবান হৃদয়গুলিকে ভবিষ্যতে সৎকর্ম্মের জন্য চালিত করিতে পারিলে কি সমাজের কম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে ?

এই জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানগুলিকে আমি চিরকাল ভক্তিভাবে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এই গুলিকেই আমি টাস্কেজীবিদ্যালয়ের ভিত্তি বিবেচনা করিয়া থাকি। ইহাদের সাহায্যে 'চটক্' দেখাইবার উপযুক্ত, বা লোক দেখান বড় কিছু গৃহ বা আসবাব ইত্যাদি সৃষ্টি করিতে পারি নাই সত্য। কিন্তু জনসমাজের অগোচরে থাকিয়া,—আমাদের অন্তর্য্যামীভাবে জন-

সাধারণের এই হৃদয়বত্তা ও এই সহানুভূতি আমাদের বিদ্যালয়ের জীবনীশক্তিরূপে কর্ম্ম করিতেছে। ইহারই ফলে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের শিকড়গুলি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গমহলে অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র দান উপলক্ষ্যে আমার আর একটা কথা বলাও আবশ্যক। আমাদের বিদ্যালয় হইতে যাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে তাহারা সময়ে সময়ে অথবা নিয়মিতরূপে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের পুরাতন ছাত্রেরা এইরূপে আমাদের সঙ্গে জীবনব্যাপী সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলে।

প্রথম তিন বৎসরের কার্য্যফলে আমরা আলাবামাপ্রদে রাষ্ট্র হইতে বর্দ্ধিত হারে সাহায্য পাইয়া আসিতেছি। প্র আমরা ৬০০০৲ টাকা মাত্র বার্ষিক পাইতাম। ইহাঁরা এক্ষ ৯,০০০৲ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহার পরে ইহাঁরা ১৩,৫০০ করিয়া দিয়া আসিতেন।

আর একটা মোটা সাহায্য আমরা "শ্লেটার-ভাণ্ডার" হই পাইয়া আসিতেছি। প্রথম প্রথম এই ভাণ্ডারের কর্ম্মকর্ত্তা ৩০০০৲ করিয়া দিতেন—ক্রমশঃ আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হই দানের হার বাড়াইয়া দিয়াছিলেন ... করি পাইতেছি।

তৃতীয়তঃ, "পীবডি-ভাণ্ডার" হইতেও আমরা সাহায্য পাই থাকি। প্রথমতঃ ১৫০০৲ পাইতাম—এক্ষণে বার্ষিক ৪৫০ পাইতেছি।

এই দুই ধন-ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার উপলক্ষ্যে আমি কয়েকজন সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ইঁহারা বড় বড় ব্যবসায়ের ধুরন্ধর অথবা প্রকাণ্ড কর্ম্মকেন্দ্রসমূহের পরিচালক। এত দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ইঁহারা দরিদ্রের ক্রন্দনে কর্ণপাত করিতে সময় পান! নিগ্রোসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় ইঁহারা আমাব সঙ্গে কত সময়ে কত আলোচনা করিয়াছেন!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

২০০০ মাইল দূরে ৫ মিনিটের বক্তৃতা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ‘পোর্টার হল’ নির্ম্মিত হইবার পর টাস্কেজী-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য অনেক ছাত্র ও ছাত্রী দরখাস্ত করিতে লাগিল। এই সকল নূতন ছাত্রদের জন্য ‘আলাবামা-ভবন’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইলাম। কিন্তু নিঃস্ব ছাত্রও অনেক ভর্ত্তি হইতে চাহিল। তাহারা নিজ খরচের কিয়দংশও ঘর হইতে আনিতে পারিত না। এজন্য আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বৎসরের মধ্যেই একটা নৈশবিভাগ খুলিতে বাধ্য হইলাম।

আমি ইতিপূর্ব্বে হ্যাম্পটনে একটা নৈশবিদ্যালয় খুলিয়া আসিয়াছি। সেই সময়েই টাস্কেজীতেও নৈশশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইল। ১২ জন ছাত্র লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা গেল। তাহাদিগকে দিনে ১০ ঘণ্টা করিয়া আমাদের কোন কৃষিকার্য্যে বা শিল্পে খাটিতে হইত। রাত্রিকালে মাত্র দুই ঘণ্টা করিয়া ইহারা পড়িতে পাইত। কাজের বেতনস্বরূপ থাওয়া খরচের অতিরিক্ত কিছু নগদ টাকা তাহাদিগকে দিতাম। এই টাকা তাহারা বিদ্যালয়ে জমা রাখিত। এইরূপে দুইবৎসর নৈশ-

বিদ্যালয়ে থাকিবার পর তাহাদিগকে দিবাবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা যাইত। তখন তাহাদিগের পুঁজি টাকা হইতে খাওয়া খরচ চলিত। এই প্রণালীতে নৈশবিদ্যালয়ের কার্য্য গত ১৫ বৎসর চলিয়াছে। আজ ইহার ছাত্রসংখ্যা ৪৫৭।

আমি নৈশবিদ্যালয়ের খুব পক্ষপাতী। কারণ ইহার নিয়মে ছাত্রের অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষার জন্য আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কেহ এত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া এইরূপে জীবন চালাইতে পারে না।

দিবা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পরও এই ছাত্রদিগকে কোন ব্যবসায়ে লাগাইয়া রাখিতাম। সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন তাহাদিগকে কাজ করিতে হইত। সপ্তাহের অপর ৪ দিন তাহারা সাধারণ ছাত্রের ন্যায় লেখাপড়া শিখিত। তাহা ছাড়া গরমের ছুটির সময়ে তিনমাস পুরাপুরি তাহাদিগকে খাটিতে হইত। এইরূপে নৈশবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এবং পরে দিবা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া অনেক নিগ্রো পুরুষ ও রমণী 'মানুষ' হইয়া গিয়াছে। আজ নিগ্রোসমাজে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী ও ব্যবসায়ী দেখিতে পাই। তাঁহাদের অনেকেই এই নৈশবিদ্যা-লয়ের অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের নৈশবিদ্যালয়ে জীবন যাপন করিলে কেহই ভবিষ্যতে কর্ম্মঠ চাষী বা কারিগর না হইয়া যায় না।

কৃষি-শিল্প ব্যবসায়ের কথা এত বলিতেছি। কেহ যেন না ভাবেন যে আমরা আধ্যাত্মিক বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী।

খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রচার টাস্কেজীতে যথেষ্টই হইয়া থাকে। আমরা কোন দলের বা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহি—কিন্তু সাধারণ ভাবে খৃষ্টমত নানা উপায়ে আমাদের শিক্ষালয়ে প্রচারিত হইয়া থাকে। আমাদের ধর্ম্ম-বক্তৃতা, ধর্ম্মসভা, রবিবারের বিদ্যালয়, খৃষ্টপ্রচার সমিতি, খৃষ্টানযুবকসমিতি, ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই ইহার প্রমাণ।

অনেকেই আমাকে আমার বাগ্মিতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি কি উপায়ে বক্তৃতা দিতে শিখিলাম কেহ কেহ জানিতে চাহেন। সত্য কথা, আমি বক্তৃতা করিয়া জীবন যাপন করিব এই উদ্দেশ্য আমার কোন দিনই ছিল না। আমার জীবনের সাধ—কার্য্য, কথা নহে। কথা বলিয়া কর্ম্মের প্রচার করা অপেক্ষা নিজে কর্ম্ম করিয়া প্রয়োজন হইলে অন্যকে তাহা প্রচারের ভার দেওয়া—এই রূপই আমার ইচ্ছা চিরকাল রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার গুরুদেব আর্মষ্ট্রঙ্গের সঙ্গে আমি উত্তর অঞ্চলের ইয়াঙ্কিমহলে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের "আলাবামা-ভবনে"র জন্য প্রচারকার্য্য করিতে গিয়াছিলাম। এই সূত্রে সর্ব্বত্র আমার খ্যাতি রটে—আমার বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া লোকেরা আনন্দিত হয়।

যুক্ত-রাষ্ট্রের জাতীয়শিক্ষাপরিষদের সভাপতি অনারেবল শ্রীযুক্ত টমাস বিক্‌নেল মহোদয় আমার কোন বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরেই তিনি আমাকে উইস্কন্সিন প্রদেশের ম্যাডিসন-নগরে একটা বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন।

সেখানকার শিক্ষাপরিষদের এক অধিবেশনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হইল। প্রায় ৪০০০ লোক উপস্থিত ছিল। আলাবামা প্রদেশেরও কোন কোন শ্বেতাঙ্গ, এমনকি টাস্কেজী নগরেরও কেহ কেহ সভায় আসিয়াছিলেন। এই শ্বেতাঙ্গেরা বক্তৃতার শেষে আমাকে বলিলেন "ওয়াশিংটন মহাশয়, আপনার উদারতা দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, আপনি উত্তর অঞ্চলে আদর আপ্যায়ন পাইয়া আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগকে যার পর নাই গালি দিবেন। কিন্তু আপনার বক্তৃতায় বিদ্বেষের লেশ মাত্র নাই। আপনার চরিত্রবত্তায় আমরা অনেক শিক্ষা পাইলাম।"

আমি দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগকে তিরস্কার করিব কেন? আমি যে তাঁহাদিগের নিকট সত্য সত্যই ঋণী। আমার বক্তৃতার সারমর্ম্ম একটি শ্বেতাঙ্গ রমণী কোন সংবাদপত্রে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন "ওয়াশিংটনের বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং উদারতার পরিচায়ক। তিনি দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙ্গদিগকে কিছুমাত্র গালি দেন নাই—বরং টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন।"

আমার এই ম্যাডিসন বক্তৃতায়ই সর্ব্বপ্রথম কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সমস্যার আলোচনা করি। ইহার পূর্ব্বে এ সকল কথা কোন প্রকাশ্য সভায় কখনও তুলি নাই। শিক্ষাবিষয়ক বক্তৃতাই এতদিন দিয়া আসিয়াছি, এবং টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীই সকলকে জানাইয়া আসিয়াছি। এইবার সত্যসত্যই রাষ্ট্রীয়

আন্দোলনে যোগ দিলাম। আমার আলোচনার রীতি দেখিয়া প্রায় সকলেই খুসী হইয়াছিলেন। আমার রাষ্ট্রীয় মতগুলি প্রচারিত হইলে জাতি-বিদ্বেষ অনেকটা কমিবার সম্ভাবনা—কেহ কেহ ইহাও বুঝিলেন।

আমি জানি, গালি দিয়া কখনও কাহাকে ভাল করা যায় না, অথবা তাহার চরিত্র পরিবর্ত্তন করা যায় না। বরং তাহারা যতটুকু প্রশংসাযোগ্য কর্ম্ম করিয়াছে সেই টুকুর জন্য সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। এজন্য উত্তর অঞ্চলে বক্তৃতা করিতে যাইয়া আমি কখনই দক্ষিণ অঞ্চলের নিন্দা করি নাই। আমি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকদিগকে মুখের উপর যে সকল কথা বলিতে না পারি সে কথা তাহাদের পশ্চাতে আমি কখনই বলিতে ইচ্ছা করিতাম না। আমি সরলতা ভালবাসি।

আমি অবশ্য ন্যায্য তিরস্কার করিতেও ছাড়ি না। যখন সত্য-সত্যই বুঝি যে শ্বেতাঙ্গেরা অন্যায় করিতেছে তাহা আমি তাহা-দিগকে সামনা সামনি বলিতে ভয় পাই না। বরং আমি দেখিয়াছি যে, অনেক লোক এইরূপ স্পষ্টবক্তাদিগকে ভাল-বাসে। নিরপেক্ষ ও স্বাধীন সমালোচনার প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। আমার সমালোচনা অনুসারে দক্ষিণ প্রান্তের লোকেরা কার্য্য আরম্ভ করিতে অনিচ্ছুক থাকিতে পারেন। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলে আমার কথাগুলি এবং যুক্তিগুলি তাঁহারা মানিয়া লইতে বাধ্য।

এজন্য আমি নিয়ম করিয়াছি যে, দক্ষিণের দোষগুলি আমি

দক্ষিণবাসীদিগকেই বলিব। তাহাদের দোষ উত্তর অঞ্চলে রটাইয়া লাভ কি? দক্ষিণের লোকজন লইয়াই আমাদের কারবার। সুতরাং তাহাদের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গেই সর্ব্বদা বুঝাপড়া, বাক্‌বিতণ্ডা ইত্যাদি হওয়া আবশ্যক।

ম্যাডিসনের বক্তৃতায় আমার প্রধান কথা ছিল—"নিগ্রোয় ও শ্বেতাঙ্গে সদ্ভাব বৃদ্ধি করা অত্যন্ত আবশ্যক। যত উপায়ে সম্ভব এই দুই সমাজে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতেই হইবে।" নিগ্রোদিগের কর্ত্তব্যও আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার মতে কেবল ক্ষমতা বা অধিকার পাইবার জন্য চেষ্টা করিলে চলিবে না। নিগ্রোরা সংকীর্ণ দৃষ্টিতে স্বার্থপর ভাবে কেবলমাত্র নিজ সমাজের কথা ভাবিলেই চলিবে না। তাহাদিগকে নিরপেক্ষতা এবং 'জাতীয়তা' অর্জ্জন করিতে হইবে। সমগ্র আমেরিকার স্বার্থ তাহাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়' স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ বা কেবলমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কথা ভাবিলে চলিবে না। এক সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের কথা যিনি ভাবিতে অসমর্থ তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালনের অযোগ্য। এই সকল কথা বলিয়া আমি আমার স্বজাতিগণকে তাহাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি।

এই গেল আমার বক্তৃতার রাষ্ট্রীয় অংশ। সঙ্গে সঙ্গে নিগ্রো-সমাজের উন্নতির উপায়ও আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম আমাদের উন্নতির প্রধান উপায় দুইটি—প্রথম শিক্ষা,

দ্বিতীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়। আমার বক্তৃতার খানিকটা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—"ভাই নিগ্রো, মনে রাখিও, তুমি আমেরিকা-জননীর কনিষ্ঠ সন্তান। মনে রাখিও, তোমাকে শ্বেতাঙ্গ ভ্রাতার সমান হইবার জন্য বর্ত্তমানে কঠোর সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। তোমার বিদ্যা বুদ্ধি মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক—তোমার চরিত্র গঠিত হওয়া আবশ্যক। নানা সদ্‌গুণ অর্জ্জন করিয়া তুমি আমেরিকার জনসমাজের অত্যাবশ্যক অঙ্গে পরিণত হও—দেখিবে, কেহ তোমাকে এই স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবে না। দেখিবে কেহই তোমাকে অবনত পদদলিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।

আমি বলিতেছি, তোমার চরিত্র গঠিত হইয়া গেলে তুমি অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। তুমি নানা উপায়ে তোমার ক্ষমতা দেখাইতে থাক—শ্বেতাঙ্গ তোমাকে সম্মান করিতে বাধ্য হইবে। তোমার কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দাও, তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে শ্বেতাঙ্গের কষ্ট হইবে। তুমি যে আমেরিকার অভাব মোচন করিতে পার, তুমি যে আমেরিকাকে ধনে ধান্যে ভরিয়া ফেলিতে পার—তাহা শ্বেতাঙ্গকে বুঝাইবার জন্য কি করিতেছ? যখনই তাহারা বুঝিবে যে, তোমাদের বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও চরিত্রে আমেরিকার ঐশ্বর্য্য বাড়িতেছে এবং আমেরিকা জগতে উন্নত হইতেছে তখনই তাহারা তোমাদিগকে মাথায় করিয়া রাখিবে। আমি বলিতেছি, তোমার কাল চামড়া ও তোমার বাপদাদার গোলামী তোমার ভবিষ্যৎ সম্মান লাভের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না।

আমি জানি একজন কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো নিজ বিদ্যাবলে তিন বিঘা জমি চষিয়া ৬৬ বুশেল শকরকন্দ আলু পাইয়াছিলেন। অথচ তাঁহার পল্লীর অন্যান্য শ্বেতকায় চাষীরা ৪ বুশেল মাত্র পাইত। তিনি উন্নত কৃষিবিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন এবং নূতন কৃষি-প্রণালী জানিতেন—শ্বেতাঙ্গেরা জানিত না। কাজেই পল্লীসমাজে এই কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো সকলেরই পূজার পাত্র হইয়া পড়িলেন। বুঝিয়া দেখ— কেন? শ্বেতাঙ্গেরা বুঝিত যে, এই ব্যক্তি সমাজের একটা সমৃদ্ধির উপায় বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তোমরা কৃষিকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাক, মনোযোগের সহিত শিল্প-কর্ম্মে লাগিয়া যাও, এবং এইরূপ কার্য্য করিতে করিতেই চরিত্র ও বুদ্ধি গঠিত কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে।"

আমার এই সকল মত আমি আজীবন পোষণ করিয়াছি। এইবার প্রথম প্রচার করিলাম। পরেও আমি কখন এইমত পরিবর্ত্তন করি নাই।

যৌবনকালে আমি নিগ্রোজাতির নিপীড়নকারী ব্যক্তিদিগকে বড়ই ঘৃণা করিতাম। আজকাল ইহাদিগকে আর ঘৃণা বা নিন্দা করি না—ইহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হই মাত্র।

অন্যলোককে দাবিয়া রাখিতে পারিলে অনেকে খুসী হয়। নিজের ক্ষমতার বড়াই করিবার জন্য বহু ব্যক্তি অপর ব্যক্তি বা জাতিকে চাপিয়া রাখিতে চাহে। অপর লোকের যশোলাভে ও উন্নতিতে ইহাদের বুক চড় চড় করে এবং চোখ টাটায়। কিন্তু ইহারা কি মূর্খ! ইহারা একসঙ্গে সঙ্কীর্ণতা এবং বুদ্ধিহীনতার

পরিচয় দিতেছে। এইরূপ স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর, চরিত্রহীন লোকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি অনেক সময়ে স্বগত বলিয়া থাকি,—

"ওহে ক্ষুদ্রচেতা পরপীড়নকারী ব্যক্তিগণ, তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, যে সকল সুযোগ পাইয়া তোমরা খানিকটা উন্নত হইয়াছ, সেই সকল সুযোগ সংসারের অন্য কোন লোক কখনই পাইবে না ? তুমি আমাকে বা উহাকে বা দশজন ব্যক্তিকে চাপিয়া রাখিয়া কি করিবে ? তুমি কি সংসারের সকল কর্ম্মক্ষেত্র-গুলিই একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছ ? দেশের সর্ব্বত্রই কি তুমি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছ ? অত ক্ষমতা তোমার নাই। এই বিশাল মানবজগতের মধ্যে তুমি এক নগণ্য কীট মাত্র। বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের এক কণামাত্রে দাঁড়াইয়া তুমি আস্ফালন করিতেছ !

বিশ্বে প্রতিদিন কত নূতন নূতন শক্তির সৃষ্টি হইতেছে—কত নূতন নূতন সুযোগ পাইয়া কত নূতন নূতন কর্ম্মবীরের অভ্যুদয় হইতেছে—জগৎ প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই নিত্যনূতন বিকাশকে রুদ্ধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। যে নিয়মে তুমি বড় হইয়াছ, ঠিক সেই নিয়মেই সংসারের লক্ষ লক্ষ নরনারী বড় হইতেছে ও হইবে। তাহাদের উন্নতি দেখিয়া তোমার কষ্ট হয় —তুমি নির্ব্বোধ। তুমি তাহাদিগকে তোমার সমান যশস্বী হইতে দিতে চাহ না—তুমি মূর্খ। ঐ দেখ, তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াই নূতন নূতন কর্ম্মী ও চিন্তাবীর জগতে

মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছেন। চিরপরিবর্ত্তনশীল সংসারের প্রবল প্রবাহের মধ্যে তোমার মত কত কীট তৃণের ন্যায় অহরহ ভাসিয়া যাইতেছে।

যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পারিতে। যদি বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে লজ্জিত হইতে। যদি মানুষ হইতে, তাহা হইলে নিজের অহঙ্কার খর্ব্ব করিতে শিখিতে, এবং নিজ জীবনকে সমগ্র সমাজের উন্নতিবিধানের অন্যতম ক্ষুদ্র যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতে পারিতে; তখন আপামর জনসাধারণের পরিপূর্ণ বিকাশ-লাভের সাহায্য করিতে যত্নবান হইতে। যদি ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে অপরকে তোমা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ করিবার সুযোগ সৃষ্টি পূর্ব্বক জীবন ধন্য করিতে উৎসাহী হইতে।”

আমার ম্যাডিসনের বক্তৃতায় উত্তরমহলে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। এই তোলাপাড়ার হুজুগে বহুস্থান হইতে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। আমি বোষ্টননগরে থাকিয়া ইয়াঙ্কিমহলের নানা স্থানে আমার মত প্রচার করিবার সুযোগ পাইলাম। কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা—দক্ষিণ প্রান্তে যাইয়া এই কথাগুলি প্রকাশ্যসভায় বলিয়া আসি। আমি এজন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে একটা সুবিধা পাওয়া গেল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জিয়া প্রদেশের আটলাণ্টা নগরে একটা বিরাট খৃষ্টান মহাসভার আয়োজন হইতেছিল। এই সময়ে বোষ্টনেও আমার অনেক কাজ ছিল। তথাপি জর্জ্জিয়ার কর্ম্ম-

কর্ত্তাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। বোষ্টন হইতে আট্‌লাণ্টা ২০০০ মাইল। এতদূর যাইতে হইবে। অথচ বক্তৃতা করিবার মাত্র ৩০ মিনিট পূর্ব্বে সভাস্থলে আমার গাড়ী পৌঁছিবে। এখানে ৫ মিনিট মাত্র বক্তৃতা করিতে সময় পাইব। আট্‌লাণ্টায় সর্ব্বসমেত একঘণ্টা মাত্র থাকিয়া পুনরায় আমাকে বোষ্টনে আসিতে হইবে। আমার কাজের ভিড় এত। যাহা হউক দক্ষিণ অঞ্চলের এই মহাসম্মিলনে বক্তৃতা করিবার সুযোগ ছাড়িলাম না।

এখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সমাজেরই গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। সর্ব্বসমেত ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আমার শিক্ষাপ্রণালীর বিবরণ দিলাম—শিল্পশিক্ষানীতি বুঝাইয়া দিলাম এতদ্ব্যতীত নিগ্রোসমাজের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা বলিলাম। অধিকন্তু শ্বেতাঙ্গদিগের যথোচিত সমালোচনা করিতেও ছাড়িলাম না। আট্‌লাণ্টার সংবাদপত্রগুলি আমার বক্তৃতার খুব তারিফ করিতে লাগিল। আমার কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেল—দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙ্গমহলে আমি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলাম।

ইহার পর হইতে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সকলেই আমায় বক্তৃতা করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। টাস্কেজীর কাজকর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়া আমাকে এই বক্তৃতা-কার্য্যে লাগিয়া থাকিতে হইত। উত্তর অঞ্চলে আমি টাস্কেজীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতাম। নিগ্রোমহলে আমার স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় আলোচনা করিতাম।

এইবার আমি আমার জীবনের একটা বিশেষ স্মরণীয় দিনের উল্লেখ করিব। সেই দিন হইতে আমি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে সুপরিচিত হইয়াছি। তখন হইতে আমার যশ কেবল মাত্র নিগ্রোসমাজে অথবা আমার সাহায্যকারী শ্বেতাঙ্গ বন্ধুমহলেই আবদ্ধ থাকিল না। আমার নাম জেলা হইতে জেলায়, প্রদেশ হইতে প্রদেশে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। আমি কোন প্রদেশ বা সম্প্রদায়ের কর্ম্মবীর মাত্র থাকিলাম না। সকল প্রদেশের লোকই আমাকে সমগ্র 'জাতির' অন্যতম নেতারূপে গ্রহণ করিল। আমেরিকা ভূখণ্ডের একজন জন-নায়ক বা কর্ম্মীপুরুষ অথবা একজন যুক্তরাষ্ট্র-বীররূপে আমি সম্মান পাইতে লাগিলাম।

১৮৯৫ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর আমার জীবনের এই স্মরণীয় দিন। এদিন আটলাণ্টা নগরে এক বিপুল প্রদর্শনী খোলা হয়। এই প্রদর্শনীতে আমি আমার শিক্ষানীতি এবং রাষ্ট্রীয় মত প্রচার করিবার জন্য বক্তৃতা করিতে সুযোগ পাই।

এই প্রদর্শনীর বিষয় সবিশেষ বলা আবশ্যক। আটলাণ্টার খৃষ্টান মহাসভায় বক্তৃতা করার ফলে ঐ অঞ্চলে আমার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার কিছু কাল পরে ১৮৯৫ সালে ঐ নগরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমার নিকট টেলিগ্রাম করেন, "আটলাণ্টায় এক বিরাট প্রদর্শনী ও সম্মিলনের আয়োজন হইতেছে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ধনসচিবের নিকট হইতে অর্থসাহায্য আবশ্যক। আমাদের নগরবাসী কয়েকজন এই কার্য্য উপলক্ষ্যে ওয়াশিংটনের যুক্তদরবারে যাইয়া আবেদন

করিবেন। 'জাতীয়'-মহাসমিতি কংগ্রেসের সম্মুখে ইহাঁরা আমাদের অভাব জানাইবেন। আপনাকে এই প্রতিনিধিগণের সঙ্গে আমাদের পক্ষ হইতে যোগদান করিতে হইবে।"

জর্জ্জিয়া প্রদেশের ২৩জন বিচক্ষণ শ্বেতাঙ্গ এই উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই প্রতিনিধি-সভায় তিনজন নিগ্রোর স্থানও ছিল। আমি তাঁহাদের একজন হইলাম। যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়'-দরবারে তিন চারিজন বক্তৃতা করিলেন—আমাকেও বক্তৃতা করিতে হইল। আমি আটলাণ্টার পক্ষ হইতে সেই জাতীয়-মহাসমিতিকে নিবেদন করিলাম, "দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গসমাজে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধন করা অত্যাবশ্যক। এজন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন। শীঘ্রই ঐ অঞ্চলের সর্ব্ববিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা করুন। কৃষি শিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বারা উহাদের আর্থিক ও মানসিক উন্নতির সাহায্য করিলে এই কার্য্য সহজেই সিদ্ধ হইবে। সম্প্রতি আটলাণ্টার প্রদর্শনী উপলক্ষে মহাসুযোগ উপস্থিত। ইহাতে গোলামীনিবারণের যুগ হইতে বিগত বিশবৎসরের মধ্যে উভয় জাতির উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই প্রদর্শনীর দ্বারা আবার উভয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও উন্মুক্ত হইয়া পড়িবে।"

আমি প্রায় ১৫।২০ মিনিট কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতা করিলাম। আমার বক্তব্যের শেষ অংশ এই—"নিগ্রোরা রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতেছে সত্য, কিন্তু কেবল মাত্র ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা থাকিলে কি হইবে

তাহাদের ধনসম্পত্তি নাই। এক্ষণে তাহাদের সম্পত্তির মালিক হওয়া আবশ্যক। এজন্য তাহাদের কৃষিকর্ম্মে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের সহায় হইতে পারেন তাহাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে অচিরেই তাহাদের চরিত্র গঠিত হইবে—এবং তাহারা বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যথার্থ দায়িত্বের সহিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবে। আটলাণ্টার সম্মিলনে কংগ্রেস এক মহাসুযোগ পাইবেন। উত্তরপ্রান্তে ও দক্ষিণপ্রান্তে সন্ধি স্থাপিত হইবার পর কংগ্রেস এরূপ সুযোগ আর পান নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এইবার আমেরিকায় নবজীবন প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করিতে পারেন।”

আমার কথা বলা হইয়া গেলে আমার প্রতিনিধি বন্ধুগণ আমার খুব সুখ্যাতি করিলেন। কংগ্রেসের সভ্য মহোদয়গণও আমার প্রশংসা করিলেন। কংগ্রেসের মহাসভা হইতে আমাদের আবেদন মঞ্জুর করা হইল। আটলাণ্টা-প্রদর্শনীর ব্যয় যুক্ত-রাষ্ট্রের ‘জাতীয়’ কোষাগার হইতে পাওয়া যাইবে—আশা পাইলাম।

তারপর প্রদর্শনী সাজাইবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। কর্ম্ম-কর্ত্তারা স্থির করিলেন নিগ্রোসমাজের জন্য বিশেষ এক বিভাগ খোলা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের পর ২০ বৎসরের মধ্যে নিগ্রোরা শিল্পে, কৃষিকর্ম্মে, শিক্ষায় নানা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। সেইগুলি একস্থানে জমা করিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

আটলাণ্টার প্রদর্শনীতে তাহার জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন করিবার প্রস্তাব হইল। নিগ্রোবিভাগের ঘরবাড়ী সাজসজ্জা আসবাবপত্র সবই নিগ্রোরা নিজেদের দ্বারাই করিয়া লইবে—ইহাও স্থির হইয়া গেল।

প্রদর্শনীর নিগ্রো-বিভাগের জন্য একজন কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইল। জর্জ্জিয়াপ্রদেশবাসী আমাকেই চাহিলেন। কিন্তু টাস্কেজীর কাজে আমি ব্যস্ত—এজন্য সেই পদ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার প্রস্তাবে অন্য একজন নিগ্রোকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল।

নিগ্রো-বিভাগের মধ্যে দুইটা কামরাই সকলের দৃষ্টি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রথমতঃ হ্যাম্পটন-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাজকর্ম্ম, দ্বিতীয়তঃ টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের ছেলেদের হাতের কাজ। বলা বাহুল্য, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইয়াছিল দক্ষিণপ্রান্তের শ্বেতাঙ্গগণ।

আটলাণ্টা-মহাপ্রদর্শনীর দিন অগ্রসর হইতে লাগিল। এই মেলা উন্মুক্ত করিবার জন্য কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইল। এই মেলায় নিগ্রোদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির নিদর্শন স্বরূপ কাজ কর্ম্ম প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই তিন জন নিগ্রো ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত যাইয়া 'জাতীয়' মহাসমিতির নিকট আবেদন করিয়া আসিয়াছেন—এবং নিগ্রোদিগকে প্রদর্শনীর কার্য্যে ও নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাজেই প্রদর্শনী খুলিবার উৎসবে যে সম্মিলন হইবে

তাহাতে নিগ্রোর আসন থাকাও বাঞ্ছনীয়। নিগ্রোর পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধির সেই সম্মিলনে বক্তৃতা করা আবশ্যক। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ আপত্তি করিলেন; বলিলেন "অতবড় বিরাট ব্যাপারে কৃষ্ণাঙ্গের স্থান দিবার প্রয়োজন নাই।" শেষ পর্য্যন্ত সাব্যস্থ হইল, একজন নিগ্রো প্রতিনিধিকে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে। কয়েকদিন পরে আমিই সেই নিমন্ত্রণ পাইলাম।

আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি গোলাম ছিলাম। আমার মনিবেরা কেহ কেহ হয়ত এই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিবেন। তাঁহাদের সম্মুখে আমি স্বাধীন ভাবে কেমন করিয়া বক্তৃতা করিব?

তারপর নিগ্রোজাতির পক্ষে শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিবার সুযোগ এই প্রথম পাওয়া গেল। এই ঘটনার উপর নিগ্রোসমাজের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে। এই সভাস্থলে, আবার, কৃষ্ণাঙ্গও অনেক থাকিবেন এবং উত্তর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গও অনেক আসিবেন। সমগ্র যুক্তরাজ্যের ইহা মহাসম্মিলন বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না। এই সর্ব্বজন-সমাগমের আসরে, এই "জাতীয়" সভামণ্ডপে দাঁড়াইয়া সকল প্রদেশ ও সকল সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষা করিয়া কথা বলা কি সহজ?

আমার স্বজাতির প্রতি কর্ত্তব্য আছে। তাহা পালন করিতেই হইবে। দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেই হইবে—অথচ তাহাদের দোষের কথা উল্লেখ না করিলেই বা চলিবে কেন? এদিকে উত্তর অঞ্চলের ইয়াঙ্কিরাও আমার

বক্তৃতা শুনিয়া সমগ্র আমেরিকার নিগ্রোসমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। দক্ষিণপ্রান্তের নিগ্রোয় ও শ্বেতাঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাঁহারা আমার বক্তৃতা হইতেই তাহার পরিচয় পাইবেন। সুতরাং আমার দায়িত্ব অতি গুরুতর—সমগ্র আমেরিকাজাতি আমার পরীক্ষক ও বিচারক। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমি এতদিন লাভ করিয়াছি কি? এই সময়ে আমার বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর।

আমার মাথায় কত কথাই আসিতে লাগিল। আমি নানা উপায়ে সমস্যাটা তলাইয়া মজাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। ইতিমধ্যে সমগ্র আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি আমাকে প্রকাশ্যভাবে পরামর্শ দিতে লাগিল। কেহ লিখিল—"আমার অমুক অমুক বিষয় আলোচনা করা উচিত, অমুক অমুক প্রশ্নের উত্থাপন না করাই ভাল।" কোন সম্পাদক মহাশয় পরামর্শ দিলেন- "ওয়াশিংটন এই এই কথা যেন বলেন।" ইত্যাদি। আমার স্বজাতীয়গণ এবং দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙ্গেরাও আমাকে উপদেশ দিতে ছাড়িলেন না। যাহা হউক আমার নিজের বক্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। ১৮ই সেপ্টেম্বর সভা হইবে—তাহার পূর্ব্বেই আমার বক্তৃতা লেখা হইয়া গেল। টাস্কেজীর শিক্ষকগণকে আমার প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহাদের আলোচনা অনুসারে বক্তৃতার কিয়দংশ মার্জ্জিতও করিয়া লইলাম।

১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে টাস্কেজী হইতে আটলাণ্টার সম্মিলনে রওনা হওয়া গেল। টাস্কেজীতে রেলে চড়িতে যাইতেছি, এমন

সময়ে একজন শ্বেতাঙ্গ চাষী আমাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল,—"কিহে ওয়াশিংটন ভায়া, এতদিন তুমি উত্তর অঞ্চলের ইয়াঙ্কি-মহলে বক্তৃতা মারিয়াছ, অথবা তোমার স্বজাতিগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য শিখাইয়াছ—এবং কখনও কখনও দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গ-মহলেও আমাদের উপর গলাবাজী ঝাড়িয়াছ। কিন্তু এবার তোমাকে এক সঙ্গে সকল মহলেই কথা বলিতে হইবে। দেখিতেছি তুমি এবার শক্ত পাল্লায় পড়িয়াছ। এবার উদ্ধার পাইলে বুঝিব, ওয়াশিংটন সত্যসত্যই একজন মানুষ।" চাষী আমার মনোভাব ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিল—সত্যই আমার তখনকার অবস্থা বড় কঠিন।

আমি রেলে চলিলাম। ষ্টেসনে ষ্টেসনে কত শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াই আমার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। আমার দিকে অনেকে আঙ্গুল দিয়া অন্যকে দেখাইয়া দিল। গাড়ী হইতে নামিয়া আটলাণ্টায় পদার্পণ করিবামাত্র এক বৃদ্ধ নিগ্রো আর একজনকে বলিল "ঐ লোকটা কালকার সভায় আমাদের স্বজাতির পক্ষ হইতে বক্তৃতা করিবে। আমি সভায় শুনিতে যাইবই স্থির করিয়াছি।"

আটলাণ্টায় সেদিন লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি, দর্শক, ব্যবসায়ী ও শিল্পীর সমাগম হইয়াছে। সেনাবিভাগের লোকজন আসিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের কর্ম্মচারী এবং রাষ্ট্রীয় দূতগণও সমবেত হইয়াছে। আটলাণ্টায় সেদিন বিশ্বের মহাবাজার বসিয়াছে বোধ হইল।

সমস্ত রাত্রি আমার ঘুম হইল না। সকালে উঠিবামাত্র ভগবানের নিকট আমার বক্তৃতার সফলতার জন্য প্রার্থনা করিলাম। সকল বক্তৃতার পূর্ব্বেই আমি ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়া থাকি।

তারপর আমাকে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকজন লোক আমার গৃহে আসিলেন। সভাস্থলে যাইবার পূর্ব্বে এক বিশাল শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই শোভাযাত্রায় কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এবং কয়েক দল কৃষ্ণাঙ্গ সৈন্যও যোগদান করিয়াছিল। তিন ঘণ্টা ক্রমাগত চলিয়া সেই লোক-প্রবাহ প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গরমে আমার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গেল। একে আমার মানসিক উদ্বেগ তাহার উপর এই ক্লান্তি। আমি ভাবিলাম—আমার বক্তৃতা দেওয়া হইবে না। অবশেষে সম্মিলন-গৃহে প্রবেশ করিলাম।

সভামণ্ডপ অতি সুবিস্তৃত ও গোলাকার। নীচ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত কোথায়ও নূতন লোক বসিবার বিন্দুমাত্র স্থান নাই—সকল আসনই পূর্ণ। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র কৃষ্ণাঙ্গেরা জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। কোন কোন শ্বেতাঙ্গও সেই ধ্বনিতে যোগদান করিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে অনেক শ্বেতাঙ্গই আমার বক্তৃতা শুনিতে আসিবেন। কাহারও উদ্দেশ্য কেবল শুনা মাত্র। কেহ কেহ অবশ্য আমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। আর অধিকাংশ লোকই মজা দেখিতে আসিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস আমি সকল অনুষ্ঠানটা পণ্ড করিয়া

ফেলিব। তাঁহা হইলে তাহারা আমাকে লইয়া হাসি ঠাট্টা করিতে পারিবে।

আমার একজন সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ব্যাপার দেখিয়া সভাগৃহেই প্রবেশ করিলেন না। আমি যদি সুফল লাভ না করি তাহা হইলে বড়ই লজ্জা ও নিন্দার বিষয় হইবে, এই ভাবিয়া তিনি অস্থিরভাবে সভাগৃহের বাহিরে 'পায়চারি' করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, আমার এই বক্তৃতা সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে নানা লোকের মনে নানা সন্দেহ উঠিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

আটলাণ্টা-সম্মিলনে অভিভাষণ

জর্জ্জিয়া-প্রদেশের রাষ্ট্র-শাসক বুলক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া প্রদর্শনী খুলিলেন। পরে ধর্ম্মগুরু নেল্‌সন স্তোত্র পাঠ করিলেন এবং একটি 'প্রদর্শনী-মঙ্গল' কবিতাও পঠিত হইল।

এই সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য শেষ হইবার পর সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রদর্শনীর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। রমণী-বিভাগের সভাপতির বক্তৃতাও হইয়া গেল। তাহার পর বুলক মহোদয় আমাকে সমবেত জনমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "ইনি বুকার ওয়াশিংটন—নিগ্রোসমাজের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। ইনি আমাদিগকে নিগ্রোজাতির কৃতিত্ব ও সভ্যতার বিবরণ প্রদান করিবেন।"

আমি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলাম—অমনি চারিদিক হইতে জয়ধ্বনি উঠিল। নিগ্রোমহল হইতেই বিশেষ উৎসাহ পাওয়া গেল—এবং হাজার হাজার লোকের দৃষ্টি আমার দিকে পড়িল। নিম্নে আমার বক্তৃতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"সভাপতি মহাশয়, প্রদর্শনী ও সম্মিলনের ধূরন্ধরগণ, এবং বন্ধুগণ,

দক্ষিণ অঞ্চলের ⅓ অংশ লোক নিগ্রোসমাজের অন্তর্গত। নিগ্রোসমাজকে বাদ দিয়া কর্ম্ম করিলে কোন অনুষ্ঠানই এ অঞ্চলে সুফল প্রদান করিতে পারে না। এ অঞ্চলের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য কৃষ্ণাঙ্গ জাতির সহযোগিতা গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

আপনারা এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে নিগ্রোজাতিকে উপেক্ষা করেন নাই, বরং সকল অবস্থায়ই কৃষ্ণাঙ্গসমাজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপে প্রতি পদে আপনারা আমার স্বজাতির চরিত্রবত্তা এবং বুদ্ধিমত্তার যথোচিত সম্মান করিয়াছেন। এজন্য আমার স্বজাতি আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। আমি তাহাদের মুখপাত্র স্বরূপ এই প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদের উদারতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আপনারা আমাদিগকে এই উপায়ে সম্মানিত করিয়া শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের ঐক্যবন্ধন দৃঢ় করিলেন। আমাদের স্বাধীনতালাভের পর এরূপ ভ্রাতৃভাব, সহৃদয়তা এবং পরস্পর-সাপেক্ষতা আর দেখা যায় নাই।

কেবল তাহাই নহে। আমরা এই সুযোগে শিল্প ও ব্যবসায় হিসাবে এক নবজীবন লাভ করিতে থাকিব। এতদিন আমরা রাষ্ট্রীয় ও শিল্পকর্ম্মে অনেকটা অনভ্যস্ত ছিলাম। গোড়ার ভিত্তি

প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আমরা উচ্চ অধিকারলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখিতাম। সম্পত্তির মালিক না হইয়াই প্রদেশ-রাষ্ট্রের এবং যুক্ত-রাষ্ট্রের মন্ত্রণা-সভার পদলাভের আশা করিতাম। কৃষিকর্ম্মে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়া রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এবং গলাবাজীতে সময় ব্যয় করিতাম। এরূপ অস্বাভাবিক আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা যে সময়ে স্বাধীনতা পাই তখন আমরা সকল বিষয়ে নিতান্ত শিশু ছিলাম—কোনদিকেই আমাদের কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। এজন্য সংসারের লোভনীয় পদ ও সম্মানগুলির প্রতি আমরা প্রথমেই অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এগুলিকে লাভ করিবার উপায় ও কৌশলের প্রতি দৃষ্টি পড়ে নাই। আমরা ফললাভের জন্যই বেশী ব্যগ্র হইয়াছিলাম—ফললাভের প্রণালীগুলি আয়ত্ত করিতে যত্ন লই নাই।

বহুদিন ধরিয়া একটি জাহাজ সমুদ্রে পথ হারাইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছিল। হঠাৎ এক দিন একটি নূতন জাহাজের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। পথভ্রান্ত জাহাজের মাস্তুল হইতে তাহার দিকে নিশান তোলা হইল—"জল চাই জল চাই, আমরা তৃষ্ণায় মরিতেছি।" নূতন জাহাজ হইতে তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল "যেখানে তোমাদের জাহাজ রহিয়াছে সেই খানেই ভাল জল পাইবে। ঠিক সেই খানেই বালতি ফেল।"

পথভ্রান্ত জাহাজ আবার জানাইল, "জল, জল, শীঘ্র ভাল জল পাঠাও।" নূতন জাহাজ আবার উত্তর করিল, "এইখানেই সুস্বাদু

পানীয় জল পাইবে। বাল্‌তি ফেলিলেই ভাল জল উঠিবে।” এইরূপে তিন চারিবার দুই জাহাজে প্রার্থনা ও উত্তর চলিতে লাগিল। শেষে সেই পথভ্রান্ত জাহাজের কর্ত্তা বাল্‌তি ফেলিয়া দেখিলেন—অতি নির্ম্মল ও মিষ্ট জল উঠিয়া আসিল। তাঁহাদের জাহাজ সমুদ্র ছাড়িয়া অনেকক্ষণ ‘আমাজন’ নদে পড়িয়াছে।

আমাদের নিগ্রোসমাজকেও আমি সেইরূপ বলি—“যেখানে আছ সেই খানেই বাল্‌তি ফেল। ভাল জল পাইবে। তৃষ্ণায় অধীর হইতে হইবে না।”

তোমরা ভাবিতেছ, আমেরিকা ছাড়িয়া গেলে সুখী হইবে? তোমরা ভাবিয়াছ, তোমাদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গসমাজের সদ্ভাব কোনদিনই জন্মিবে না? তোমরা ভুল বুঝিতেছ—সেই পথভ্রান্ত জাহাজের নাবিকদের মত পুরাতন মোহে মজিয়া রহিয়াছ।

চক্ষু খুলিয়া দেখ—দেখিবে স্বাস্থ্যকর সুমিষ্ট জল তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে। বুঝিবে শ্বেতাঙ্গ তোমার ভাই—দেখিবে আমেরিকাই তোমার স্বদেশ। দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময় ও কার্য্য-বিনিময় কর। যে দেশের আব্‌হাওয়ায় বাস করিতেছ সেই আব্‌হাওয়া হইতেই নিঃশ্বাস গ্রহণ কর। সত্বরেই এক হৃষ্টপুষ্ট ও চরিত্রবান্‌ জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারিবে।

কৃষিকর্ম্মে মনোনিবেশ কর। শিল্প বা ব্যবসায়ে মনোযোগী হও। অন্যান্য নানাপ্রকার চাকরী, কেরাণীগিরি ইত্যাদিতে

লাগিয়া যাও। বিদেশে যাইবার প্রয়োজন নাই। "যেখানে আছ সেইখানেই বাল্‌তি ফেল।"

দক্ষিণ অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গদিগের অনেক দোষই আছে স্বীকার করি। কিন্তু এ কথাও মুক্তকণ্ঠে আমি বলিতেছি যে, এখানে নিগ্রোজাতি ব্যবসায় হিসাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করে না। বরং আমাদের আর্থিক উন্নতির যথেষ্ট সুযোগই আমার স্বজাতি এখানে পাইয়াছে। কোন নিগ্রোই তাহা ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না।

আমরা অল্পকাল হইল স্বাধীন হইয়াছি। বলা বাহুল্য, অন্যান্য স্বাধীনজাতির যে অবস্থা আমাদেরও সেই অবস্থাই হইবে। পুরাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ-জাতির মধ্যে ব্যক্তিমাত্রকেই খাটিয়া খাইতে হয়। সংসারের কাজকর্ম্মে বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রবলের প্রয়োগ করিয়াই তাহারা জগতে বিরাজ করিতেছে। নিগ্রোজাতিকেও সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের অন্নের গ্রাস আমাদিগকে নিজহাতেই মুখে তুলিতে হইবে। তাহার জন্য শারীরিক পরিশ্রম অত্যাবশ্যক।

"গোলামীর যুগে পরিশ্রম করিতাম—কিন্তু এখন স্বাধীন হইয়াছি পরিশ্রম করিব কেন?"—কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই এরূপ ভাবিতে পারেন না। কারণ স্বাধীনতার অর্থ পরিশ্রম হইতে মুক্তিলাভ নয়! স্বাধীনতার যুগেও হাতে পায়ে খাটিতে হইবে—মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে।

গোলামীযুগে পরের স্বার্থে খাটিতাম, পরের নেতৃত্বে খাটিতাম, পরকে সুখী করিবার জন্য খাটিতাম। সে খাটায় কিছুমাত্র নিজস্ব

ছিল না, নিজের লাভ দেখিতাম না, নিজের আনন্দ পাইতাম না। উহা গতর খাটা মাত্র। কিন্তু স্বাধীনতার যুগে খাটিব—নিজের জন্য, নিজ আনন্দের জন্য, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য—সকল বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ববোধ জাগাইবার জন্য—সর্ব্বত্র নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। কিন্তু খাটা বন্ধ হইবে না। যতদিন মানুষ থাকিব ততদিন খাটিতেই হইবে।

আমার নিগ্রো ভ্রাতারা সর্ব্বদা একথা মনে রাখিয়া চলিবেন। স্বাধীন হইয়াছি বলিয়া বাবুগিরি ও বিলাসের সুযোগ পাইয়াছি—একথা যেন আমরা না বুঝি। বরং এখন হইতে আমাদিগকে কঠোর সংযম পালন করিতে হইবে। সৌখীন ও চকচকে পদার্থের প্রলোভন ছাড়াইয়া যথার্থ টেকসই, স্থায়ী এবং কার্য্যোপযোগী জিনিষপত্রের আদর করিতে হইবে। অলঙ্কার বেশভূষা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা এখন কিছু বর্জ্জন করা আবশ্যক। সকল বিষয়েই আমাদের এখন কষ্টকর সাধনার যুগ।

সকল স্বাধীন জাতিই বিবেচনা করেন যে, কবিতারচনায় যে কৃতিত্ব, জমি চাষেও সেই কৃতিত্ব। সুতরাং যাঁহারা সমাজকে ধনে সম্পদে উন্নত করিতেছেন তাঁহাদের সম্মান বড় কম নয়। এই বুঝিয়া আমাদেরও এই ধনসম্পদবৃদ্ধির কর্ম্মে মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা এই গোড়ার কথা ভুলিয়া গেলে উন্নতির উচ্চ স্তরগুলিতে উঠিতে পারিব না।

তারপর আমরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখি যে, আমাদের সুযোগ ও সুবিধা বর্ত্তমানে অনেকই রহিয়াছে। অবশ্য কতকগুলি বাধা

ও বিঘ্ন আমাদের চরম উন্নতির প্রতিবন্ধক হইয়া আছে—তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু সর্ব্বদা সেই অসুবিধার কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, এবং ভাবিয়া ভাবিয়া সেইগুলিকে বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের হাতের কাছে যে সকল সুবিধা পাইতেছি সেইগুলিকে বুদ্ধিমানের ন্যায় ব্যবহার করিব না কেন? বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যদি জগতের শক্তিগুলি যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেদের কাজে না লাগাই, তাহা হইলে ভবিষ্যতের জন্য আমরা কি করিয়া গেলাম? আমাদের বংশধরগণের উচ্চতর কর্ম্ম ও চিন্তার জন্য আমাদের এক্ষণে সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করিয়া রাখা আবশ্যক নহে কি? এজন্য বর্ত্তমানের সুযোগ যাহা কিছু পাইতেছি সকলই আমাদের প্রাণপণে নিগ্রো-সমাজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আমার শ্বেতাঙ্গ দেশবাসীদিগকেও আমি বলিতেছি—আপনারাও যেখানে আছেন, ঠিক সেইখানে বাল্‌তি ফেলুন'—আপনাদের অভাবও মোচিত হইবে। বিদেশ হইতে লোক আমদানী করিবার প্রয়োজন নাই। স্বদেশের কৃষ্ণাঙ্গসমাজের মধ্যে বাল্‌তি ফেলুন—আমেরিকার নিগ্রোজাতির সঙ্গে সকল বিষয়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করুন। আমেরিকাজননী প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবেন।

এই নিগ্রোরা আপনাদের যমজ ভ্রাতা। ইহারা আপনাদের সুখে-দুঃখে উৎসবে-ব্যসনে সকল অবস্থায়ই সঙ্গী রহিয়াছে। আপনারা কি ইহাদের নিকট ঋণী নহেন?

নিগ্রোজাতির স্বভাব চরিত্র আপনাদের অজানা নাই। ইহাদের প্রভুভক্তি এবং চরিত্রবত্তার পরীক্ষা আপনারা বহুবার করিয়াছেন। আপনারা ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া আপনাদের স্ত্রীপুত্রপরিবার ও ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে কতবার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন—সে সকল কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। ইহারা যে বিশ্বাসঘাতক নয় তাহার সাক্ষ্য আপনারাই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে দিতে পারিবেন।

অধিকন্তু, এই কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজ আপনাদের আর্থিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন। ইহারাই মূকভাবে এতদিন আপনাদের জমি চষিয়াছে। ইহারা কখনও ধর্ম্ম-ঘট করে নাই—আপনাদিগকে জব্দ করিয়া নিজেদের বেতন বা অন্যান্য অধিকার বাড়াইবার জন্য চেষ্টিত হয় নাই। বিনাবাক্যব্যয়ে ইহারা আপনাদের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে—রেলপথ তৈয়ারী করিয়াছে—নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে। নিগ্রো কুলীরাই পৃথিবী খুঁড়িয়া অন্ধকারময় খাদ হইতে ধাতুরত্ন তুলিয়া আনিয়াছে—ইহাদের সাহায্যেই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলের সকল সুখ ও শ্রী পুষ্ট হইয়াছে।

আপনারা এই সমাজের প্রতি কি কৃতজ্ঞ হইবেন না? আপনারা কি আপনাদের পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিক গৌরবের মূলকারণ স্বরূপ নিগ্রোজাতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকিতে পারেন? আমি প্রার্থনা করিতেছি—শ্বেতাঙ্গ-সমাজের অগ্রণীগণ, আপনারা কৃষ্ণাঙ্গ-সমাজের মধ্যেই আপনাদের বালতি ফেলুন। প্রতিকার্য্যে ইহাদিগের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

আপনারা ঠিক পথেই চলিয়াছেন—আপনারা নিগ্রোশ্বেতাঙ্গের মিলন পথই ধরিয়াছেন—তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি। আজকার এই প্রদর্শনীই তাহার সাক্ষী। এই সম্মিলনে আমি যে বক্তৃতা দিবার সুযোগ পাইয়াছি—ইহাই তাহার সাক্ষ্য। আপনারা নিগ্রোসমাজকে সম্মান করিতেছেন।

আপনারা এক্ষণে আমার স্বজাতিকে উন্নতির নব নব পথে পরিচালিত করুন। তাহাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করুন—তাহাদের হৃদয়ের উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টিত হউন। তাহাদিগকে কৃষি, শিল্প, কলা, সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য ইত্যাদি সভ্যতার বিবিধ বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ প্রদান করুন। দেখিবেন,—দেশের মাটি উর্ব্বর হইতে থাকিবে—ধরণী ফলেফুলে ভরা হইয়া আপনাদের আনন্দ বিধান করিতে থাকিবে। আমেরিকার পল্লী-গুলি উদ্যানে পরিণত হইবে—নগরগুলি নব নব ফ্যাক্টরী বক্ষে ধারণ করিয়া সমৃদ্ধ হইবে।

আর জানিয়া রাখিবেন, যখন প্রয়োজন হইবে, আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমরা আমাদের রক্তের শেষবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিব। এরূপ প্রভুভক্ত বিশ্বাসী এবং কৃতজ্ঞ জাতি আপনারা বিদেশ হইতে আমদানী করিতে পারিবেন না। "আপনারা যেখানে আছেন সেইখানেই বালতি ফেলুন।"

অতীতের কথাগুলি স্মরণ করুন, সেই গোলামীর যুগ স্মরণ করুন—সেই গোলামী যুগের শেষ অবস্থা, সেই উত্তরপ্রান্তে ও দক্ষিণপ্রান্তে লড়াইয়ের কথা স্মরণ করুন। অতীতে আমরা

আপনাদের সন্তান সন্ততি পালন করিয়াছি, বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিয়াছি। আপনাদের রোগে ও শোকে আমরাই অসুখ ও রোগের ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। আপনাদের শয্যাপার্শ্বে কত দিন-রাত্রি আমরা অনশনে কাটাইয়াছি। আপনাদের অভিভাবকগণের মৃত্যুকালে আমরা কত আঁখিজল ফেলিয়াছি। আমরা আমাদের রক্ত দিয়া আপনাদিগকে মানুষ করিয়াছি। নূতন কোন্ জাতি আসিয়া আপনাদিগের সেরূপ সেবাশুশ্রূষা করিবে?

এতকাল আমরা আপনাদের জন্য যাহা করিয়া আসিয়াছি ভবিষ্যতেও আমরা ঠিক সেইরূপই করিব। আমরা আপনাদের ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, শিক্ষা, রাষ্ট্র, ইত্যাদি সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই আপনাদের সহযোগী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া থাকিব। আমরা শ্বেতাঙ্গের স্বার্থকে নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া সকল বিষয়ে এক পরিবারভুক্তরূপে জীবন যাপন করিব। আবশ্যক হইলে এই ৮০ লক্ষ নিগ্রোজাতি প্রাণপাত করিয়া আমেরিকার গৌরব রক্ষা করিবে। প্রত্যেক নিগ্রোর জীবন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও 'ইজ্জতে'র জন্য উৎসর্গীকৃত, জানিয়া রাখিবেন।

জানিয়া রাখিবেন—নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ সামাজিক লেন-দেনে ও খাওয়া, পরায় পাঁচ আঙ্গুলের মত স্বতন্ত্র থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু এই দুই সমাজ যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয়' মঙ্গলের জন্য আমার এই বাহুর মত ঐক্য বিশিষ্ট। আমরা পরস্পর-সাপেক্ষ —আমাদের একতা মানবদেহের ন্যায় স্বাভাবিক গ্রন্থিপ্রসূত। দুইএর স্বার্থ সম্পূর্ণ এক।

আমেরিকাবাসী এক অঙ্গকে ছাড়িয়া অন্য অঙ্গকে পুষ্ট ও উন্নত করিতে পারিবে না। আমাদের প্রত্যেকের সম্মান ও স্বাধীনতা অপরের সম্মান ও স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিতেছে। আপনারা নিগ্রোজাতিকে দাবিয়া চাপিতে এবং পঙ্গু করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিয়া ফেলিবেন। তাহা না করিয়া আপনারা নিগ্রোকে আমেরিকার উপযুক্ত-সন্তানে পরিণত করিতে চেষ্টিত হউন, অভিভাবকের ন্যায় তাহাকে উৎসাহিত করুন, তাহাকে সাহায্য করুন, তাহার শিশুসুলভ চিন্তাশক্তিরাশিকে সংরক্ষিত, পরিপুষ্ট করুন, তাহার অনুন্নত কর্ম্মশক্তিগুলিকে নানা উপায়ে বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করুন। এই "সংরক্ষণে"র জন্য আপনাদের যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে, এবং যথেষ্ট অর্থব্যয় এবং সময়-ব্যয় করাও আবশ্যক হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে আপনারা এই সংরক্ষণ ও পরিপোষণ কার্য্যের জন্য যে ক্ষতি সহ্য করিবেন তাহা সমস্তই অল্পকালের মধ্যে সুদে আসলে উঠিয়া আসিবে। আপনাদের এই প্রয়াস অতি সত্বর সুফল প্রসব করিতে থাকিবে—যুক্তরাষ্ট্র ধন্য হইবে।

ভাবিয়া দেখুন আপনাদের কার্য্যফল কি হইবে। যদি আপনারা নিগ্রোজাতিকে এক্ষণে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে ৮০ লক্ষ নূতন কণ্ঠ হইতে আমেরিকার যশোগান উত্থিত হইবে—৮০ লক্ষ নূতন কণ্ঠে জননী জন্মভূমির বন্দনা গীত হইবে। আর যদি এক্ষণে আপনারা

স্বার্থত্যাগ করিয়া এই অবনত সমাজকে উন্নত করিতে চেষ্টিত না হন, তাহা হইলে, এই ৮০ লক্ষ কণ্ঠ আপনাদের বিরুদ্ধে সমস্ত সংসারময় নিন্দা রটাইতে থাকিবে। আজ যদি আপনারা নিগ্রোজাতির বাহুবল সংরক্ষিত করিবার প্রয়াসী হন, অনতিদূর ভবিষ্যতেই দেখিতে পাইবেন—১৬০ লক্ষ নূতন হস্তে আপনাদের মাতৃভূমির বোঝা তুলিয়া ধরা হইয়াছে—আপনাদের নিজের ঘাড় অনেকটা হাল্‌কা হইয়াছে। আর যদি আজ ইহাদের বাহুতে শক্তি পুষ্ট করিবার জন্য আপনারা সচেষ্ট না হন, তাহা হইলে দেখিবেন, আপনাদের বিপৎকালে ও দুঃসময়ে এই ১৬০ লক্ষ হাত আপনাদিগকে ধরিয়া পশ্চাতে টানিয়া রাখিতেছে। হয়, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের ⅓ অংশ শক্তি, না হয় আমরা ইহার ⅓ অংশ দুর্ব্বলতা। হয় আমাদের দ্বারা এই প্রান্তের কার্য্য-ক্ষমতা, চরিত্রবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ⅓ অংশ বাড়িবে, না হয় ইহার ⅓ অংশ অপটুত্ব, চরিত্রহীনতা এবং অজ্ঞতা বাড়িবে। হয় আমরা দক্ষিণপ্রান্তের আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির যন্ত্র স্বরূপ হইয়া থাকিব, না হয় আমাদের প্রভাবে আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবনতির দিকে এই অঞ্চলকে নামিতে হইবে।

তার পর প্রদর্শনীর কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট আমার নিবেদন। আজ আমরা আপনাদের এই বিরাট আয়োজনে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু আমরা বেশী কিছু প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। আপনারা নিগ্রোজাতির নিকট এত শীঘ্র বেশী কিছু আশা করিতে পারেন না।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে আমরা কেনা গোলাম ছিলাম। যখন স্বাধীনতা পাই, তখন দুটা একটা কম্বল, দুটা চারটা মুরগীর ছানা অথবা দুটা চারিটা শাকশব্জী মাত্র আমাদের সম্বল ছিল। সেই-টুকুই আমাদের মূলধন জানিয়া রাখিবেন। সে সব কথা আর মনে করাইয়া দিতে হইবে কি? এই নিঃসম্বল অবস্থায়ই ত্রিশ-বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে নানা কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইয়াছে। কৃষিকর্ম্মের যন্ত্র হাতিয়ার বলুন, গাড়ীজুড়ি বলুন, এঞ্জিনষ্টীমার বলুন, সংবাদপত্র পুস্তকাদি বলুন, চিত্রকলা, মূর্ত্তিগঠনই বা বলুন, অথবা দোকানদারী এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনাই বলুন—সকলই আমাদিগকে শিশুর মত আরম্ভ করিতে হইয়াছে। বিনা মূলধনে ও বিনা অভিজ্ঞতায়, আমরা এই সকল কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছি। ত্রিশবৎসরের ভিতর কত ফলই বা পাইতে পারি? তথাপি যে আপনাদের বিরাট কাণ্ডের এক কোণে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখাইতে পারিয়াছি ইহাই বিস্ময়ের কথা।

এই সঙ্গে আমি শ্বেতাঙ্গ-সমাজকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণ প্রান্তের শ্বেতাঙ্গ জনগণ হইতে আমরা গত ত্রিশবৎসর অশেষ সাহায্য ও পরামর্শ পাইয়াছি। উত্তর অঞ্চলের ধনী মহাত্মারাও আমাদিগকে ধনদান করিয়া নানা উপায়ে কর্ম্মজীবনে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। আজ আমরা আপনাদের সম্মুখে যাহা উপস্থিত করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য শ্বেতাঙ্গ-সমাজের নিকট আমরা

সত্যসত্যই ঋণী। আপনাদের সাহায্য না পাইলে এত অল্পকালের ভিতর নিগ্রোজাতি এই উন্নতি দেখাইতে পারিত না।

পুনরায় আমি দক্ষিণ প্রান্তের জননায়কগণকে বলিতেছি—এই প্রদর্শনী ও সম্মিলনের ন্যায় শুভ অবসর আমাদের দুই সমাজের পক্ষে আর আসে নাই। কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ সমাজের সৌহার্দ্দ্য ও মিলনের সূত্র এইবার যেরূপ দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিত হইল আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর আর কখনও সেরূপ হয় নাই। আজ এই মিলন-মন্দিরে দাঁড়াইয়া ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি, এবং নিবেদন করিতেছি যে, নিগ্রোসন্তান অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও শ্বেতাঙ্গকে ভাই বলিয়া জানিবে। আপনারাও ভগবানের কৃপায় আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্ত হউন, আমাদের উন্নতিকে আপনাদের উন্নতি বিবেচনা করিতে শিখুন এবং দুই জাতিকে অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে সম্মিলিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে যুগান্তর সৃষ্টির সহায়তা করুন। ভ্রাতৃভাবের বৃদ্ধি হইলেই এই প্রদর্শনীর সার্থকতা হইবে।

এইরূপে পরজাতিবিদ্বেষ ও পরজাতিপীড়ন আমেরিকা হইতে লুপ্ত হইলেই এবং জাতিনির্ব্বিশেষে ন্যায্য বিচারের প্রবর্ত্তন ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাগের ব্যবস্থা করিলেই এখানে নবজীবন আসিবে। সেই নবজীবনের আবির্ভাবেই আজকার এই কৃষি, শিল্প, চিত্র, মূর্ত্তি, ও ব্যবসায়ের প্রদর্শন যথার্থ ফলপ্রসূ হইবে। সেই নূতন 'জাতীয়' ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলেই এবং সেই নবীন আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিকাশ হইলেই, এই লোহালক্কড় ইট কাঠ ছবি ছাপার প্রচার সার্থক হইবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

নানা কথা

আমার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র জর্জ্জিয়ার শাসনকর্ত্তা বুলক মঞ্চের উপর দৌড়াইয়া আসিয়া আবেগভরে আমার হাত ধরিলেন। এইরূপে অসংখ্য লোক আমাকে সুখ্যাতি করিতে লাগিল। সভাস্থল আমার জন্য জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

আমি আটলাণ্টা হইতে টাস্কেজীতে ফিরিয়া আসিলাম। রাস্তায় লোকজন আমাকে দেখিয়া অভিবাদন করিয়া কৃতার্থবোধ করিতেছিল। তিনমাস ধরিয়া যুক্তরাজ্যের উত্তর দক্ষিণ সকল প্রান্তের সংবাদপত্রই আমার প্রশংসা চালাইতে লাগিল। দেশের প্রসিদ্ধ পত্রিকাসম্পাদকগণ একবাক্যে বক্তৃতার সাধুবাদ করিতে থাকিলেন।

টাস্কেজীতে আমার নিকট কত পত্র আসিল। নানা দলের কর্ত্তারা আমাকে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জন্য বক্তারূপে নিযুক্ত করিতে চাহেন। এক সম্প্রদায় আমাকে লিখিলেন—"আপনি যদি আমাদের জন্য স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিবার ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে এককালীন ১৫০,০০০্ দিতে প্রস্তুত আছি।

অথবা প্রত্যেক রাত্রে ৬০০৲ করিয়া আপনার পারিশ্রামিক দিতে পারি।” আমি এই সকল সম্প্রদায়কে নম্রভাবে উত্তর দিতাম, “আমি আমার জীবন-ব্রত টাস্কেজী-বিদ্যালয়েই উদযাপন করিব। সুতরাং আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি নিতান্তই অসমর্থ। অধিকন্তু বক্তৃতা করাকে জীবনের ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিতে আমি পারিব না। আপনারা আমায় মাপ করিবেন।”

এই সময়ে ক্লীভল্যাণ্ড যুক্ত-রাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ শাসনকর্ত্তা বা সভাপতি ছিলেন। তাঁহার নিকট ওয়াশিংটনদরবারে আমার বক্তৃতার একটা নকল পাঠাইয়াছিলাম। তিনি স্বহস্তে পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন, আটলাণ্টা-প্রদর্শনীতে যদি অন্য কোন কাজও না হইত, এবং কেবলমাত্র আপনার বক্তৃতার জন্যই যদি এই সম্মিলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলেও ঐ অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইত না। আপনার বক্তৃতায় কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইবে।”

তাহার পর ক্লীভল্যাণ্ড প্রদর্শনী দেখিতে আটলাণ্টায় আসেন। সেই সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করি। আমার অনুরোধে তিনি নিগ্রোবিভাগে প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি যত্নসহকারে দেখিলেন। এই সুযোগে অনেক নিগ্রো পুরুষ ও রমণী তাঁহার সঙ্গে করমর্দ্দন করিল। বহুলোকে তাঁহার নিজ হাতের সহি নাম লইয়া রাখিতে উৎসুক হইল। তিনি তাঁহাদের খাতায় বা কাগজে বেশ আদরের সহিত স্বীয় নাম লিখিয়া দিলেন।

এইবার আমার স্বজাতির কথা বলি। তাহারা প্রথম প্রথম

আমার বক্তৃতার বেশ সুখ্যাতিই করিল। আমার প্রতিপত্তিতে তাহারা গৌরববোধ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের মত বদলাইয়া গেল। তাহারা ভাবিল—আমি বড়ই সাদাসিধা লোক —আমার রাষ্ট্রীয় মতগুলি নিতান্তই নরম সুরের। তাহাদের মনে হইল, আমি শ্বেতাঙ্গদিগের প্রশংসা অত্যধিক করিয়াছি। তাহাদের বিচারে আমার বেশ কিছু গরম গরম কথা বলা উচিত ছিল—নিগ্রোদিগের অধিকার এবং দাবীদাবা খুব জোরের সহিত প্রচার করা উচিত ছিল। তাহারা ক্রমশঃ কাগজে আমার নিন্দা সুরু করিল। তাহাদের বিশ্বাস, আমি আমার কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করিয়াছি। আমি ভীরু ও দায়িত্ববোধহীন, আমি সুযোগ পাইয়াও নিগ্রোজাতির কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

নিগ্রোসমাজে আমার দুর্নাম রটিতে থাকিল। এই সঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। টাস্কেজীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ এই বক্তৃতার প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে কোন সম্পাদকের অনুরোধে আমি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে নিগ্রোসমাজের ধর্ম্মগুরুদিগের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। অনেক স্পষ্ট কথা লিখিতে হইয়াছিল। সুতরাং আমার প্রদত্ত চিত্র নিগ্রোসমাজের পক্ষে রুচিকর হয় নাই। ধর্ম্মগুরুরা আমার উপর ক্ষেপিয়া গেলেন—আমার স্কুল ভাঙ্গিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন। এমন কি এজন্য তাঁহাদের 'আড়কাটী'ও নিযুক্ত হইল। তাহারা আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ভাগাইবার জন্য প্রাণপণ করিতে থাকিল।

অনেক সংবাদপত্রও আমার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে যোগ দিল। কেহ কেহ আমাকে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য আহ্বান করিল।

আমি কোন কথা বলিলাম না—চুপ করিয়া রহিলাম। আমার উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেল। আমি নিজের কথা সপ্রমাণ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টিত হইলাম না—আমার বাক্যের ও চরিত্রের তীব্র সমালোচনাগুলিতেও কর্ণপাত করিলাম না। আমি বুঝিতাম, আমি কর্ত্তব্য করিয়াছি—যথাসময়ে আমার কৈফিয়ৎগুলি লোকেরা আপনাআপনিই বুঝিতে পারিবে। আমার আত্মরক্ষার জন্য এখন বাজারে নামিয়া প্রতিবাদ বা কথা কাটাকাটির প্রয়োজন নাই।

সত্যই তাহা হইল—ক্রমশঃ লোকেরা আমার মতই মানিয়া লইতে বাধ্য হইল। ধর্ম্মগুরুগণের চরিত্র সম্বন্ধে নানা স্থান হইতে নানা আপত্তি উঠিতে লাগিল, আমি ধীরভাবে দেখিতে লাগিলাম—কালপ্রভাবেই আমার কৈফিয়ৎ সমাজে পৌঁছিয়াছে।

এই আটলাণ্টা-বক্তৃতা সম্বন্ধেও তাহাই করিলাম। নিগ্রো-সমাজের প্রতিকূল সমালোচনায় চুলমাত্র বিচলিত হইলাম না। সংবাদপত্রে আমার নিজের মত খোলসা করিয়া বলিবার প্রয়োজন বোধও করিলাম না।

ইতিমধ্যে হপকিন্স-বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত গিলম্যান পত্র লিখিলেন, "মহাশয়, আটলাণ্টা-প্রদর্শনীর পুরস্কার নির্ব্বাচন-ব্যাপারে আপনাকে একজন পরীক্ষক মনোনীত করা হইয়াছে। আপনাকে শিক্ষা-বিভাগের প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিতে

হইবে। আপনার সময় হইবে কি? টেলিগ্রাফে উত্তর দিবেন।”

আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ উভয় প্রকার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের কার্য্যই আমাকে পরীক্ষা করিতে হইল। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের সঙ্গে একত্র হইয়া আমি কার্য্য করিলাম।

আমি বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদিগের সভায় বক্তৃতা করিতে পাইলে সুখী হই। বষ্টন, নিউ-ইয়র্ক, শিকাগো এবং বাফেলো ইত্যাদি নগরের ব্যবসায়িগণ অত্যন্ত ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সহজেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের সার কথা বুঝিয়া লইতে পারেন। ইহাঁদিগকে বেশী কথা বলিতে হয় না। ইহাঁরা অল্প কথার মানুষ। এই মহলে বক্তৃতা করিয়াই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ পাইয়াছি।

তাহার পর আমি দক্ষিণ অঞ্চলের লোকজনকে শ্রোতৃ-মণ্ডলীরূপে পাইলে আনন্দিত হই। ইহারা বেশ উৎসাহ-শীল—সামান্য মাত্র উত্তেজনা পাইলেই বক্তাকে মাথায় করিয়া রাখিতে চায়।

আমি এই হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে তৃতীয় স্থান দিয়া থাকি। হার্ভার্ড, ইয়েল, উইলিয়ম্‌স্‌, আমহার্ষ্ট, ফিস্ক, পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া, ওয়েলেস্‌লি, মিচিগান, ইত্যাদি আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক-গণের সভায় আমার বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। ছেলে মহলে

বক্তৃতা দিয়া আমার বেশী সুখ হয় না। আমি কাজের লোক পাইলেই খুসী হই।

বাজারে একটা গুজব রটিয়াছে যে, নিগ্রো-রমণীদিগের মধ্যে শতকরা ১০ জনের চরিত্রও সৎ কি না সন্দেহ। এরূপ মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা নিতান্তই অন্যায়। কোন সমাজ সম্বন্ধেই চরিত্রবিষয়ক মত প্রকাশ করা বড় কঠিন। আমি যদি নিউ-ইয়র্ক নগরের জঘন্য মহল্লার লোক সংখ্যা গণনা করিয়া সপ্রমাণ করিতে চাহি যে, শ্বেতাঙ্গ সমাজে সচ্চরিত্রা রমণী একজনও নাই, তাহাও এইরূপ দায়িত্বহীন মত প্রচার হইবে না কি?

আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পর যুক্ত-রাষ্ট্রের নানাস্থানে শান্তি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য নানা উদ্যোগ হয়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আমাকে এক উৎসবে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করেন। ১৬ই অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যা-কালে সভা হয়। এত বড় সভায় আমি আর কখনও বক্তৃতা দিই নাই। ১৬০০০ লোক সভায় উপস্থিত ছিল।

এই সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উইলিয়ম ম্যাক্ কিন্‌লিও উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া বলিয়া-ছিলাম, "আপনার উদারতায় নিগ্রোজাতি স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কৃষ্টাঙ্গ আমেরিকা-সন্তান তাহার শ্বেতাঙ্গ ভাইএর সঙ্গে একক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে কর্ম্ম করিয়াছিল। এই জন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।" এই সুযোগের

কথা শুনিবামাত্র সভামণ্ডপ মুখরিত করিয়া সভাপতি মহোদয়ের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্‌লি জনমণ্ডলীকে অভিবাদন করিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অমনি আবার গভীরতর জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে গেলে একটা বিপদে প্রায়ই পড়িতে হয়। কতকগুলি হুজুগের পাণ্ডাদিগের পাল্লা এড়ান বড়ই মুস্কিল। ইহাঁরা ‘রাতারাত’ বড়লোক করিবার উপায় প্রচার করিয়া বেড়ান। বিনা ক্লেশে নিগ্রোজাতির উদ্ধার সাধনের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহাঁরা হাটে বাজারে লোক জমা করেন। ইহাঁরা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ইত্যাদির একেবারেই পক্ষপাতী নন। ইহাঁরা অনেক সময় কেবল তর্কের খাতিরেই তর্ক করেন। যুক্তিতে পরাস্ত হইলেও ইহাঁরা তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। এই সকল ভবঘুরে তার্কিকদিগকে আমি দূর হইতে নমস্কার করি। তথাপি আমাকে বহুবার ইহাদের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে শক্তির অপব্যয় করিতে হইয়াছে।

আর এক জাতীয় লোক আছে। তাহারা নামজাদা লোকের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া আনন্দ পায়। ইহারা একপ্রকার উৎপাত বিশেষ। কোন কাজ কর্ম্ম নাই—লোকের সময় নষ্ট করাই ইহাদের স্বধর্ম্ম। একদিন সন্ধ্যাকালে বোষ্টন-নগরের এক বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছি। পরদিন সকাল হইবার পূর্ব্বেই দেখি আমার নিকট এক কার্ড উপস্থিত। আমি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া বৈঠকখানায় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির

হইলাম। যাইয়া দেখি একটি লোক বসিয়া আছে। সে বলিল "কাল রাত্রে আপনি বেশ ভাল কথা বলিয়াছিলেন। আমার ভাল লাগিয়াছে। তাই আজ সকালে আরও কিছু সৎকথা শুনিতে আসিলাম।"

আমার বন্ধুগণ আমাকে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ওয়াশিংটন, তুমি এত সময় পাও কোথায়? সর্ব্বদা ত তুমি বাহিরে বাহিরে দেশভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতেছ? বক্তৃতা দিতেই তোমার সকল সময় চলিয়া যায়! তোমার টাস্কেজীর কাজকর্ম্ম চলে কিরূপে? অথচ টাস্কেজী ত দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে দেখিতেছি।"

এই সকল প্রশ্নের আমি সাধারণ উত্তর দিয়া থাকি—"দেখ, একটা মামুলি কথা আছে যে, 'নিজে যে কাজ করিতে পার অপরকে সেই কাজ করিতে বলিও না।" আমি কিন্তু এই প্রবাদ বাক্য মানি না। আমি আর একটা নূতন নিয়ম করিয়াছি। আমার মত এই যে, 'অন্য লোকে যে কাজটা বেশ ভাল করিয়া করিতে পারে, তাহার জন্য তুমি মাথা ঘামাইও না। তাহাকেই সেই কাজ করিতে দাও। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অন্যান্য কাজ করিতে থাক।" এই নিয়ম অনুসারে চলি বলিয়া আমার টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের কাজও কম হয় না, অথচ আমিও প্রায়ই টাস্কেজীর বাহিরে বাহিরে নানা কাজ করিয়া কাটাই।"

টাস্কেজী-বিদ্যালয় আজকাল বেশ পাকা বন্দোবস্তের উপর দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহার পরিচালনার নিয়ম অতি সুন্দর ও

শৃঙ্খলাযুক্ত রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একজন লোকের অভাব হইলে ওখানকার কার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কোন একজন ব্যক্তিকেই সর্ব্বদা এখানে লাগিয়া না থাকিলেও চলে। আজ আমাদের কর্ম্মচারীদিগের সংখ্যা ৮৬। শ্রমবিভাগ এবং দায়িত্ববিভাগ এত সুন্দর ভাবে করা হইয়াছে যে, কলের মত কাজ চলিতে থাকে। অধিকাংশ শিক্ষক ও কর্ম্মচারীই অনেক দিন হইতে এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমার মত ইঁহারাও এই বিদ্যালয়ের জন্য দায়িত্ব বুঝিয়া চলেন। ইঁহারা সকলেই নিজের কাজ স্বরূপ বিদ্যালয়ের কাজগুলি করিয়া থাকেন।

অধিকন্তু, আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, টস্কেজীর সকল খবর রোজই আমার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। আমি এজন্য দৈনিক কার্য্যাবলীর হিসাব রাখিবার এক অতি সহজ নিয়ম বাহির করিয়াছি। এই কার্য্যতালিকা ও হিসাব-বহি দেখিয়া আমি প্রতিদিনকার আয়, খরচ পত্র, ছাত্র সংখ্যা, কারখানাগুলির অবস্থা, কৃষিক্ষেত্রের আমদানী রপ্তানী, দেনা পাওনা, শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বন্ধ ইত্যাদি সকল কথাই বুঝিয়া লই। এমন কি, কোন্ ছাত্র কি কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারিল না, তাহা পর্য্যন্ত এই দৈনিক কার্য্যতালিকা হইতে জানিবার উপায় আছে। অধিক কি বলিব, মাংস আজ কাঁচা রান্না হইয়াছে কি পুড়িয়া গিয়াছে, এবং আজকার শাক শব্জীগুলি বাজার হইতে কিনিয়া আনা হইয়াছে কি আমাদের বাগান হইতেই আনিয়াছে, তাহাও আমি ৪০০০ মাইল দূরে থাকিয়া জানিতে পাই।

আমি প্রতিদিনই আমার দৈনিক কাজ শেষ করিয়া ফেলি। সুবিধা হইলে পর দিনের কাজও খানিকটা করিয়া রাখি। অবশ্য সর্ব্বদাই আমি দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকি। সকালের কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়েই আমি ধরিয়া রাখি—আজ হয়ত কোন ঘরে আগুন লাগিবে, অথবা ছাত্রদের কোন দুর্ঘটনা ঘটিবে, অথবা কোন সংবাদপত্রে আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে দেখিতে পাইব, অথবা বাজারে আমার নিন্দা রটিতেছে শুনিতে পাইব। আমি প্রথম হইতেই এইরূপ দুর্ঘটনা, লোকনিন্দা, অপমান ও বিফলতার জন্য বুক বাঁধিয়া রাখি। এজন্য যখন আমার উপর দিয়া বিপদ বহিয়া যায় আমি বিচলিত হই না—গম্ভীরভাবে স্থির-চিত্তে সকল যাতনা, নৈরাশ্য ও বেদনা সহ্য করিতে থাকি। চিত্তকে প্রশান্ত রাখিবার জন্য আমি পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ বিফলতার কথা ভাবিয়া রাখি। কাজেই বিফলতা আমাকে কাবু করিতে পারে না।

আমি অবকাশ কাহাকে বলে জানি না। বিগত ১৯ বৎসরের ভিতর আমি একদিনও কার্য্য হইতে ছুটি লই নাই। তবে ১৮৯৯ সালে কয়েক জন বন্ধু জোর করিয়া আমাকে ইয়োরোপ ভ্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারাই সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। এই জন্য তিন মাস আমার পূরাপূরি ছুটি ঘটিয়াছিল। তাহা ছাড়া বিশ্রাম, আরাম, বিদায় আমি কখনই ভোগ করিতে চেষ্টা করি নাই। আমি প্রতিদিন সুখে ঘুমাইবার আয়োজন করি। যথারীতি ঘুমাইতে পাইলে আমার কোন ক্লান্তির কারণ থাকে না।

এখন শরীরকে এমন স্ববশ করিয়া ফেলিয়াছি যে, ২০ মিনিট মাত্র ঘুমাইতে পাইলেই নূতন উদ্যমে নূতন কাজে লাগিয়া যাইতে পারি।

আমি কখনও কিছু পুস্তকাদি পাঠ করি কি? রেলগাড়িতে চলিতে চলিতেই যেটুকু পড়িবার সুযোগ পাই তাহা ছাড়া আমার ভাগ্যে আর পড়িবার সময় জুটে না। সংবাদপত্র পাঠ করিতে আমি বড়ই ভালবাসি। এ সব যত পাই তত পড়ি—ভাল মন্দ বিচার করিয়া দেখি না—এগুলি পড়া আমার একটা নেশা। উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি আমি চোখে দেখিতে পারি না। অনেক সময়ে 'সভ্যতার খাতিরে' মহাবিখ্যাত দুই একটা উপন্যাস পড়িতে বাধ্য হইয়া থাকি! তাহা না হইলে বন্ধুমহলে এবং ভদ্রসমাজে মুখ দেখান কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রন্থের মধ্যে জীবন-চরিতগুলি আমার অতি প্রিয় বস্তু। আমি কোন কাল্পনিক ঘটনা বা ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিতে পছন্দ করি না। রক্তমাংসের মানুষ সংসারে যাহা যাহা করিয়াছে আমি সেই সমুদয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত জানিতে উৎসুক। মহাপ্রাণ সভাপতি আব্রাহাম লিঙ্কলন্ সম্বন্ধে আমেরিকার সংবাদপত্রে, সমালোচনাপত্রে এবং গ্রন্থে ও পুস্তিকায় যে কোন রচনা প্রকাশিত হইয়াছে বোধ হয় আমি তাহার কোনটাই পড়িতে ছাড়ি নাই। সাহিত্য-সংসারের তিনি আমার ধ্রুবতারা। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিয়াই আমি আমার কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকি।

বৎসরে বোধ হয় প্রায় ছয় মাস আমি টাস্কেজীর বাহিরে

কাটাই। ইহাতে আমার অনেক উপকার হয়। প্রথমতঃ কার্য্য পরিবর্ত্তনই একটা বিশ্রাম স্বরূপ। নূতন নূতন লোকের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অভিনব কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া নবজীবন লাভ করি। দ্বিতীয়তঃ একস্থানে থাকিলে সেই ক্ষেত্রের খুটিনাটিগুলি লইয়া দিন কাটাইতে হয়। একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জীবন ঘুরিতে থাকে। কর্ম্ম ও চিন্তাশক্তির বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ চিত্তে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের অভাব ঘটিতে থাকে। কিন্তু তফাতে থাকিলে সেখানকার দোষ ও অসম্পূর্ণতাগুলি সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। খানিকটা দূর ও বিস্তৃত দৃষ্টির সহিত সেই প্রতিষ্ঠানকে দেখিবার সুযোগ আসে। তৃতীয়তঃ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মকেন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞান বাড়িতে থাকে। বিদ্যাদানের বিচিত্র নিয়মগুলি নিজ চোখে দেখিয়া অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এতদ্ব্যতীত বড় বড় পণ্ডিত, অধ্যাপক, বিজ্ঞানবীর, শিক্ষাপ্রচারক ও সাহিত্যরথীদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় এবং ভাব বিনিময় হইতে থাকে। তাহাতেও বিশেষ লাভবান্ হওয়া যায়।

ষোড়শ অধ্যায়

ইয়োরোপে তিনমাস

১৮৯৯ সালে, আমার ৩৯।৪০ বৎসর বয়সে আমি ইয়োরোপে বেড়াইবার সুযোগ পাই। এই সুযোগ অতি অভাবনীয়রূপে আসিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আমার ইয়োরোপ-ভ্রমণের সামান্য মাত্র আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাকালে বষ্টননগরের কয়েকজন ইয়াঙ্কি রমণী টাস্কেজীবিদ্যালয়ে অর্থসাহায্যের জন্য একটা সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। ধুমধামের সহিত ঐ সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমিও সভায় উপস্থিত ছিলাম। একজন আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “ওয়াশিংটন মহাশয়, আপনাকে বড়ই দুর্ব্বল ও ক্লান্ত বোধ হইতেছে। আপনি খাটিয়া খাটিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। আপনার কিছুকাল কাজকর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদায় লওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ মানসিক উদ্বেগ নিবারণের জন্য চেষ্টিত হওয়া উচিত।” এমনি আর একজন বলিলেন, “এদেশ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিলেই আপনার উদ্বেগ কমিবে। দূরদেশে থাকিলে টাস্কেজীর জন্য চিন্তা কম করিতে হইবে। মনে শান্তি সর্ব্বদাই

থাকিবে। ২৪ ঘণ্টা ভাবিয়া কাটাইবার প্রয়োজন হইবে না।” সেই সঙ্গে একজন তৃতীয় শ্বেতাঙ্গ রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কখনও ইয়োরোপ দেখিয়াছেন কি?” আমি অপর দুইজনকে বিশেষ কিছু বলিলাম না—আমার জন্য তাঁহারা চিন্তিত, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এই রমণীকে বলিলাম, “ইয়োরোপ যাইবার কথা এতদিন কখনও আমার মনেই আসে নাই।”

কিছুদিন পরে একখানা পত্র পাইলাম, “বোষ্টনের কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণী আপনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আপনার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আপনি কিছুকাল ইয়োরোপ ভ্রমণ করুন—এইরূপ তাঁহাদের ইচ্ছা। আপনাকে যাইতেই হইবে। এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন না। আমরা আপনার কাজের জন্য, আপনার বিদ্যালয়ের জন্য, আপনার জাতির জন্য এই অনুরোধ অথবা আজ্ঞা করিতেছি। আশা করি, আপনি নিগ্রো-সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদিগের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবেন।”

আমি আমার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুগণকে জানাইলাম, “আপনাদের অনুগ্রহপত্র পাইয়া যার পর নাই কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু আমার পক্ষে আমেরিকা ত্যাগ করা সম্প্রতি অসম্ভব। বৎসর খানেক পূর্ব্বে কথাচ্ছলে আমার একজন ধনী বন্ধু আমাকে এজন্য সমস্ত খরচ দিতে চাহিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছি। আমি আমার কাজে একেবারে ডুবিয়া আছি

বলিলেই চলে। সেই বন্ধুর অনুরোধের কথা আমার মন হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, আপনাদের এই পত্র পাইবার পূর্ব্বে তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। যাহা হউক, আমি আপনাদের সম্মান রক্ষা করিতে পারিলাম না। আমি আমেরিকা ছাড়িয়া গেলে, টাস্কেজীর অন্যান্য ক্ষতি কিছু হইবে না। কিন্তু আজকাল খরচ এত বাড়িয়াছে যে, সে সমুদয় আমি ব্যতীত আর কেহ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। সুতরাং আমার ইয়োরোপ ভ্রমণ এবং টাস্কেজীর সর্ব্বনাশ এক কথা।"

আমার পত্র পাইয়া একজন লিখিলেন,—"টাস্কেজীর খরচ-পত্রের জন্য ভাবিবেন না। আমরা তাহার সমস্ত দায়িত্ব লইতেছি। শ্রীযুক্ত হিগিনসন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ আপনার অনুপস্থিতিকালে বিদ্যালয়ের ব্যয়ের জন্য আবশ্যক টাকা দিবেন। তাঁহারা নিজেদের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আর আপত্তি করিবার আপনার অধিকার নাই।"

কাজেই আমি ইয়োরোপ যাইতে বাধ্য হইলাম। আমার মনে অনেক কথা আসিতে লাগিল। আমার শৈশবের গোলামাবাদ, গোলামখানার অনশন ও অনিদ্রা, যৌবনের কঠোর জীবনসংগ্রাম—সর্ব্বদা দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের সহিত পরিচয়—সকল চিত্রই সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রৌঢ় বয়সের পূর্ব্বে আমি কখনও টেবিলে বসিয়া খানা খাইবার সুযোগ পাই নাই। ইউরোপ, লণ্ডন, প্যারি,—এ সকল স্থানকে আমি মানবদুর্ল্লভ স্বর্গরাজ্য বিবেচনাই করিতে শিখিয়াছি। আজ আমি সেই স্বর্গ-

রাজ্যে বেড়াইতে চলিলাম! আজ আমি সুন্দর পোষাকে, সুখাদ্য ও সুপেয় উপভোগ করিতে করিতে ইয়োরোপ ভ্রমণে বাহির হইব! আমার নিকট সবই স্বপ্নের ন্যায় অলীক বোধ হইতে লাগিল।

আরও দুইটি চিন্তায় আমি কষ্ট পাইতে লাগিলাম। মনে হইল,—আমার স্বজাতি আমাকে কি বলিবে? তাহারা ত বুঝিবে না যে, আমি বাধ্য হইয়া ইয়োরোপ যাইতেছি। তাহারা সহজেই ধরিয়া লইবে; আমার 'চাল' বাড়িয়াছে—আমি আজকাল বড়-লোকের সঙ্গে মিশি, বড়মহলে চলাফেরা করি, সুখে স্বচ্ছন্দে দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াই, এবং নানা উপায়ে নামজাদা লোক হইতে চেষ্টা করি। তাহারা আমার হৃদয়ের কথা ত বুঝিবে না —তাহারা আমাকে ক্ষমা করিবে না। তাহারা বলিবে, "জানি জানি খানিকটা কাজ করিবার পর সকলেরই মাথা বিগ্‌ড়াইয়া যায়—সকলেই 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করে। ঐ সেদিন দেখিলে না, আর একজন নিগ্রো অধঃপাতে গেল! ভাবিয়াছিলাম সেই লোকটার দ্বারা নিগ্রো-সমাজের উপকার হইবে। কিন্তু অল্প-দিনের ভিতরই, সে সকলকে অগ্রাহ্য করিতে সুরু করিল। সে যেন কি অপরূপ জীব স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে। সে আজ আমাদের পূজা চায়! ওয়াশিংটনও দেখিতেছি সেই বাবু-গিরি ও 'নৈতা'-গিরির পথ ধরিল। ভাই, কথায় বলে, প্রতিষ্ঠা ও যশের আকাঙ্ক্ষা সাধু পুরুষদেরও ছাড়ে না। আর, একবার প্রতিষ্ঠার দিকে নজর গেলে কোন লোকের দ্বারা সংসারের

উপকার হয় না। সুতরাং ওয়াশিংটনকেও খরচের খাতায় লেখ।”

এই ত গেল লোক-নিন্দার ভয়, তাহা ছাড়া আমার নিজের মনকে প্রবোধ দিতেও অনেক সময় লাগিল। আমি না হয় টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের জন্য ৩।৪ মাসের খরচ পত্র পাইলাম। না হয় ধরিয়া লইলাম, আমার অভাবে এ কয়দিনে টাস্কেজীর কোন ক্ষতিই হইবে না। কিন্তু আমি এতকাল না খাটিয়া, না ভাবিয়া থাকিব কি করিয়া? আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান কি নাই? আমি কি ভগবান্‌কে ফাঁকি দিতে বসিয়াছি? আমি এইরূপ বিদায় লইয়া কি স্বার্থ-পরতা দেখাইতেছি না? কাজ ছাড়িয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব—জীবনে আর কোন দিন অবকাশ ভোগ ত করি নাই।

যাহা হউক, যাইতে বাধ্য হইলাম। ১০ই মে তারিখে রওনা হওয়া গেল। শ্রীযুক্ত গ্যারিসন এবং অন্যান্য ইয়াঙ্কি বন্ধুগণ ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে তাঁহাদের কয়েকজন বন্ধুর নিকট আমাকে পরিচয়-পত্র দিলেন। তাঁহারা নানা স্থানে লিখিয়া আমার জন্য থাকিবার ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন। নিউইয়র্কে জাহাজে উঠিলাম। জাহাজে থাকিতে থাকিতে একখানা পত্র পাইলাম। লেখা আছে দুইজন রমণী টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের স্ত্রীশিক্ষাবিভাগের জন্য গৃহনির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিবেন।

আমাদের জাহাজের নাম ফ্রিস্‌ল্যাণ্ড। রেড্‌ষ্টার লাইন

কোম্পানীর ইহা একখানা বৃহৎ ও সুন্দর জাহাজ। পূর্ব্বে আমি কখনও এত বড় সমুদ্র-পোতে চড়ি নাই। সুতরাং এদিক ওদিক ঘুরিয়া জাহাজ দেখার কৌতুহল মিটাইয়া লইলাম। ভাবিয়াছিলাম, জাহাজে নিগ্রো বলিয়া আমার যথেষ্ট অসম্মান ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু আমার সেরূপ কিছু ভোগ করিতে হইল না। জাহাজের কাপ্তেনেরা আমাকে চিনিতেন, বুঝিতে পারিলাম।

জাহাজ ছাড়িবার পর হইতে বহুদিনের বোঝা যেন একসঙ্গে আমার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। আমি আমার কামরার মধ্যে রোজ ১৫ ঘণ্টা করিয়া ঘুমাইতাম। তখন বুঝিলাম, সত্য সত্যই আমার শারীরিক ক্লান্তি ও দুর্ব্বলতা কত বেশী ছিল। এই কয়দিন একস্থানে এক বিছানায় এতক্ষণ ঘুমাইতাম, অথচ দিনে রাত্রের মধ্যে কোন সময় নির্দ্দিষ্ট কোন কাজই ছিল না। আমার জীবনে এইরূপ অভিজ্ঞতা আর কখনও পাই নাই। আমি সেই বাল্যকথাগুলি স্মরণ করিলাম—সেই যখন আমি একরাত্রে তিন পল্লীর মেজেতে শুইয়া অনশনে কাটাইয়াছি।

দশদিন জাহাজ চলিয়া বেলজিয়াম দেশের এ্যান্টোয়ার্প নগরে পৌঁছিল। সেদিন ওদেশে একটা ছুটির দিন ছিল। সকলেই আনন্দে উৎসবে মগ্ন। বেলজিয়ামের লোকেরা বৎসরে এইরূপ অনেক আনন্দের দিন সুখে কাটাইয়া থাকে। সহরের বড় মাঠের সম্মুখেই আমার হোটেল। আমার কামরা

হইতে সেই উদ্যানের সকল দৃশ্যই দেখিতে পাইলাম। পল্লী হইতে নগরে কত লোক আসিয়াছে। নানা রংয়ের ফুল বিক্রী হইতেছে। স্ত্রীলোকেরা দুধের ভাঁড় আনিয়াছে। ভাঁড়গুলি খুব বড় বড় ও চক্‌চকে। কুকুরে এই সকল বহিয়া আনে। লোকজন গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। এই দৃশ্য আমার চোখে সম্পুর্ণ নূতন জগতের বার্ত্তা আনিয়া দিল।

কিছুকাল এই সহরে কাটাইলাম। পরে কয়েকজন বন্ধুর নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে হল্যাণ্ডদেশ দেখিতে গেলাম। দলে কয়েকজন ইয়াঙ্কি পুরুষ ছিলেন। আমার জাহাজেই ইহাঁরা আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রকর—ছবি আঁকিতে বেশ নিপুণ। হল্যাণ্ড ভ্রমণটা অতিশয় সুখকরই হইয়াছিল। একটা পুরাতন ধরণের নৌকায় করিয়া হল্যাণ্ডের খালে খালে বেড়াইতে পাইয়াছিলাম। এই উপায়ে এদেশের পল্লী-জীবন অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। খাল দিয়া পল্লীগ্রামগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা রটার্ডামে পৌঁছিলাম। তার পর হেগ্ দেখিতে গেলাম। সেখানে তখন জগতের রাষ্ট্র-নীতিবিশারদেরা শান্তি-সম্মিলনে ব্যাপৃত। আমাদের স্বদেশীয় প্রতিনিধিরাও এ সভায় যোগ দিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া সুখ বোধ করিলেন।

হল্যাণ্ডের কৃষিকার্য্য আমার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। এখানকার পশুপালনও বেশ দক্ষতার সহিত হইয়া থাকে। হল্‌ষ্টাইন্-নগরের গাভী বলদ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

হল্যাণ্ডবাসী কৃষকেরা অতি সামান্য মাত্র ভূমি হইতে অত্যন্ত বেঁশী পরিমাণ ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যে ইহাদের ক্ষমতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পূর্ব্বে আমি কখন ভাবিতে পারিতাম না যে, অত কম জমি চষিয়া অত বেশী ফল পাওয়া যায়। দেখিয়া বোধ হইল, হল্যাণ্ডের এক ছটাক জমিও বাজে পড়িয়া নাই—সর্ব্বত্রই সুন্দর চাষ আবাদ হইতেছে। আর চারিদিকেই শস্যশ্যামল প্রান্তর,—তাহার উপর ৪০০।৫০০ বলিষ্ঠ গাভী আনন্দে বিচরণ করিতেছে। এরূপ গোচারণের মাঠ এবং সুন্দর কৃষিকার্য্য দেখিবার জন্য সকলেরই একবার হল্যাণ্ড যাওয়া উচিত।

হল্যাণ্ড হইতে আবার বেলজিয়ামে ফিরিয়া আসিলাম। এবারে এ্যাণ্টোয়ার্পে গেলাম না। ব্রসেল্‌সে অল্পক্ষণ ছিলাম। এখানে ওয়াটার্লুর যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া আসিলাম। পরে ফ্রান্সে চলিলাম—প্রথমেই প্যারিনগরে নামিলাম। পৌঁছিবামাত্রই এক নিমন্ত্রণ পাওয়া গেল। প্যারির ইউনিভার্সিটি-ক্লব আমাদের আমেরিকাবাসী কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ফ্রান্সের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি এই নিমন্ত্রণ-সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্বতন সভাপতি শ্রীযুক্ত হ্যারিসনকেও এই নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনিও উপস্থিত ছিলেন।

ভোজনান্তে যথাবিধি বক্তৃতা হইল। হ্যারিসন মহোদয় আমার কথা এবং টাস্কেজীবিদ্যালয়ের কথা সভামধ্যে প্রচার

করিলেন। আমার দ্বারা নিগ্রোসমস্যার কিরূপ মীমাংসা হইতেছে তাহাও তিনি কিছু বুঝাইলেন।

প্যারিনগরে আমেরিকার একজন নিগ্রো চিত্রকরের সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি ফ্রান্সে বেশ নাম করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম। সকল শ্রেণীর ফরাসীরাই ইঁহার কারুকার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। এমন কি লুক্সেমবার্গ প্যালাসের চিত্রভবনে তাঁহার হাতের কাজ রক্ষিত হইয়াছে। এত বড় চিত্রশালায় নিগ্রোর স্থান হইয়াছে শুনিয়া ফ্রান্সের ইয়াঙ্কিরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এই নিগ্রো চিত্রকরের নাম হেন্‌রি ট্যানার। তাঁহার সঙ্গে আমাদের আলাপও হইল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল, 'রূপেতে কি করে বাপু গুণ যদি থাকে ?' জগৎ গুণের দাস। বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলে সংসারের সকলকেই বশে আনা যায়। একথা আমি আমার নিগ্রো ভ্রাতাদিগকে সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি। ফ্রান্সে ট্যানারের প্রতিপত্তি দেখিয়া সেই কথা আমার বার বার মনে হইতে লাগিল। ইয়োরোপের ও আমেরিকার কত শত লোক ট্যানারের অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহ ত কখনও জিজ্ঞাসা করেন নাই—"ও গুলি কাহার তৈয়ারী ? সে ব্যক্তির চামড়া সাদা কি কাল, সে কি ইংরেজ না জার্ম্মাণ, না আমেরিকার নিগ্রো ?" যে ব্যক্তিই কোন কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিবে সে মানব-সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবেই করিবে। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে মানবজাতি দরিদ্র হইবে। শক্তিমানের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ফরাসীজাতিটাকে বড় হুজুগপ্রিয় বোধ হইল। ইহারা

সুখভোগে ও বিলাসে যেন হাবুডুবু খাইতেছে। ইহাদের নৈতিক চরিত্র বড় বেশী উচ্চ অঙ্গের ভাবিতে পারিলাম না। আমাদের কৃষ্ণাঙ্গসমাজ অপেক্ষা ফরাসীজাতির এ বিষয়ে কোন বেশী উৎকর্ষ লক্ষ্য করা গেল না। অবশ্য ইহারা আমাদের অপেক্ষা পুরাতন জাতি। ইয়োরোপের বিশাল মানবসমাজের মধ্যে থাকিতে থাকিতে ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধি খানিকটা বেশী মার্জ্জিত হইয়াছে। জীবনসংগ্রামের অত বড় আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নানা প্রকার সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়। আর, সংগ্রাম করিতে করিতে নানাবিধ শক্তি নূতন অর্জ্জিতও হইয়া থাকে। আমার স্বজাতিও কালে এইরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফরাসীরা জীবন কিছু আগে আরম্ভ করিয়াছে—আমরা সংসারে কিছু পরে আসিয়া দেখা দিয়াছি। এই যা প্রভেদ। ফরাসীদিগকে সত্যবাদী মনে হইল না। তাহারা কথার মূল্যও বেশী স্বীকার করে না। এ সকল বিষয়ে উহারা আমেরিকার নিগ্রোর অপেক্ষা উচ্চ স্তরের লোক কোন মতেই নয়। কোন কোন বিষয়ে নিগ্রোরাই উহাদের অপেক্ষা বোধ হয় উন্নত। কারণ জীবে দয়া ইহাদের নাই বলিলেই চলে। ইহারা গো-বলদ ইত্যাদি জীবজন্তুর প্রতি বড়ই নির্ম্মম। মোটের উপর, ফ্রান্স ছাড়িয়া যাইবার সময়ে আমার স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অতি উজ্জ্বল আশাই আমার চিত্ত অধিকার করিল।

প্যারি হইতে লণ্ডনে পৌঁছিলাম। তখন জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ। ইংলণ্ডের রাজধানীতে মহা সমারোহ চলিতেছে।

পার্ল্যামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন সুরু হইয়াছে। আমার ইয়াঙ্কি বন্ধুগণ প্রথম হইতেই ইংলণ্ডে অনেকের নিকট পত্র দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি পৌঁছিবামাত্র সকলেই আমাকে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি স্বাস্থ্যের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছি, এই আপত্তি তুলিয়া অনেকগুলি এড়াইতে পারিলাম। কিন্তু দুই একস্থলে আমি বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। লণ্ডনে, বার্ম্মিংহামে, ব্রিষ্টলে বড় বড় লোকেরা আমাকে অতিথি হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের অনেক স্থানেই গোলামী-নিবারণ-সমিতির বন্ধু ও সভ্যগণের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। তাঁহারা আমেরিকার দাসত্ব-প্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্যই করিতেন, বুঝিতে পারা গেল।

ব্রিষ্টলে এক মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করি। সেখানে রাণী ভিক্টোরিয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়।

পার্ল্যামেণ্টের কমন্স-ভবনে একদিন ষ্ট্যান্‌লি মহোদয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। তিনি আফ্রিকার অনেক গল্প করিলেন। তাহাতে বুঝিলাম, আমেরিকার নিগ্রোরা মাতৃভূমি আফ্রিকায় ফিরিয়া গেলে বড় সুখী হইতে পারিবে না। আমেরিকাকেই তাহাদের জন্মভূমি ও মাতৃভূমি বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমেরিকাই তাহাদের এক্ষণে স্বদেশ, সুতরাং ভূ-স্বর্গ।

আমি দুই চারিজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজের পল্লী-গৃহে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের পারিবারিক ও

সামাজিক জীবন দেখিয়া বোধ হইয়াছিল, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ অপেক্ষা ইংলণ্ডের শ্বেতাঙ্গেরা বেশী সভ্য ও সুখী। ইহাঁদের পারিবারিক প্রথা ও গৃহস্থালী আমার নিকট আদর্শ জীবনযাপন-প্রণালী মনে হইত। ইহাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে জানেন। কলের মত কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হয়।

এদেশের চাকরেরাও বেশ ভদ্রতা জানে। আমেরিকায় ভৃত্য ত পাওয়াই যায় না। আর তাহারা মনিবগণকে সম্মান আদৌ করে না। আমেরিকার চাকরেরা বুঝে যে, তাহারা দুই চারি বৎসরের ভিতরই হয় ত মনিব হইয়া পড়িবে! ইংলণ্ডের চাকরেরা চিরজীবন চাকরই থাকিবে, সুতরাং বড় আকাঙ্ক্ষা তাহাদের নাই। কোন্ নিয়ম ভাল? তাহার উত্তর এ যাত্রায় আর দিলাম না।

ইংলণ্ডের লোকেরা আইন ও শাসনের নিয়মগুলি সম্মান করিয়া চলে। অতি সহজেই এখানে বড় বড় কাজ নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ইংরেজজাতি কিছু বেশী ধীর—সকল কাজেই ইহারা সময় অধিক লইয়া থাকে। ইহাদের খানা খাইতে খুব বেশী সময় লাগে। স্থিতিশীল ইংরেজের উল্টা আমাদের আমেরিকার ইয়াঙ্কি। ইয়াঙ্কিরা বড়ই তড়বড়ে—২৪ ঘণ্টা চলাফেরা করিতেছে—সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, শশব্যস্ত—চুপ করিয়া অথবা সময় বেশী খরচ করিয়া কোন কাজ ইহারা করিতে জানে না। কিন্তু স্থিতিশীল ইংরেজেরা গতিশীল ইয়াঙ্কি অপেক্ষা মোটের উপর কম কাজ করে কি?

ইংরেজেরা আমেরিকাবাসীর তুলনায় গম্ভীর ও চিন্তাশীল। ইহারা কথায় কথায় হো হো করিয়া হাসে না বা কোন কিছু প্রস্তাবে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া যায় না। ইহারা শান্তভাবে বিষয়টা তলাইয়া দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করে।

ইয়োরোপে তিনমাস কাটিয়া গেল। পরে 'সেণ্টলুই' জাহাজে ইংলণ্ডের সাদাম্পটন বন্দর হইতে আমেরিকা যাত্রা করিলাম।

ফ্রান্সে থাকিতে থাকিতে আমি ওয়েষ্ট-ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশ হইতে দুইখানা পত্র পাই। এই প্রদেশের মাল্‌ডেন নগরে আমার বাল্যজীবন কাটিয়াছে। একখানা পত্র প্রদেশরাষ্ট্রের কর্ত্তা ও চার্লষ্টন-নগরের শাসন-কর্ত্তারা লিখিয়াছেন। আর এক-খানা চার্লষ্টনের নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ সমাজদ্বয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি-বৃন্দ ও জনসাধারণ লিখিয়াছেন। দুইটাতেই আমাকে ইয়োরোপ হইতে ফিরিবার সময়ে চার্লষ্টন হইয়া যাইবার অনুরোধ ছিল। আমি আমার বাল্য-লীলার নিকেতন হইতে এই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না।

যথা সময়ে চার্লষ্টনে গাড়ী হইতে নামিলাম। প্রদেশ-রাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা এবং অসংখ্য লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপরদিন বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তার গৃহে দরবার হইল। সেইখানে আমাকে লইয়া যথেষ্ট আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

উপসংহার

অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ওয়াশিংটন মহাশয়, আপনার জীবনের কোন্ ঘটনায় আপনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কারণ আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই বিস্ময়কর। তবে সকল কথা মনে মনে গভীর ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয়, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি শ্রীযুক্ত চার্লস্ উইলিয়ম এলিয়ট আমাকে যে পত্র লিখেন তাহাতেই বোধ হয় আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমার ইয়োরোপ ভ্রমণের দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এলিয়ট আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সালের মে মাসে অর্থাৎ আমার ৩৬.৩৭ বৎসর বয়সে এই পত্র পাই। তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে আমি আটলাণ্টা-সম্মিলনে বক্তৃতা দিয়া সমগ্র আমেরিকায় প্রসিদ্ধ হইয়াছি।

এলিয়ট আমাকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একটি অনারারি উপাধি দিতে চাহিয়াছেন। সেই উপাধি গ্রহণ করি-

বার জন্য আমাকে জুন মাসে তাঁহাদের উৎসবে যোগদান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার পত্রের মর্ম্ম।

আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়! তাহার কর্ত্তার নিকট হইতে "সম্মানে"র দান লাভ! যে সম্মানের দান আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীর ও সাহিত্যবীরগণ মাত্র পাইবার যোগ্য! আমি সত্য বলিতেছি এলিয়টের এই পত্র পাইয়া আমি যতদূর বিস্মিত হইয়াছিলাম এরূপ আর কখনও হই নাই।

হার্ভার্ডের এম্, এ উপাধি গ্রহণ করিতে যথাসময়ে ম্যাসাচুষেট্‌স্ প্রদেশের কেম্ব্রিজ-নগরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সমারোহের সহিত আমার হস্তে এম্, এ উপাধিসূচক প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইল। পরে এলিয়ট্ মহোদয় আমাকে এবং অন্যান্য যাঁহারা আমার মত 'সম্মানের দান' পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে একটা ভোজ দিলেন। সেই ভোজে অন্যান্য সকলের বক্তৃতার পর আমি বলিলাম,—

"আজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সম্মানিত করিয়া নিগ্রোজাতিকে সম্মানিত করিলেন। আপনারা আমাকে এই সম্মানের উপলক্ষ্য কেন করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনারাই দায়ী। আমিই ইহার উপযুক্ত হইলে যারপর নাই সুখী হইতাম, সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, আপনারা এই উপায়ে আমেরিকায় একটি প্রধান সমস্যার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষিত ও ধনবান্ ব্যক্তিগণ কিরূপে অশিক্ষিত ও দরিদ্র জন-

সাধারণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইতে পারিবেন—তাহাই এক্ষণে সকল আমেরিকা-সন্তানের একমাত্র ভাবিবার বিষয়। ঐ যে অনতিদূরে বীকন্‌ষ্ট্রীটের সুরম্য প্রাসাদসমূহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহাদের অধিবাসিগণ কি আলাবামাপ্রদেশের তুলার জমির চাষীদিগের এবং লুসিয়ানা প্রদেশের ইক্ষুর আবাদের কুলীগণের তপ্ত নিঃশ্বাস অনুভব করিতে পারিতেছেন? যুক্তরাষ্ট্রের স্বদেশ-সেবকগণের এক্ষণে আর কোন কর্ত্তব্য নাই। তাঁহারা আলোচনা করুন—কি উপায়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র; অবনত ও পদদলিত নরনারীর ক্রন্দন উন্নত, শিক্ষিত ও ধনবান্ ব্যক্তিগণের কর্ণে পৌঁছিবে?

সেই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ব্রতী হইয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি। আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় আমার ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গ, উচ্চশিক্ষাহীন নিগ্রোকে সম্মান করিয়া এদেশের নিম্নজাতিদিগকে ঊর্দ্ধে তুলিবার পথ প্রদর্শন করিলেন। ইহাতে হার্ভার্ড অবনত হইলেন না, অথচ আমাদের দরিদ্রের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল।

আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে আমার অবনত স্বজাতিকে নানা উপায়ে উন্নত করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। আমার নগণ্য শক্তির দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গসমাজে ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধনেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করা গিয়াছে। এত দিন আমার নিকট আমেরিকাজননী যাহা লাভ করিয়াছেন, আজকার এই গৌরবে ভূষিত হইবার পরও আমার নিকট সেইরূপ কর্ম্ম ও চিন্তাই আপনারা আশা করিতে পারিবেন।

আমি আমেরিকার জাতীয় আদর্শকে নিজ জীবনের আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমেরিকার সকল জাতিকে সেই জাতীয় আদর্শেই গঠিত দেখিতে চাহি। আমি শ্বেতাঙ্গের লক্ষ্য ও কৃষ্ণাঙ্গের লক্ষ্য দুইটা স্বতন্ত্র ভাবে দেখি না। আমার বিবেচনায় দুইএর লক্ষ্যই এক—দুই জাতিকেই আমেরিকার এক আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। দুইএর উন্নতি, অবনতি এক মাপকাঠিতেই বিচার করিতে হইবে।

আগামী ৫০ বৎসরের ভিতর আমার স্বজাতি সেই আমেরিকার ছাঁচে ঢালা হইয়া উন্নত হইতে থাকিবে—সকল বিষয়ে শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করিয়া বিকাশ লাভ করিবে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া নিগ্রোসমাজ শিল্পে, ব্যবসায়ে, সাহিত্যে, সেবায়, চরিত্রে ও ধর্ম্মে পরীক্ষিত হইতে হইতে কালে আমেরিকা জননীর অন্যতম সুদক্ষ অঙ্গে পরিণতি লাভ করিবে।"

আমি টাস্কেজীতে বিদ্যালয় স্থাপনকালে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, ভবিষ্যতে আমার বিদ্যালয় চূড়ান্ত উন্নত হইয়া উঠিবে। যুক্ত-দরবারের সভাপতিকে এই বিদ্যালয় দেখাইবার অযোগ্য হইবে না। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। ১৮৯৮ সালে সভাপতি ম্যাক্‌কিন্‌লি আটলাণ্টায় আসিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণ টাস্কেজীতে পদার্পণ করিয়া যান। ১৬ই ডিসেম্বর ক্ষুদ্র টাস্কেজী নগর মহা আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ উভয় সমাজই সভাপতি মহাশয়ের অভ্যর্থনায়

যোগদান করিল। আমার বিদ্যালয়ও যথেষ্ট সজ্জিত করা হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয় বক্তৃতাকালে বলিলেন, "টাস্কে-জীর প্রতিষ্ঠাতা বুকার ওয়াশিংটন নিগ্রোজাতির অন্যতম জন-নায়ক। ইনি স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়া-ছেন। ইহাঁর শিক্ষাপ্রচার, বাগ্মিতা এবং মানব-সেবা সর্ব্বত্র সুবিদিত।"

প্রায় ১৯ বৎসর ব্যাপী কার্য্যের পর টাস্কেজী-বিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির প্রথম পদার্পণ লাভ করিল। বিশ বৎসর পূর্ব্বে একটা পোড়ো বাড়ীতে আমাদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। তখন টাস্কেজীর ছাত্র সংখ্যা ৩০ এবং শিক্ষক মাত্র একজন। আজ আমাদের ৬৯০০ বিঘা জমি। তাহার ৩০০০ বিঘা ছেলেরা চাষ করে। আমাদের এক্ষণে ৬৬টা বড় বড় ইমারত—ইহাদের ৬২টা ছাত্রদের নিজ হাতে গড়া। আজ এই বিদ্যালয়ে ৩০ প্রকার কৃষি ও শিল্পবিষয়ক কাজ কর্ম্ম শিখান হইতেছে। আমাদের পাশ করা গ্রাজুয়েট আমেরিকার প্রদেশে প্রদেশে শিক্ষকতা ও ব্যবসায় বা শিল্পের কর্ম্মে নিযুক্ত। প্রতিদিন আমার নিকট এইরূপ পাশকরা লোকের জন্য এত তাগিদ আসে যে, অনেককেই আমি নিরাশ করিতে বাধ্য হই।

গৃহ সম্পত্তি ইত্যাদির মূল্য সম্প্রতি ২,১০০,০০০৲। এত-দ্ব্যতীত নগদ টাকা আছে ৩,০০০,০০০৲। বার্ষিক ব্যয় আজকাল ৪৫০,০০০৲। এই টাকার অধিকাংশই গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া আদায় হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের ছাত্র সংখ্যা ১৪০০

আমেরিকার ২৭ প্রদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা, কিউবা, পোর্টো রিকো, জামেকা ইত্যাদি দূর বিদেশ হইতেও আমরা ছাত্র পাই। আজকাল আমাদের কর্ম্মবীর ও শিক্ষকগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১১০। ইহাঁরা সপরিবারে বাস করেন। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে এইরূপে অন্ততঃ ৭০০ জন লোকের বসতি।

১৮৯০ সালে টাস্কেজীতে প্রথম "নিগ্রো-মহাসম্মিলনের" প্রবর্ত্তন করি। তাহার পর হইতে প্রতিবৎসর নিগ্রোসম্মিলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। প্রায় ৮০০।৯০০ পুরুষ ও স্ত্রী নিগ্রো যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে টাস্কেজীতে বৎসরে একদিন করিয়া কাটাইয়া যান। এই দিন নিগ্রোজাতির আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষাসম্বন্ধীয়, নৈতিক ও অন্যান্য সকল প্রকার উন্নতির উপায় আলোচিত হয়। এই সম্মিলনকে নিগ্রোদিগের জাতীয় সম্মিলন বলা যাইতে পারে।

এই একদিবসব্যাপী নিগ্রো-মহা-সম্মিলনের দৃষ্টান্তে বিগত ১০ বৎসরের ভিতর নিগ্রোসমাজের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ছোট বড় নানা প্রাদেশিক বা পল্লী-সম্মিলনের অনুষ্ঠান আরব্ধ হইয়াছে। এইরূপ সম্মিলনের সাহায্যে নিগ্রোজাতির কর্ম্মশক্তি এবং চিন্তাশক্তি অসীম প্রভাব লাভ করিতেছে।

টাস্কেজীতে প্রতিবৎসর 'নিগ্রো-মহা-সম্মিলনের' পর দিবস আর একটা সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। ইহার নাম "কর্ম্মীসমিতি"। ইহাতে নিগ্রোসমাজের নানা কেন্দ্রে যাঁহারা

শিক্ষাপ্রচার কর্ম্মে ব্রতী আছেন তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পর বৎসরের জন্য কর্ত্তব্য স্থির করেন। সুতরাং ইহাকে নিগ্রো-সমাজের শিক্ষাসম্মিলন বলা যাইতে পারে। নিগ্রো-মহা-সম্মিলন যে কার্য্য ব্যাপকভাবে ও বৃহৎভাবে করেন 'কর্ম্মীসমিতি' তাহার 'কার্য্যনির্ব্বাহক' সভা স্বরূপ হইয়া সেই কার্য্যই কথঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে সমাধা করেন। ১৯০০ সালে আমি নিগ্রোজাতির "ব্যবসায়-সম্মিলনে"র প্রবর্ত্তন করিয়াছি। এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন বোষ্টননগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে যে সকল নিগ্রো ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন তাঁহারা এই সম্মিলনে সমবেত হইয়া ভাব-বিনিময় করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। এই বৃহৎ অনুষ্ঠান হইতেই ছোট ছোট "প্রাদেশিক ব্যবসায়-সম্মিলনে"র জন্ম হইয়াছে।

এই গ্রন্থ আমি আমার জন্মভূমি ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের রিচ্‌মণ্ডে বসিয়া সমাপ্ত করিলাম। আজ ১৯০১ সাল। ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে এই রিচ্‌মণ্ড-নগর গোলামী প্রথার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের স্বাধীনতালাভের কয়েক বৎসর পর, এই রিচ্‌মণ্ড-নগরে আমি প্রথম রাত্রি অনাহারে থাকিয়া রাস্তার পার্শ্বে কাঠের তক্তার নীচে মাটিতে শুইয়া কাটাইয়াছি। আর সেই রিচ্‌মণ্ডে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সমাজদ্বয়ের সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট আমি গত রাত্রে আমার আশার বাণী প্রচার করিলাম। যে স্থানে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে একব্যক্তিও আমাকে একটি আশ্

মাত্র দান করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে দেয় নাই, আজ স্থানের সহস্র সহস্র নরনারী, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং প্রা রাষ্ট্রের সকল কর্ম্মচারীই আমাকে আদর আপ্যায়ন ও সম্ব করিতে ব্যগ্র। কালের কি বিচিত্র গতি!

সম্পূর্ণ।